ইসলামী আকীদা শিক্ষা

আল্লামা আবুবকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী

গদ্দিনশীন পীর সাহেব, ফুরফুরার সরাসরি তত্ত্বাবধানে সংকলিত

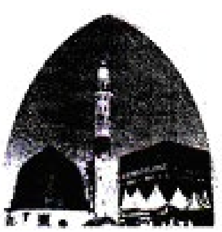

ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা
(ফুরফুরার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

মার্কাজে ইশা'আতে ইসলাম, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
৬০ হেমেন্দ্র দাস রোড ও ৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯০০৯৭৩৮ মোবাইল : ০১৯৭৯০৮৩৬৫২, ০১৭২৭১১৫৯৩৪, ০১১৯৯-০৮৩৬৫২
ওয়েব সাইট : ীীী.ভিঁৎভঁৎধ.পড়স.
ই-মেইল : ধৎরভধষসধহহধহ@মসধরষ.পড়স

ইসলামী আকীদা শিক্ষা
আল্লামা আবুবকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী

প্রকাশক	:	**ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা (ফুরফুরার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)**
প্রধান কার্যালয়	:	মার্কাজে ইশা'আতে ইসলাম, ২/২ দারুস সালাম মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ ফোন : ৯০০৯৭৩৮ মোবাইল : ০১১৯৯-০৮৩৬৫২ ওয়েব সাইট : ীীী.ভিঁৎভঁৎধ.পড়স ই-মেইল : ধৎরভধষসধহহধহ@মসধরষ.পড়স
বাংলাবাজার শাখা	:	৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রথম প্রকাশ	:	জিলহজ্ব, ১৪৩৩, অক্টোবর, ২০১৩, কার্তিক, ১৪২০
চতুর্থ সংস্করণ	:	জিলহজ্ব, ১৪৩৬, সেপ্টেম্বর, ২০১৫, আশ্বিন, ১৪২২
প্রাপ্তিস্থান	:	ঢাকার বাংলাবাজার, বায়তুল মোকাররম, মগবাজার, কাঁটাবন, চকবাজার, নিউমার্কেটসহ দেশের সকল সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরীতে খোঁজ করুন।
হাদিয়া	:	**১২০.০০ (একশত কুড়ি টাকা) মাত্র।**

ওংষধসর অশরফধ ঝযরশশযধ
অষষধসধ অনঁনধশধৎ অনফঁষ ঐধর গরংযশধঃ ঝরফফরয়ঁব
চঁনষরংযবফ ন্থ : উংযধুধঃ-উ-ওংষধস কঁঃনশযধহধ, ২/২ উধৎঁংংধষধস, গরৎঢ়ঁৎ, উযধশধ-১২১৬.
চযড়হব : ০২-৯০০৯৭৩৮, ০১৯৭৯০৮৩৬৫২, ০১৭২৭১১৫৯৩৪, ০১১৯৯-০৮৩৬৫২
চৎরবং : ১২০.০০ ঞধশধ ঙহষু.

ফুরফুরার গদ্দিনশীন পীর আমীরে হিযবুল্লাহ সিদ্দিক বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র আল্লামা আবুবকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী সাহেবের

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম।

আমরা আমাদের ও সন্তান-সন্ততির দৈহিক সুস্থতার জন্য সচেষ্ট ও সচেতন। এক্ষেত্রে আমরা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই লোকাচারের উপর নির্ভর করিনা। বরং প্রয়োজনে এ বিষয়ের কোন বিশেষজ্ঞদের কাছে গিয়ে অথবা তাদের লিখিত তথ্যনির্ভর বই-পত্রিকা পড়ে আমরা আমাদের ও পরিবারের সুস্বাস্থ্যের জন্য সর্বোত্তম নিয়ম জেনে তা পালনের জন্য চেষ্টা করি। দৈহিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য আমরা কিন্তু কখনই কোন অল্পশিক্ষিত বা হাতুড়ে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করিনা। অনুরূপভাবে আমরা আমাদের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার প্রবৃদ্ধিতে সচেষ্ট। এক্ষেত্রেও আমরা কখনই না জেনে বা বুঝে কিছু করিনা। এমনকি পূর্ণনিশ্চয়তা না থাকলে অন্যের হাতে প্রবৃদ্ধির জন্য সম্পদ অর্পণও করিনা।

নিঃসন্দেহে আমাদের সুস্থতা, আমাদের সন্ড়্রনসন্ততির সুস্থতা এবং আমাদের সম্পদের রক্ষানাবেক্ষণ ও তার উন্নয়ন আমাদের বড় দায়িত্ব ও আমাদের জন্য অত্যন্ড় প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের ঈমানের রক্ষানাবেক্ষণ এবং তার উন্নয়ন আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। ঈমান আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ, যার উপর আমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সকল কল্যাণ ও মুক্তি নির্ভর করছে। ঈমানের ক্ষতি হলে আমরা চূড়ান্ড় ধ্বংস ও ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হবো। এ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত নয়?

বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয় হল ইসলাম। বিশুদ্ধ ঈমান বা সঠিক বিশ্বাসই ইসলামের মূল ভিত্তি; সকল সফলতা ও সৌভাগ্যের মূল চালিকা শক্তি। বিশুদ্ধ ঈমান মানুষকে মানবতার শিখরে তুলে দেয়, তার জীবনে বয়ে আনে অফুরন্ড় শান্ড়ি ও আনন্দ। আর ভুল বিশ্বাস বা ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি মানুষের মনকে সদাব্যস্ড়, অস্থির ও হতাশ করে ফেলে।

আমরা যত ইবাদত বা সৎকর্ম করি সবকিছু আল্লাহর নিকট কবুল বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত বিশুদ্ধ শির্ক-কুফর মুক্ত ঈমান। কুরআন করীমে বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ্ বলেন: “এবং যে ব্যক্তি পারলৌকিক জীবনে কল্যাণ চায়, সে জন্য চেষ্টা করে এবং সে বিশ্বাসী বা মুমিন হয়, তাহলে তার চেষ্টা ও কর্ম কবুল করা হবে।” (সূরা বনী ইসরাঈল (ইসরা) : ১৯ আয়াত)

দুনিয়াতে আল্লাহর নিয়ামত ও বরকত অর্জনের এবং আল্লাহ্র ওয়াদাকৃত পবিত্র জীবন লাভের শর্ত হলো সঠিক ঈমান। আল্লাহ্ বলেছেন: “যদি কোনো পুর"ষ বা মহিলা সৎকর্ম করে এবং সে মুমিন হয়, আমি অবশ্যই তাদেরকে (দুনিয়াতে) পবিত্র জীবন দিয়ে জীবিত রাখব এবং (আখিরাতে) তাদের সর্বোত্তম কর্মের উপর ভিত্তি করে তাদের পুরস্কার দান করব।” (সূরা নাহল: ৯৭ আয়াত)

নানা প্রকার বাতিল মতবাদ ও আকীদা-বিশ্বাস আজ মুসলমানদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বর্তমানে নেতা, লিডার, পীর, আলেম, আশেক, ফকির ইত্যাদি সেজে একদল ভ" মুসলমানদের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ ঈমানকে বরবাদ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা নানা প্রকার বাতিল আকীদা, মতবাদ, মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা প্রচার করে মুসলমানদের ঈমানহারা করছে। এসব বাতিলপন্থীদের হাত হতে মুসলমানদের ঈমানকে হেফাজত করার লক্ষ্যে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে এসব বাতিলপন্থীদের মুখোশ উন্মোচন করে সহীহ ঈমান ও আকীদা মুসলমানদের সামনে তুলে ধরার জন্য সংকলিত হয়েছে “ইসলামী আকীদা শিক্ষা” শীর্ষক সংক্ষিপ্ত এই বইটি। এই বইটি সংকলনে কুরআন শরীফ, সিহাহ সিত্তাহ, ইমাম আবু হানীফা (রহ:) এর ‘আল ফিকহুল আকবর’; আবু জাফর তাহাবী রচিত ‘আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ’; সা’দ উদ্দীন তাফতাযানী রচিত ‘শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ’; মুহাম্মদ ইবনু আলাউদ্দিন রচিত ‘শারহুল আকীদাহ আত তাহাবীয়্যাহ’; বেফাকুল মাদারিসীল আরাবিয়া বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদিত মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীনের রচিত ‘ইসলামী আকিদা ও ভ্রান্ত মতবাদ’; মুফতি সাইদ আহমাদ রচিত ‘তাওহীদ ও রিসালাত’ এবং ‘মুসলমান কীভাবে কাফের হয়’; ড. প্রফেসর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রচিত ‘ইসলামী আকীদা’, ‘মুসলমানী নেসাব’, ‘ফিকহুল আকবারের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা’; আমার ওয়ালেদ মরহুম মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দিকী (রহ:) এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রণীত ‘দি গাইড’ ও ‘ফতোয়ায়ে সিদ্দিকীন’ ইত্যাদিসহ অন্যান্য কিছু গ্রন্থ হতে সাহায্য নেয়া হয়েছে।

পূর্বের সংস্করণে থেকে যাওয়া ভুলভ্রান্তিগুলো এ সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কিছু নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। আমাদের ঐকান্ড়িক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সময়ের স্বল্পতা ও সামর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে এই বইটিতে কিছু ভুলভ্রান্ড়ি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সকল ভুলভ্রান্ড়্রি জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সম্মানিত পাঠকগণকে অনুরোধ করছি, যেকোনো প্রকার ভুলভ্রান্ড়ি চোখে পড়লে আমাদেরকে জানাবেন। ইনশা-আল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেয়া হবে।

মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহপাকের দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি দয়া করে এই বইটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল কর"ন, একে লেখক ও এর প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের, তাদের পিতামাতা, স্ত্রী সন্ড়্রন, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের, পাঠকদের এবং সকল শুভাকাঙ্খীর নাজাতের ওসিলা করে দিন। সকল প্রশংসা তাঁরই। সালাত ও সালাম তাঁর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ ও অনুসারীগণের জন্য।

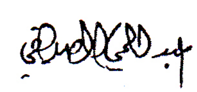

(আবুবকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী)
পীর সাহেব, ফুরফুরা

সূচিপত্র

ইসলাম/১৩
ইসলামের বুনিয়াদ বা ভিত্তি/১৪
ঈমান/১৪
আকীদা/১৫
মানুষের মুক্তি, কল্যাণ ও সফলতার চাবিকাঠি ঈমান/১৬
১. মুক্তি, কল্যাণ ও সফলতা/১৬ ২. বরকত ও সমৃদ্ধি/১৬ ৩. শাস্তি দিবেন না/১৬ ৪. ঈমানের পুরস্কার জান্নাত/১৬ ৫. জাহান্নামের আগুন নিষিদ্ধ/১৬ ৬. নবীজীর শাফায়াত/১৬ ৭. পরিপূর্ণ আস্থা ও প্রশান্তি/১৭
যেসব বিষয়ে ঈমান আনা অত্যাবশ্যকীয়/১৭
১. আল্লাহ্‌র উপর ঈমান/১৭
তাওহীদের বিভিন্ন পর্যায়/১৮
১. জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ (তাওহীদুল ইসবাত ওয়াল মা'রিফাহ)/১৮
(১) সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব/১৮
(২) নাম ও গুণাবলীর একত্ব/১৮
২. কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ বা ইবাদতের একত্ব (তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ)/১৯
২. আল্লাহ্‌র ফিরিশতাগণের উপর ঈমান/২১
৩. আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহের উপর ঈমান/২২
৪. আল্লাহ্‌র রাসূলগণের উপর ঈমান/২৩
রিসালাত বা 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ঈমান/২৩
১. আল্লাহ্‌র মনোনীত নবী/২৩ ২. সর্বশেষ নবী/২৪ ৩. সমগ্র বিশ্ববাসীর নবী/২৪ ৪. কোনোকিছু তিনি গোপন করেননি/২৪ ৫. সবকিছুই তিনি সত্য বলেছেন/২৪ ৬. নবীজীর শিক্ষা/২৪ ৭. তাঁর আনুগত্য করা/২৪ ৮. তাঁর শিক্ষানুসারে বিরোধ নিষ্পত্তি করা/২৪ ৯. তাঁর অনুসরণ অনুকরণ করা/২৫ ১০. রিসালাতে সাক্ষ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ/২৫ ১১. নবীজীর মর্যাদা ও সম্মান/২৫ ১২. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ/২৬ ১৩. অলৌকিক বৈশিষ্ট্য/২৬ ১৪. গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান/২৬ ১৫. নবীজীর ক্ষমতা/২৬ ১৬. রাসূলের দু'আ ও শাফায়াত/২৭ ১৭. নবীজীর মৃত্যু পরবর্তী জীবন/২৭ ১৮. প্রশংসায় ভক্তিকে বাড়াবাড়ি না করা/২৭ ১৯. নবীজীর ভালবাসা/২৮
৫. আখিরাতের উপর ঈমান/২৯
আখিরাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও তৎসংশ্লিষ্ট আকীদা/২৯
১. কবর/২৯ ২. শিঙ্গায় ফুৎকার/৩০ ৩. পুনরুত্থান/৩০ ৪. হাশর/৩১ ৫. শাফা'আত/৩১ ৬. হিসাব-নিকাশ/৩২ ৭. আমলনামা প্রদান/৩২ ৮. মীযান বা দাঁড়িপাল্লা/৩২ ৯. হাউয/৩৩ ১০. সিরাত/৩৩ ১১. জাহান্নাম/৩৪ ১২. জান্নাত/৩৫
কিয়ামত ও তার আলামত (পূর্বাভাস) সম্বন্ধে আকীদা/৩৬
১. কিয়ামত/৩৬ ২. কিয়ামাতের আলামত বা পূর্বাভাস/৩৭ ২.১. আলামাতে সুগরা/৩৭ ২.২. আলামতে কুবরা/৩৭ ৩. ইমাম মাহদী সম্বন্ধে আকীদা/৩৮ ৪. দাজ্জাল সম্বন্ধে আকীদা/৩৯ ৫. হযরত ঈসা (আ:)-এর পৃথিবীতে অবতরণ সম্বন্ধে আকীদা/৪১ ৬. ইয়া'জূজ মা'জূজ সম্বন্ধে আকীদা/৪১ ৭. আকাশের এক ধরনের ধোঁয়া সম্বন্ধে আকীদা/৪২ ৮. পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় সম্পর্কে আকীদা/৪২

৯. দাব্বাতুল আর্দ সম্বন্ধে আকীদা/৪২ ১০. কিয়ামতের পূর্বক্ষণে দুনিয়ার অবস্থা ও কিয়ামত সংঘটন সম্বন্ধে আকীদা/৪৩
৬. তাকদীর বা আল্লাহ্‌র নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তের উপর ঈমান/৪৪
মুসলমানদের আরো কতিপয় আকীদা/৪৫
মি'রাজ সম্বন্ধে আকীদা/৪৫
আরশ কুরছী সম্বন্ধে আকীদা/৪৫
সাহাবীদের সম্বন্ধে আকীদা/৪৬
জিন সম্বন্ধে আকীদা কারামত, কাশ্‌ফ, এল্‌হাম ও পীর বুজুর্গ সম্বন্ধে আকীদা/৪৭
আসবাব/বস্তুর ক্ষমতা সম্বন্ধে আকীদা/৪৮
ঈমানবিধ্বংসী বিষয়াবলী/৪৮
১. কুফর/৪৯ ২. শিরক/৪৯ ৩. নিফাক/৪৯ ৩.১. বিশ্বাসের নিফাক/৪৯ ৩.২. কর্মের নিফাক/৫০ ৪. বিদ'আত/৫০
ঈমান বিধ্বংসী আকীদা-বিশ্বাস বা শিরক-কুফরের ভয়াবহ পরিণতি/৫০-৫২
সমাজে প্রচলিত ঈমানবিধ্বংসী আকীদা-বিশ্বাস/৫২
গায়রুল্লাহর উপর নির্ভর করা সম্পর্কে আকীদা/৫৩
গায়রুল্লাহকে ভয় করা বা গায়রুল্লাহর কাছে আশা করা সম্পর্কে আকীদা/৫৪
গায়রুল্লাহর ইচ্ছা বা অভিপ্রায় বিষয়ক আকীদা/৫৬
লোক দেখানো আমল (রিয়া) সম্পর্কে আকীদা/৫৮
শরিয়ত প্রবর্তন ও হালাল-হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষমতা সম্পর্কে আকীদা/৬১
আল্লাহতা'আলা কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত শরিয়তী বিধানের পরিবর্তন সম্পর্কে আকীদা/৬৫
দ্বীনের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং দ্বীনের অবমাননা করা প্রসঙ্গে আকীদা/৬৬
কুরআনী আইন ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কোন আইন প্রয়োগ করা সম্পর্কে আকীদা/৬৬
তাশবীহ বা আল্লাহপাকের জন্য সৃষ্টির সাথে তুলনীয় মানবীয় গুণাবলী সাব্যস্ত করা সম্পর্কে আকীদা/৬৭
আল্লাহপাকের দীদার প্রসঙ্গে আকীদা/৬৮
আল্লাহপাক ছাড়া অন্য কারো গায়েবী বা অলৌকিক শক্তি বা ক্ষমতা সম্পর্কে আকীদা/৭০
উপকরণ বা কার্যকারণের সহায়তা গ্রহণ সম্পর্কে আকীদা/৭০
আল্লাহপাক ছাড়া অন্য কাউকে আ'লিমুল গায়েব মনে করা বিষয়ক আকীদা/৭১
১. গায়েব (غَيْبٌ)-এর পরিচয়/৭১
২. নবী-রাসূলগণ গায়েব জানতেন না/৭২
৩. জিন ও ফেরেশতারা গায়েব জানে না/৭২
৪. জিনদের মাধ্যমে গায়বের খবর জানা ও অলৌকিক কাজ করা/৭২
৫. গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তাদের কথা বিশ্বাস করা/৭৩
৬. কোন জীবিত বা মৃত পীর ওলী গায়েব জানেন না/৭৪
৭. পাশা, তীর, টিয়াপাখী ইত্যাদির সাহায্যে ভাগ্য জানতে চাওয়া বিষয়ে আকীদা/৭৪
৮. ফালনামা, খাবনামা, তালেনামা সম্পর্কে আকীদা/৭৫
৯. কুরআন শরীফ থেকে ফাল নেয়া সম্পর্কে আকীদা/৭৫
১০. জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে আকীদা/৭৬
১১. হস্তরেখা গণনা সম্পর্কে আকীদা/৭৬

১২. যাদুবিদ্যা সম্পর্কে আকীদা/৭৭
১৩. চেহারা দেখেই অতীত-বর্তমান ভবিষ্যতের কথা বলে দেয়া সম্পর্কে আকীদা/৭৭
১৪. রাশিচক্র সম্পর্কে আকীদা৭৮
১৫. চাল পড়া, আয়না পড়া, কুরআন ঘোরানো, তুলা রাশির মাধ্যমে চোর ধরা সম্পর্কে আকীদা/৭৮
১৬. ভবিষ্যদ্বানী করা সম্পর্কে আকীদা/৭৯
১৭. আবহাওয়া ও পরিবেশ সংক্রান্ড় পূর্বাভাস সম্পর্কে আকীদা/৭৯
গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা সম্পর্কে আকীদা/৭৯
১. সিজদা কেবলমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য/৭৯
২. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা/৮০
৩. নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও সিজদা করা হারাম/৮১
৪. বায়তুল্লাহকেও সিজদা করা কুফরী/৮২
৫. কবর সিজদা/৮২
৬. সামান্য মাথা ঝুঁকানোরও অনুমতি নেই/৮৩
৭. সালামে ঝুঁকাও হারাম/৮৪
৮. কদমবুসি সম্পর্কে আকীদা/৮৪
কারো সামনে মূর্তিবৎ হাতজোড় করে দাঁড়ানো সম্পর্কে আকীদা/৮৪
● যে ধরনের দাঁড়ান শরীয়ত সম্মত এবং পছন্দনীয়/৮৫
● হাত জোড় করে মুর্তিবৎ বসে থাকা/৮৬
কবর ও মাজার সম্পর্কে আকীদা/৮৬
১. নবীজীর আশঙ্কা ও দু'আ/৮৬
২. নবীজী উঁচু কবরগুলোকে ভেঙ্গে সমান করে দেন/৮৬
৩. কবরের উপর প্রাসাদ ও মাজার নির্মাণ/৮৭
৪. কবর মাজার কেন্দ্রিক শিরক কুফর/৮৮
৫. কবর বা মাজারকে স্পর্শ করা, মাসেহ করা বা চুমু খাওয়া উচিত নয়/৮৮
৬. রাওজাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেয়ালে মসেহ করা, চুমু খাওয়া উচিত নয় /৮৯
৭. রওজা শরীফ, মাজার বা কবর ইত্যাদির ছবি বরকতের জন্যে রাখা, চুমু খাওয়া, তাজীম করা/৯০
৮. হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেওয়া প্রসঙ্গে/৯১
৯. মাজারে ফুল অর্পণ, গিলাফ চড়ানো ও বাতি জ্বালানো/৯২
১০. কবরে আযান দেয়া/৯২
১১. কবরে পীরের শাজরা, জামা,পাগড়ী বা অন্য বস্তু রাখা/৯২
১২. কবর ধোয়া পানি/৯৩
১৩. কবরকে সামনে রেখে নামাজ/৯৩
১৪. কবর তাওয়াফ/৯৩
১৫. কবরে মশারী/৯৩
১৬. কবর বা মাজারের গেলাফের তাজীম/৯৩
১৭. মাজারে টাকা দেয়া/৯৪
১৮. ওলী না হাইজ্যাকার/৯৪
১৯. শয়তানের এমবেসী/৯৪

২০. কবর জিয়ারত/৯৪
২১. ওরশ সম্পর্কে আকীদা/৯৪
২২. খাজা বাবার ডেগ/৯৪
প্রাণীর ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তি, ভাস্কর্য সম্পর্কে আকীদা/৯৫
সমাধি, স্মৃতিস্ড়ম্ভ, স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার সম্পর্কে আকীদা/৯৬
অগ্নিপূজা এবং শিখা চিরন্ড়ন, শিখা অনির্বাণ প্রসঙ্গে আকীদা/৯৬
মঙ্গল প্রদীপ ও মঙ্গল শোভাযাত্রা সম্পর্কে আকীদা/৯৭
গায়রুল্লাহর কাছে দু'আ, প্রার্থনা করা সম্পর্কে আকীদা/৯৭
১. দু'আ বা প্রার্থনা করা ইবাদত/৯৭
২. দু'আ কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য/৯৮
৩. কুরআনে আল্লাহ কেবল তাঁরই নিকট সাহায্য চাওয়ার কথাই শিক্ষা দিয়েছেন/৯৮
৪. আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন : প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেবেন/৯৯
৫. সাহায্য কেবল আল্লাহর নিকটেই চাইতে হবে/১০০
৬. এমনকি জুতার ফিতা এবং লবণও আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে/১০০
৭. আল্লাহপাক ছাড়া অন্য কারো নিকট দু'আ বা প্রার্থনা করা শিরক/১০০
৮. গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারী হতে আল্লাহপাক অনুগ্রহের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন /১০২
গায়রুল্লাহ বা কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির নিকট গায়েবী সাহায্য চাওয়া সম্পর্কে আকীদা/১০৩
১. বিপদে পড়লে গায়রুল্লাহকে ডাকা/১০৩
২. তারা মাছির কাছ থেকেও কোনো কিছু উদ্ধার করতে পারেনা/১০৪
৩. তারা একটা খেজুর খোসারও মালিক নয়/১০৫
৪. তাদের অবস্থা মাকড়সা ও তার জালের ন্যায়/১০৫
৫. মৃত্যুর পর নবীজী মেয়েকে সাহায্য করতে পারবেন না/১০৫
৬. সম্পদ বৃদ্ধি করে দেয়ার ক্ষমতা শুধু আল্লাহরই/১০৬
৭. বিপদ যত কঠিনই হোক আল্লাহ ছাড়া কারো নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে না/১০৬
৮. গায়রুল্লাহর কাছে রোগ ও বিপদমুক্তি, রিযিক, সন্ড়ান, সম্পদ ইত্যাদি চাওয়া শিরক/১০৭
৯. বিপদমুক্তি আল্লাহর হাতে/১০৯
১০. রিযিক ও দৌলত দানকারী একমাত্র আল্লাহপাক/১১০
১১. সন্ড়ান দানকারী একমাত্র আল্লাহ/১১২
১২. নিজ ইচ্ছায় ছেলে মেয়ে জন্ম/১১৩
১৩. বিশ বছর পর অমুক হুজুরের দু'আয় সন্ড়ান লাভ/১১৩
১৪. বাচ্চা কখন নেবেন?/১১৪
১৫. ১০০% গ্যারান্টিতে রোগমুক্তি/১১৪
১৬. রূহানী শক্তিবলে মুসকিল আসান/১১৫
১৭. খাজা বাবার দু'আ, না আল্লাহর দয়া/১১৬
১৮. নিজের বা অপরের ভাল বা মন্দ/করার ক্ষমতা নবীজীরও ছিল না/১১৬
১৯. সাহায্য চাইতে হবে ইবাদতকে ওসিলা করে/১১৮
২০. রত্ন ও পাথরের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে আকীদা/১১৮
২১. মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে আকীদা/১১৯
২২. গ্রহ-নক্ষত্রের তাছীর সম্পর্কে আকীদা/১১৯

২৩. তারকা খসে পড়া সম্পর্কে আকীদা/১২০
২৪. চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের প্রভাব সম্পর্কে আকীদা/১২০
২৫. কোন সমস্যায় জিন ডাকানো সম্পর্কে আকীদা/১২১
২৬. ভারী জিনিসপত্র ওঠাতে 'ইয়া আলী' বলা/১২১
ঝাড়ফুঁক পানি পড়া সম্পর্কে আকীদা/১২১
প্রথম প্রকার : জায়েজ ঝাড়ফুঁক/১২২
দ্বিতীয় প্রকার : শিরকযুক্ত ঝাড়ফুঁক/১২২
তাবীজ-কবজ ও সুতা বাঁধা সম্পর্কে আকীদা/১২৩
১. তাবীজ-কবজ ও সুতা বাধা সুন্নাতসম্মত নয়/১২৩ ২. জ্বরের জন্যে সুতা বাঁধা/১২৪ ৩. অসুখে গলায় তাগা ঝুলানো/১২৪ ৪. পিতলের মাদুলী/১২৫ ৫. জিনের উপদ্রব হতে রক্ষার জন্যে খুর বা হাতিয়ার রাখা/১২৫ ৬. বদনযর ও বাতাস লাগা সম্পর্কে আকীদা/১২৫ ৭. কুনজর বা বদনজর থেকে বাঁচার জন্যে তাবীজ কবজ/১২৫
শুভ-অশুভ, অযাত্রা-অমঙ্গল ও সুলক্ষণ কুলক্ষণ গ্রহণ সম্পর্কে আকীদা/১২৬
শরীয়তের আকীদা বির‍ুদ্ধ কয়েকটি লক্ষণ ও কুলক্ষণের তালিকা/১২৯
শুভ কাজ বা উন্নতির কারণ বিষয়ক/১৩৩
লক্ষ্মী অলক্ষ্মী/১৩৩
বনি বা সাইট/১৩৪
হালখাতা/১৩৪
কোন মাস বা সময়কে ভাল বা খারাপ জানা সম্পর্কে আকীদা/১৩৪
কাল বা সময়ের প্রভাবে বিশ্বাস করা আইয়ামে জাহেলিয়াতের রীতি/১৩৫
রোগ সংক্রমণ সম্বন্ধে আকীদা/১৩৫
১. নযর বা মানত/১৩৬
২. গায়র‍ুল্লাহর নামে মানত সম্পর্কে আকীদা/১৩৬
৩. জানের বদলায় মাল/১৩৭
৪. মানত তাকদীরকে বদলাতে পারে না/১৩৮
গায়রুল্লাহর নামে পশুপালন বা পশু উৎসর্গ করা সম্পর্কে আকীদা/১৩৯
গায়র‍ুল্লাহর জন্যে একটি মাছি দেয়ার পরিণতি/১৪১
গায়র‍ুল্লাহর নামে জবেহ বা কুরবাণী করা সম্পর্কে আকীদা/১৪১
গায়র‍ুল্লাহর নামে কসম বা শপথ করা সম্পর্কে আকীদা/১৪৪
১. কসম বা শপথ/১৪৪
২. গায়রুল্লাহর নামে কসম/১৪৪
৩. আল্লাহর নামে কসম/১৪৪
৪. খানায়ে কাবার নামে শপথ করাও নিষেধ/১৪৫
৭. পূর্ব অভ্যাসবশত গায়র‍ুল্লাহর নামে কসম করে ফেললে করণীয়/১৪৫
শিরকের গন্ধযুক্ত নাম বা সম্বোধন সম্পর্কে আকীদা/১৪৬
শিরকের গন্ধযুক্ত উপাধী প্রসঙ্গে আকীদা/১৪৭
শয়তানকে অভিশাপ দেয়া সম্পর্কে আকীদা/১৪৭
নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপারে সীমালংঘন সম্পর্কে আকীদা/১৪৭
১. নবীজী মানুষ ছিলেন বিষয়ক আকীদা/১৪৯

২. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেহ মুবারকে মাটি বিদ্যমান সম্পর্কে আকীদা/১৫৪
নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেহ মুবারক হতে মাটি অস্বীকার করা কুফরি/১৫৫
নূরে নবুওয়াত/১৫৬
৩. জাতি নূর প্রসঙ্গে আকীদা/১৫৬
● জাতিনূর সম্পর্কিত কয়েকটি মওজু হাদীস/১৫৭
● নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া প্রসঙ্গ/১৫৯
● নবীপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জাতি নূর বলা ইতিহাস ও বিবেক বির‍ুদ্ধ কথা/১৫৯
৪. নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আ'লিমুল গায়েব ছিলেন না বিষয়ক আকীদা/১৬১
৫. নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সদা সর্বত্র হাযির নাযির নন বিষয়ক আকীদা/১৬৫
● অতীতকালে বহু ঘটনার স্থলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাযির ও নাযির ছিলেন না/১৬৭
● কুরআনের একটি আয়াত/১৬৮
● দুনিয়ার জীবনেও নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বস্থানে হাযির ছিলেন না/১৬৯
● মুনাফিক প্রসঙ্গ/১৬৯
● সালাম পৌঁছিয়ে দেয়া হয়/১৭০
● মু'আজ ইবনে জাবাল (রা:) এর ঘটনা/১৭১
● হযরত আয়েশা (রা:) এর প্রতি অপবাদ প্রসঙ্গে/১৭১
● এখন সাহাবী হওয়া যাবে না কেন?/১৭২
● বিবেকের কাছে প্রশ্ন কর‍ুন/১৭২
৬. অলৌকিক কর্ম সম্পাদনের নিজস্ব ক্ষমতা নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছিল না বিষয়ক আকীদা/১৭৩
৭. আসমান জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবি প্রসঙ্গে আকীদা/১৭৪
৮. আল্লাহপাক দাতা, নবীপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বণ্টনকারী প্রসঙ্গে আকীদা/১৭৬
৯. নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দু'আ, প্রার্থনা, শাফা'আত কবুল করা আল্লাহপাকের ইচ্ছাধীন বিষয়ক আকীদা/১৭৭
১০. কাউকে হেদায়েত করার ক্ষমতা নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছিল না বিষয়ক আকীদা/১৭৮
১১. কারো কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না বিষয়ক আকীদা/১৭৮
● নিজের কোন মঙ্গল-অমঙ্গল করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না/১৭৯
১২. নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্বাভাবিক মৃত্যু বিষয়ে আকীদা/১৭৯
১৩. তাঁর পরে নবী আসতে পারে বলে বিশ্বাস করা সম্পর্কে আকীদা/১৮০
১৪. বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সার্বজনীনতাকে অস্বীকার করা সম্পর্কে আকীদা/১৮১
১৫. মিলাদুন্নবী ও সিরাতুন্নবী সম্পর্কে আকীদা/১৮২
● মন্দ উপসর্গ মিশ্রিত মিলাদ/১৮৪
● মিলাদ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা নাজায়েজ/১৮৪
● মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপলক্ষে মিছিল জসনে জুলুস/১৮৪

১৬. আযানের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন/১৮৫
১৭. নবী, পীরওলীর নামে গাড়ি, বাড়ি, দোকানের নাম রাখা প্রসঙ্গে আকীদা/১৮৫
১৮. সন্তানের নামকরণে নবী-পীর-ওলীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে আকীদা/১৮৫
১৯. আব্দুন নবী, আব্দুর রাসূল নাম রাখা সম্পর্কে আকীদা/১৮৫
২০. বিদ'আত (দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন)/১৮৬
● বিদ'আতের ভয়াবহতা/১৮৭
উকীল, মাধ্যম, শাফাআতকারী, সুপারিশকারী সম্পর্কে আকীদা/১৮৯
● গুনাহগার ব্যক্তির কি সরাসরি আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ারই অধিকার নেই?/১৯৩
● সুপারিশকারী, মধ্যস্থতাকারী, সাহায্যকারী, উকীল ছাড়াই আল্লাহপাক বান্দার দু'আ কবুল করেন/১৯৫
● শাফাআত বা সুপারিশ সম্পর্কে আকীদা/১৯৫
পীর ওলী বুজুর্গদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক কোনই কাজে আসবে না/১৯৬
আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভের জন্য ওসিলা গ্রহণ প্রসঙ্গে আকীদা/১৯৭
আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভের জন্য পীর, ওলী বা বুজুর্গ ব্যক্তির ওসিলা গ্রহণ প্রসঙ্গে আকীদা/২০২
জিকিরের সময় পীরের কলবের ওসিলা প্রসঙ্গে আকীদা/২০৩
মারেফাত ও পীর-মুরীদি সম্পর্কে আকীদা/২০৪
তরীকত, মারেফাত ও পীর মুরীদির নামে প্রচলিত কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থি কতগুলো কাজের নমুনা/২০৫
১. তাছাওউরে শায়খ বা পীরের কল্পনা/২০৫
২. পীর সবকিছু জানেন/২০৫
৩. পীরকে নাজাতদাতা মনে করা/২০৫
৪. পীরকে হাজের-নাজের জানা/২০৬
৫. পীরকে দূর হতে ডাকা/২০৬
৬. পীরের জন্য ঘর সাজিয়ে রাখা/২০৬
৭. গায়রুল্লাহর নামে জিকির বা ওযীফা/২০৬
৮. পীরের ধ্যানে জিকির/২০৭
৯. গাঁজাখোর জটাধারী পীর/২০৭
১০. লম্বা চুলওয়ালা ফকীর/২০৭
১১. নিরামিষ ভোজী ফকীর/২০৭
১২. স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ত্যাগ ও বৈরাগ্য/২০৭
১৩. পীরকে বাবা বলা/২০৮
১৪. খালি পায়ে পীরের বাড়িতে/২০৮
১৫. কামেল পীরের কী গোনাহ নাই?/২০৮
১৬. মসজিদে পীরের জন্য খাছ জায়গা/২০৮
১৭. পীরের দরবারে নারী সমাবেশ/২০৮
১৮. কাওয়ালী, মারফতী, মুর্শিদী/২০৮
১৯. জিকিরের সময় নর্তন কুর্দন/২০৯
২০. পীরের পা চাটা/২০৯
২১. গারান্টি দিয়ে কলব জারী/২০৯
২২. আল্লাহর জাতের সাথে মিশে যাওয়া/২১০
২৩. আল্লাহ যা করান, তাই করি/২১০

২৪. দেলে দেলে নামাজ পড়ি/২১০
২৫. ছিনায় ছিনায় মারফতী/২১০
২৬. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস/২১১
২৭. হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কিত হাদীস/২১২
২৮. আল্লাহপাক ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চাইতেও কি পীরের মর্যাদা বেশী/২১২
২৯. শরীয়তের ইত্তেবা সর্বাবস্থায় ফরজ/২১৩
৩০. আল্লাহপাক কি শুধু বাতেনী অবস্থা দেখবেন?/২১৪
৩১. পীরের বাড়ির খাদেম, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির প্রতি অন্ধ সম্মান বিষয়ে আকীদা/২১৪
৩২. পীরওলীদের তাবারুক বা স্মৃতিচিহ্নের তাজীম করা সম্পর্কে আকীদা/২১৪
● 'যাতে আনওয়াত' বৃক্ষের ঘটনা/২১৫
● হুদায়বিয়ার ছামুরা বৃক্ষ/২১৬
সমাজে প্রচলিত ঈমান-বিধ্বংসী আরো কিছু শিরক-কুফর/২১৭
১. বিশ্ব প্রতিপালনে শরীক করা বা রুবূবিয়্যাতের শিরক/২১৭
২. আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর শিরক/২১৭
৩. আল্লাহর সাথে অন্য কারো সন্তুষ্টি কামনা বা সম্মান প্রদর্শন/২১৭
৪. আল্লাহ ছাড়া কারো প্রশ্নাতীত আনুগত্য করা/২১৮
৫. আল্লাহ ছাড়া কাউকে অলৌকিক ভয়, আশা ও ভালোবাসা শিরক/২১৮
৬. আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞাপক বাক্য বলা/২১৮
৭. কার্যকারণ বা উপকরণ বিষয়ক শিরক/২১৯
৮. ইসলামের কোনো বিষয় অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অবজ্ঞা করা বা অপছন্দ করা/২২০
৯. সমাজ, বিচার, শিক্ষা, রাষ্ট্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইসলাম অচল মনে করা/২২১
১০. জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মানা/২২১
১১. প্রচলিত গণতন্ত্র/২২১
১২. সমাজতন্ত্র ও নাস্তিক্যবাদ/২২১
১৩. ইসলাম সেকেলে মতবাদ/২২১
১৪. ধর্ম নিরপেক্ষতা/২২১
১৫. কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী/২২২
১৬. কাউকে শরীয়তের উর্ধ্বে মনে করা/২২২
১৭. সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা/২২২
১৮. ইসলাম ধর্মকে জানতে-বুঝতে আগ্রহ না থাকা/২২২
১৯. হারাম কাজের বৈধতার স্বীকৃতি দেয়া/২২৩
২০. কুফরী মতবাদ প্রচারের অপতৎপরতায় সহায়তা দান/২২৩
২১. অশ্লীলতা-অপসংস্কৃতি/২২৩
২২. হিন্দু-মুসলিম বৈবাহিক সম্পর্কের বৈধতা/২২৩
২৩. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আইন-কানুন কার্যকরী করার বিরোধিতা করা/২২৩
২৪. হাক্কানী ওলামা, পীর, মাশায়েখদের অহেতুক অপমান ও হেয় প্রতিপন্ন করা/২২৩
২৫. নাস্তিক, মুরতাদদের জাতীয় মর্যাদায় ভূষিত করা/২২৩
২৬. ডারউইন-এর বিবর্তনবাদ/২২৩
২৭. ফরযকে ফরয ও হারামকে হারাম মনে না করা/২২৩
২৮. ইসলামের কোনো বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করা/২২৪
২৯. যে কোনো ধর্মে থেকে ভালো কাজ করলে পরকালে মুক্তি হবে মনে করা/২২৪

৩০. আহলে কুরআন/২২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামী আকীদা শিক্ষা

ইসলাম

‘ইসলাম’ আরবী শব্দ। এর অর্থ হ’ল আনুগত্য ও বাধ্যতা, মেনে চলা, আত্মসমর্পণ করা, দাসত্ব করা। আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ ও তাঁর দাসত্ব স্বীকার করা, আল্লাহর ইচ্ছামত চলা। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তার বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়া এ ধর্মের লক্ষ্য বলেই এর নাম হয়েছে ইসলাম। আল্লাহর মর্জিমত চলার মধ্যেই রয়েছে শান্ড়ি। আর তাই ইসলামের আরেক অর্থ শান্ড়ি।

দুনিয়ায় যত রকম ধর্ম রয়েছে তার প্রত্যেকটির নামকরণ হয়েছে কোন বিশেষ ব্যক্তির নামে। অথবা যে জাতির মধ্যে তার জন্ম হয়েছে তার নামে। যেমন: ঈসায়ী ধর্মের নাম রাখা হয়েছে তার প্রচারক হযরত ঈসা (আ.) এর নামে। বৌদ্ধ ধর্ম মতের নাম রাখা হয়েছে তার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা বুদ্ধের নামে। জেরদশতি ধর্মের নামও হয়েছে তেমনি তার প্রতিষ্ঠাতা জরদশতের নামে। আবার ইয়াহুদী ধর্ম জন্ম নিয়েছিল ইয়াহুদা নামে বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে। দুনিয়ায় আরো যেসব ধর্ম রয়েছে, তাদের নামকরণ হয়েছে এমনিভাবে। অবশ্য নামের দিক দিয়ে ইসলামের রয়েছে একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা জাতির সাথে এর নামের সংযোগ নেই। নাম থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলাম কোনো এক ব্যক্তির আবিষ্কার নয়। কোনো এক জাতির মধ্যে–এ ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম কোনো বিশেষ ব্যক্তি, দেশ অথবা জাতির সম্পত্তি নয়। ইসলাম হচ্ছে দুনিয়ার সকল দেশের, সকল জাতির, সকল মানুষের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত পরিপূর্ণ ও একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ কুরআনে বলেন:

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

অর্থ : ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা।

(সূরা আলে ইমরান: ১৯)

ইসলামের বুনিয়াদ বা ভিত্তি

ইসলামের বুনিয়াদ বা ভিত্তি পাঁচটি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, ইসলামকে পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে :

১) ঈমান আনা বা বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

২) সালাত কায়েম করা।

৩) যাকাত প্রদান করা।

৪) রামাদান মাসের সিয়াম পালন করা।

৫) বায়তুল্লাহর হজ্জ আদায় করা। (বুখারী ও মুসলিম)

এই পাঁচটি বিষয়কে ইসলামের বুনিয়াদ বলা হয়েছে। বুনিয়াদ বা ভিত ছাড়া যেমন দালান টিকতে পারে না, তেমনি এ পাঁচটি বিষয় ছাড়া ইসলাম টিকতে পারে না। আবার দালানের বুনিয়াদ বা ভিত তৈরি করে দেয়াল ও ছাদ না দিলে যেমন শুধু বুনিয়াদকেই দালান বলা যায় না, তেমনি শুধু এ পাঁচটি বিষয় হলেই ইসলাম পুরো হয় না।

দুনিয়ার মানুষকে যত রকম কাজ করতে হয়, সবই যদি কুরআন-হাদীস মতো করা হয়, তাহলেই ইসলামের দালান সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়। আমাদের জীবনের কোনো ক্ষেত্রই ইসলামের গন্ডির বাইরে থাকা উচিত নয়। পারস্পরিক লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী, লেখা-পড়া, কৃষিকাজ, বিয়েশাদী, একে অন্যের প্রতি কর্তব্য, খাওয়া-বিশ্রাম ইত্যাদি সকল বিষয় কুরআন হাদীস অনুযায়ী হলেই ইসলামের দালান পুরোপুরি তৈরি হবে। এজন্যে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হও।

(সূরা রাকারা : ২০৭)

ঈমান (اِيْمَانٌ)

‘ঈমান’ শব্দের আভিধানিক অর্থ অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, স্বীকার করা, ভরসা করা, শান্ড়ি ও নিরাপত্তা প্রদান করা। শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলা হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত ঐ সকল বিষয়াদি যা স্পষ্টভাবে এবং অবধারিতরূপে প্রমাণিত, সে সমুদয়কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আস্থাশীল হয়ে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করা (যদি

স্বীকার করতে বলা হয়) ও মেনে নেয়া। আর কুরআন হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মতের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মের অবধারিত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করা। সংক্ষেপে ও সাধারণ কথায় ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়।

ঈমান হল মানুষের পরম সম্পদ। ঈমানের চেয়ে বড় সম্পদ এ জগতে আর কিছু নেই। বস্তুত ঈমানহারা মানুষের এ জগতে কোনো মূল্যই নেই।

ঈমান হ'ল কতকগুলো আকীদা বা বিশ্বাসের সমষ্টি। যে বিশ্বাসের মাঝে কোনো ফাঁক নেই, কোনো চতুরতা নেই। সমস্ড় আকীদা বা বিশ্বাসের ভেতর যদি একটিও বাতিল, কুফরী বা শিরকী আকীদা থাকে, তবেই সব শেষ, ঈমানহারা হয়ে চির জাহান্নামী হতে হবে।

ঈমান হ'ল পাত্র আর আমল হ'ল পানি। পাত্রে যদি ফুটো থাকে, তবে তাতে হাজার মন পানি ঢাললেও তো কোনো লাভ নেই, খালি পাত্র খালিই থেকে যাবে। ঠিক তদ্র""প, ঈমান না থাকলে হাজার আমল করলেও কোনো ফায়দা নেই। আকীদা বা বিশ্বাসে গোলমালের কারণে সব নেক আমল বরবাদ হয়ে যাবে।

আকীদা (عَقِيْدَةٌ)

'আকীদা' শব্দটি আরবী 'আক্দ' (عَقْدٌ) শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বন্ধন করা, গিরা দেয়া, চুক্তি করা, শক্ত হওয়া ইত্যাদি। ধর্ম-বিশ্বাস বুঝাতে আকীদা শব্দের ব্যবহার হিজরী চতুর্থ শতক থেকে প্রচলন লাভ করে। এক্ষেত্রে আকীদা হল সন্দেহমুক্ত দৃঢ় ধর্মীয় বিশ্বাস, দৃঢ় ও মজবুত ঈমান, অকাট্য প্রমাণ ভিত্তিক খবরাখবর ও বিষয়াবলীর প্রতি মনে অটল বিশ্বাস। 'আকীদা' শব্দের বহুবচন আকাইদ।

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, আসমানী কিতাব, ফিরিশতা, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি ঈমান সংশ্লিষ্ট বিস্ড়রিত বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের নাম আকীদা। একজন প্রকৃত মুসলিম তিনি, যিনি অন্ড়রে যে আকীদা পোষণ করেন, ভাষায় তা' প্রকাশ করেন এবং কর্মে তার প্রতিফলন ঘটান।

প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য একজন মানুষের ঈমান-আকীদা বিশুদ্ধ হওয়া অত্যন্ড় জর""রী। ইসলামের পাঁচটি স্ড়ম্ভের মধ্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছে ঈমান। বিশুদ্ধ আকীদা ছাড়া প্রকৃত মু'মিন হওয়া যায় না। তাই আমরা ঈমান ও আকীদা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বিস্ড়রিতভাবে পালনের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে জীবন গঠন

করবো।

মানুষের মুক্তি, কল্যাণ ও সফলতার চাবিকাঠি ঈমান

১. মুক্তি, কল্যাণ ও সফলতা : কুরআন কারীমের অনেক আয়াত ও অগণিত সহীহ হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তাওহীদ ও রিসালাতের ঈমান মানুষের মুক্তির একমাত্র সোপান। ইহকালের কল্যাণ ও পরকালের মুক্তির একমাত্র পথ তাওহীদের বিশ্বাস। সকল সফলতার চাবিকাঠি এই বিশ্বাস।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "হে মানুষেরা, তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) এই কথায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর, তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে, সফলকাম হবে।" (মুসনাদে আহমাদ ২/৪৯২, ৪/৬৩, ৩৪১, ৫/৩৭১, ৩৭৬)

২. বরকত ও সমৃদ্ধি : মহান আল্লাহ বলেছেন : "যদি জনপদবাসীরা ঈমান গ্রহণ করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে চলত তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের অগণিত বরকত, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির দরজা খুলে দিতাম।" (সূরা আ'রাফ : ৯৬)

৩. শাস্তি দিবেন না : আল্লাহ বলেছেন : যদি তোমরা ঈমান গ্রহণ কর ও কৃতজ্ঞ হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দিবেন কেন? (সূরা নিসা : ১৪৭)

৪. ঈমানের পুরস্কার জান্নাত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে, বলবে বা সাক্ষ্য দেবে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বাযযার, সহীহুল জামিয় ২/১০৮, ১০৯৮; নং ৬৩১৮, ৬৪৩৩) "যে ব্যক্তি এই সুদৃঢ় প্রত্যয়ের জ্ঞান নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে যে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল, তাওহীদ ও রিসালাতের এই কালিমায় সন্দেহাতীত বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্র সাথে মিলিত হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম ১/৫৬, নং ৪৪ (২৭))

৫. জাহান্নামের আগুন নিষিদ্ধ : "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের বিশুদ্ধ ইচ্ছা নিয়ে বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই) আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নামের আগুন নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।" (বুখারী, ফাতহুল বারী ১/৫১৯, ৩/৬১, ৯/৫৪৩, ১১/২৪১, ১২/৩০৩, নং ৪২৫, ১১৮৬, ৫৪০১, ৬৪২৩, ৬৯৩৮; মুসলিম ১/৬১, ৪৫৫, নং ৫৪, ২৬৩)

৬. নবীজীর শাফায়াত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রা:) প্রশ্ন করেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল, সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে যে কেয়ামতের দিন আপনার শাফায়াত লাভে ধন্য হবে?" উত্তরে তিনি বলেন : "সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যে আমার শাফায়াত লাভে ধন্য হবে সে ঐ ব্যক্তি যে, তার অন্তরের বিশুদ্ধতম বিশ্বাস নিয়ে বলেছে যে, 'লা ইল্লাহা ইল্লাল্লাহ্' (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই)। (বুখারী, ফাতহুল

বারী ১/১৯৩, নং ৯৯ ও ১১/৪১৮, নং ৬৫৭০)

৭. পরিপূর্ণ আস্থা ও প্রশান্তি : বস্তুত এই তাওহীদের বিশ্বাসই সকল মানবিক ও আত্মিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি দান করে। এই বিশ্বাস মানুষকে মানবীয় পূর্ণতার শিখরে তুলে দেয় এবং মানুষের মনে এনে দেয় প্রশান্তি। তাওহীদে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মানসিক অবস্থার পার্থক্য বর্ণনা করে মহিমাময় আল্লাহ বলেছেন : "আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এবং এক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন; এই দুইজনের অবস্থা কি সমান হতে পারে? প্রশংসা আল্লাহ্‌রই নিমিত্ত, কিন্তু এদের অধিকাংশই তা জানেন না।" (সূরা যুমার : ২৯)

যেসব বিষয়ে ঈমান আনা অত্যাবশ্যকীয়

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, একজন মানুষকে ঈমানদার মুমিন হতে হলে নিম্নলিখিত ছয়টি মৌলিক বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবে বা বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

১. আল্লাহ্‌র উপর ঈমান।
২. আল্লাহ্‌র ফিরিশতাগণের উপর ঈমান।
৩. আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহের উপর ঈমান।
৪. আল্লাহ্‌র রাসূলগণের উপর ঈমান।
৫. আখিরাতের উপর ঈমান।
৬. তাকদীর বা আল্লাহ্‌র নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তের উপর ঈমান।

১. আল্লাহ্‌র উপর ঈমান

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের অর্থ আল্লাহ্‌র একত্বে বা তাওহীদে বিশ্বাস করা। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের বর্ণনা দিয়েছেন।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে কোনো ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা বা রাসূল তবে তাঁর জন্য আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুন হারাম বা নিষিদ্ধ করে দেবেন।" (মুসলিম, ১/৬১)

উপরের হাদীসে তাওহীদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : "আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই।" অর্থাৎ যদিও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য অনেক কিছুকেই

ইবাদত, উপাসনা, পূজা বা আরাধনা করা হয়, তবে সত্যিকারভাবে ইবাদত করার যোগ্য বা মাবুদ হওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই নেই। আল্লাহ্ই সকল প্রকার ইবাদাতের একমাত্র অধিকারী। ইসলামের পরিভাষায় ইবাদত বলা হয় এমন সব কিছুই একমাত্র তাঁর জন্য।

বিভিন্ন বর্ণনায় এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে : 'ওয়াহ্ দাহু লা-শারীকা লাহু' অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ একক ও অতুলনীয়, তাঁর কোনো অংশীদার বা সহযোগী নেই।

তাওহীদের বিভিন্ন পর্যায় : পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, তাওহীদের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে এবং সকল পর্যায়ের তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করেই একজন মানুষ মুসলিম বলে গণ্য হতে পারেন। কুরআন কারীমের বর্ণনার আলোকে তাওহীদের বিশ্বাসের দুইটি পর্যায় রয়েছে। প্রথমত, জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ। এই পর্যায়ে মানুষ মহান আল্লাহকে তাঁর কর্মে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করে। দ্বিতীয় পর্যায় হলো : কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ। এ পর্যায়ে মানুষ নিজের কর্মে মহান আল্লাহ্‌কে এক ও অদ্বিতীয় বলে মানে।

১. জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ (তাওহীদুল ইসবাত ওয়াল মা'রিফাহ্) : এই পর্যায়ে মহিমাময় আল্লাহকে আল্লাহ্‌র গুণাবলী ও কর্মে তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা হয়। জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদের দুইটি মূল বিষয় রয়েছেঃ (১) সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব, ও (২) নাম ও গুণাবলীর একত্ব।

(১) সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব : আরবীতে একে "তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ" বলা হয়। এর অর্থ হলো, বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ এই মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, সংহারক, রিযিকদাতা, পালনকর্তা। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَ لَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"শুনে রাখো, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা ও আদেশ দান করা। আল্লাহ্ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।" (সূরা আ'রাফ : ৫৪)

(২) নাম ও গুণাবলীর একত্ব : 'তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস সিফাত' বা নাম ও গুণাবলীর তাওহীদ হলো দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ্ সকল পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআন কারিমে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে আল্লাহ্‌র বিভিন্ন নাম ও গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন। এসকল নাম ও গুণাবলীর উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। যেভাবে কুরআন ও হাদীসে বলা হয়েছে অবিকল সেইভাবে, সকল প্রকার বিকৃতি,

অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত থেকে এসবের নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্র কোন গুণ বা বিশেষণ কোন সৃষ্টজীবের গুণ বা বিশেষণের মত নয়, তুলনীয় নয় বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"আর আল্লাহ্র জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম, কাজেই সে নাম ধরে তাঁকে ডাকো আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকার্যের ফল শীঘ্রই পাবে।" (সূরা আ'রাফ : ১৮০)

২. কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ বা ইবাদতের একত্ব (তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ) : সকল প্রকার ইবাদাত বা উপাসনা আরাধনামূলক কর্ম, যেমন– প্রার্থনা, সিজদা, জবাই, উৎসর্গ, মানত, তাওয়াক্কুল-নির্ভরতা ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহ্র জন্য করা ও আল্লাহ্রই প্রাপ্য বলে বিশ্বাস করা হলো এই পর্যায়ের তাওহীদ।

তাওহীদের এই দুইটি পর্যায় একে অপরের সম্পূরক ও পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়কে পৃথক করা যায় না বা একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির উপর ঈমান এনে মুসলিম হওয়া যায় না। তবে এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, শাহাদাতাইন বা ঈমানের প্রথম অংশ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-তে মূলত শেষ পর্যায় বা "তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ"-এর বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়নি যে 'লা খালিকা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই'। এখানে বলা হয়নি 'লা রাযিকা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া কোন রিযিকদাতা নেই'। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ ছাড়া কোন জীবনদাতা নেই, মৃত্যুদাতা নেই, পালনকর্তা নেই ইত্যাদি বিষয়ে সাক্ষ্য দানের নির্দেশ দেওয়া হয়নি, বরং আমাদের এই ঘোষণা দিতে হবে, এই বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য বা মাবুদ নেই।

কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে মূলত এই পর্যায়ের তাওহীদের কথাই বলা হয়েছে। সকল নবী ও রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) মূলত এই তাওহীদের আহ্বান করতেই প্রেরিত হয়েছেন বলে কুরআন কারীমে বারবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লহ্র ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাকো।" (সূরা নাহল, ৩৫)

এভাবে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য স্থানে আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে, একমাত্র তাঁরই উপাসনা ইবাদাত করতে এবং অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ইবাদাত-উপাসনা সর্বতোভাবে বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এই হলো ইবাদাতের একত্ব বা কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ।

কর্ম বা ইবাদাতের তাওহীদ জ্ঞানের তাওহীদের ফসল ও ফলাফল। যেহেতু আল্লাহ একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, রিজিকদাতা, সর্বজ্ঞানী কাজেই একমাত্র তাঁরই ইবাদাত উপাসনা করা দরকার। যেহেতু সকল ক্ষমতাই তাঁর, সেহেতু তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাসনা করা নিতান্তই অর্থহীন ও জঘন্য অন্যায়। এজন্য পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বার বার আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্বের (তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহর) কথা উল্লেখ করে একমাত্র তাঁর ইবাদাতের আহ্বান জানিয়েছে।

কর্ম পর্যায়ের বা ইবাদাতের তাওহীদেই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারিত হয়। যুগে যুগে ইসলাম ও কুফুরীর মধ্যে মূলত এই ব্যাপারেই বিরোধ। প্রথম পর্যায়ের তাওহীদ বা আল্লাহ্র সৃষ্টি এবং প্রতিপালনের একত্বে অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করেন।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ্র একত্ব বা তাওহীদের দুইটি পর্যায় রয়েছে, জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ ও কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ। এই দুইটি পর্যায় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং উভয় পর্যায়ের তাওহীদকে বিশ্বাস করলেই একজন মানুষ মুসলিম বলে গণ্য হবেন। তবে ইসলামের মূলমন্ত্র বা কালেমায়ে তাওহীদে মূলত দ্বিতীয় পর্যায়ের তাওহীদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ, এই পর্যায়ের তাওহীদের স্বীকৃতি দিলে প্রথম পর্যায়ের তাওহীদের স্বীকৃতি আসবেই। তাছাড়া মূলত এই দ্বিতীয় পর্যায়ের তাওহীদই যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজের মানুষেরা বিভিন্ন খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে অস্বীকার করেছে। প্রথম পর্যায়ের তাওহীদ অধিকাংশ মানুষই মেনে নিয়েছে। আর এজন্যই আল্লাহ্ বলেন :

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ

"অনেক মানুষ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।" (সুরা ইউসুফ : ১০৫ আয়াত)

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ হলো এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ বা উপাস্য নেই। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত, উপাসনা করা যাবে না। তিনি যেমন একমাত্র

স্রষ্টা প্রতিপালক, সকল পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত, তিনিই একমাত্র মাবুদ বা উপাস্য। আমরা আরো দেখেছি যে, যদি কেউ আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্‌র ইবাদত বা উপাসনা করে এবং সাথে সাথে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করে, তাহলে তিনি মুসলিম বলে গণ্য হবেন না; কারণ তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-তে বিশ্বাস করেননি।

আরবী ভাষায় ইবাদত (عِبَادَةٌ) শব্দের অর্থ হলো চূড়ান্ড় বিনয়ে পরিপূর্ণ আনুগত্য। (ইবনু ফারিস, মুজাম মাকাযিসুল লুগাহ ৪/২০৫, ইবনু মানুযূর, লিসানুল আরব ৩/২৭১-২৭৪, আল ফাইউমী, আলীমসাবাহুল মুনির ২/৩৮৯) ইসলামী পরিভাষায় ইবাদত বলতে মানুষের এ সকল কথা ও কর্মকে বুঝানো হয় যা আল্লাহ্‌র নিমিত্তে সম্পাদন করতে ইসলামে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যে কাজ আল্লাহ্‌র জন্য করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। ইবাদতের অন্যতম প্রকার হলো; দু'আ, প্রার্থনা, ডাকা, অলৌকিক ত্রাণ, সাহায্য ও বিপদমুক্তি চাওয়া, কুরবাণী করা, উৎসর্গ করা, জবাই করা, মানত করা, সিজদা করা, তাওয়াক্কুল করা বা পরিপূর্ণ সমর্পিত নির্ভরতা, পরিপূর্ণ সমর্পিত আনুগত্য, আশা, ভয় ইত্যাদি। তাওহীদের বিশ্বাসের অর্থ হলো সকল প্রকার ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য বলে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা ও সাক্ষ্য দেওয়া।

২. আল্লাহ্‌র ফিরিশতাগণের উপর ঈমান

কুরআন ও হাদীসে বারংবার মালাকগণ বা ফিরিশতাগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফিরিশতাগণের উপর বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হলো, দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ-তা'আলা অগণিত ফিরিশতা সৃষ্টি করেছেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

"আর আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।" (সূরা মুদ্দাস্‌সির : ৩১)

ফিরিশতাগণ আল্লাহ্‌র সম্মানিত সৃষ্টি, তাঁদেরকে নূর বা আলো থেকে তৈরি করা হয়েছে। মালিক ইবনু সা'সা'আ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের ঘটনা বলতে গিয়ে বলেন, আমার সামনে বাইতুল মামুর উত্থিত হলো, আমি বললাম, হে জিবরাইল, এটি কী? তিনি বললেন, এটি বাইতুল মামুর। প্রতিদিন এর মধ্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করেন। যারা একবার বেরিয়ে যান তারা আর কখনই ফিরে আসেন না। (বুখারী, ৩/১১৭৩, ১৪১১; মুসলিম, ১/১৪৬-১৫০)

তাঁদের স্বাধীন ইচ্ছা নেই। তাঁরা মানবীয় দুর্বলতা ও কামনা বাসনা থেকে

সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশের বাইরে যাওয়ার, অমান্য করার, আপত্তি বা প্রতিবাদ করার কোন প্রকার অনুভূতিই তাঁদের মধ্যে নেই।

তাঁদের কাজ হলো সর্বদা আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, তাঁর প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা করা, তাঁর নির্দেশে সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা, মানুষকে ভাল কাজে অনুপ্রাণিত করা, মুমিনদের জন্য দু'আ করা, মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধ করা, আরশ বহন করা, মৃত্যুর সময় আত্মাগ্রহণ, আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁরই মর্জিমত মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ করা ইত্যাদি।

ফিরিশতাগণ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট গাইব বা অদৃশ্য জগতের অংশ। তাঁদের সৃষ্টি, আকৃতি, প্রকৃতি, গুণাবলী, কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যা কিছু প্রমাণিত তা সবই আমরা আক্ষরিক ও সরলভাবে বিশ্বাস করি।

৩. আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহের উপর ঈমান

ঈমানের অন্যতম র ূকন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে 'আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহে' বিশ্বাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যারা তাতে বিশ্বাস করে না তাদের ভয়ঙ্কর বিভ্রান্ড়্রি কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহে বিশ্বাস করার অর্থ এই যে, আমরা সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ মানব ইতিহাসের শুর ু থেকে মানব জাতিকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ও সফলতার পথ শেখানোর জন্য যুগে যুগে তাঁর মনোনীত নবী-রাসূলগণের কাছে ওহীর মাধ্যমে 'কিতাব' প্রেরণ করেছেন, যেগুলো সন্দেহাতীত ভাবে আল্লাহ্‌র বাণী, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সত্য হেদায়েত, মানবজাতির পথ নির্দেশক নূর। তবে সেগুলি বিকৃত বা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যেমন: যবুর, তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি।

তাই আল্লাহ্ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সর্বশেষ কিতাব 'আল কুরআন' নাযিল করেছেন পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করতে, সেগুলির স্থান পূরণ করতে এবং পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে রহিত করতে। এই সর্বশেষ কিতাব কুরআনের মধ্যেই সকল কিতাবের নির্যাস ও মানবজাতির মুক্তির পথ রয়েছে। কুরআনই একমাত্র অবিকৃত গ্রন্থ, যা কিয়ামত পর্যন্ড় মানবজাতিকে আলোর পথ দেখাবে।

৪. আল্লাহ্র রাসূলগণের উপর ঈমান

ঈমানের অন্যতম বিষয় আল্লাহ্র রাসূলগণের উপর বিশ্বাস করা। অর্থাৎ এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্ যুগে যুগে মানবজাতির সঠিক পথের দিশা দানের জন্য মানুষদের মধ্য থেকে অসংখ্য মানুষকে মনোনীত করে তাঁদেরকে তাঁর বাণী দান করেন এবং মানুষদেরকে সততা, কল্যাণ ও সফলতার পথে আহ্বান করার দায়িত্ব দেন। নবী-রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহ্র পথে চলার ক্ষেত্রে মানবজাতির বাস্তব ও পরিপূর্ণ আদর্শ। তাঁরা সবাই মহান চরিত্রের অধিকারী নিষ্পাপ, সৎ ও কল্যাণময় মানুষ ছিলেন। তাঁরা সবাই তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। তাঁদের অধিকাংশের নাম বা বিবরণ আমরা জানি না।

পূর্ববর্তী নবীগণের ইন্তেকালের পরে তাঁদের উম্মতগণ তাঁদের শিক্ষা ও শরীয়ত বিকৃত, পরিবর্তিত ও নষ্ট করে ফেলে। শুধুমাত্র শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা ও শরীয়ত অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। আমরা তাঁদের সবাইকে বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমরা অনুসরণ করি এবং তাঁর শরীয়ত মত জীবন পরিচালনা করি।

রিসালাত বা 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ঈমান

একজন মানুষকে মুসলিম হতে হলে তাকে তাওহীদের বিশ্বাসের সাথে সাথে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতে হবে এবং সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল বা বার্তাবাহক। তাঁকে রাসূল বলে বিশ্বাস করার অর্থই হলো তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, যা কিছু বলেছেন সবকিছুকে সন্দেহাতীত বলে সত্য মনে করা এবং সর্বক্ষেত্রে তা মেনে চলা।

১. আল্লাহ্র মনোনীত নবী : আমরা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র মনোনীত নবী ও রাসূল। মানবজাতির মুক্তির পথ নির্দেশনা দানের জন্য, তাদের ইহলৌকিক সকল কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তাকে মনোনীত করেছেন। মানবজাতির মুক্তির পথ, কল্যাণ ও অকল্যাণের সকল বিষয় আল্লাহ্ তাকে জানিয়েছেন এবং তা মানুষদেরকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব তাঁকে দান করেছেন।

২. সর্বশেষ নবী : আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহ্র মনোনীত

সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তাঁর পর আর কোন ওহী নাযিল হবে না, কোন নবী বা রাসূল আসবেন না।

৩. সমগ্র বিশ্ববাসীর নবী : আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির সব মানুষের জন্য আল্লাহ্র মনোনীত রাসূল। তাঁর আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়ে গিয়েছে। তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস করা ছাড়া কোন মানুষই মুক্তির দিশা পাবে না।

৪. কোনোকিছু তিনি গোপন করেননি : আমরা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র সর্বশেষ ও সর্বজনীন নবী ও রাসূল হিসাবে তার নবুয়তের ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ্র সকল বাণী, শিক্ষা ও নির্দেশ তিনি পরিপূর্ণভাবে তার উম্মতকে শিখিয়ে গিয়েছেন। কোন কিছুই তিনি গোপন করেননি।

৫. সবকিছুই তিনি সত্য বলেছেন : আমরা বিশ্বাস করি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা কিছু উম্মতকে শিখিয়েছেন, জানিয়েছেন, সবকিছুই তিনি সত্য বলেছেন। তাঁর সকল শিক্ষা, সকল কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য।

৬. নবীজীর শিক্ষা : 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল' একথা বিশ্বাস করার অর্থ হলো আল্লাহ্কে ডাকতে হলে, তাঁকে পেতে হলে, তাঁর উপাসনা আরাধনা করতে হলে বা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে অবশ্যই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা অনুসারে আল্লাহকে ডাকতে হবে, ইবাদত উপাসনা করতে হবে। তাঁর শিক্ষার বাইরে ইবাদত করলে তা কখনো আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

৭. তাঁর আনুগত্য করা : হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল এই বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে তার আনুগত্য করা। জীবনের সকল বিষয়ে, সকল ক্ষেত্রে মহানবীর শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেওয়া। সকল মানুষের কথা ও সকল মতের ঊর্ধ্বে তাঁর শিক্ষা ও কথাকে গুরুত্ব দেওয়া।

৮. তাঁর শিক্ষানুসারে বিরোধ নিষ্পত্তি করা : মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্র রাসূল বলে বিশ্বাসকারী প্রতিটি মুসলিমের অন্যতম দায়িত্ব হলো তাদের মধ্যকার সকল মতবিরোধের নিষ্পত্তি করা তাঁর নির্দেশ ও শিক্ষা অনুসারে। মুসলমানদের মধ্যে কোন মতবিরোধ ঘটলে তার ফয়সালার জন্য রাসূলে আকরামের শিক্ষার, অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের শিক্ষার আশ্রয় নিতে হবে।

কুরআনে বা হাদীসে যে নির্দেশ থাকবে তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে হবে। নিজেদের মতামতের উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে তাঁর মতকে।

৯. তাঁর অনুসরণ অনুকরণ করা : হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্র রাসূলরূপে বিশ্বাসকারী প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হলো জীবনের সকল পর্যায়ে তাঁর অনুসরণ ও তাঁর অনুকরণ করা এবং তাঁর সুন্নাত বা জীবনাদর্শই মুসলিমের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।

১০. রিসালাতে সাক্ষ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ : রিসালাতে সাক্ষ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান করা। তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মানবজাতির নেতা, নবী-রাসূলদের প্রধান। তিনি আল্লাহ্র প্রিয়তম বান্দা, তাঁর হাবীব, তাঁর সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা, সর্বযুগের সকল মানুষের নেতা। তিনি ছিলেন নিষ্পাপ। নবুয়ত প্রাপ্তির আগে ও নবুয়তের পরে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ্ তাঁকে সকল পাপ, অন্যায় ও অপরাধ থেকে রক্ষা করেছেন। প্রথম মানব আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির সময়ই আল্লাহ তাঁর জন্য নবুয়ত নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং তাকে সর্বশেষ নবী হিসাবে মনোনীত করেছেন। তিনি আল্লাহ্র বান্দা, দাস ও মানুষ ছিলেন। তবে মহান আল্লাহ্ তাঁকে অগনিত অলৌকিক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

১১. নবীজীর মর্যাদা ও সম্মান : মুসলিমের দায়িত্ব হলো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস ও তাঁর সম্মান প্রদান মুসলিম বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে তাঁর সম্মান, মর্যাদা, দায়িত্ব, ক্ষমতা, অধিকার ও আল্লাহ্র সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শেখান হয়েছে। মুসলিমের দায়িত্ব হলো, তাঁর ব্যাপারে কুরআন কারীমে বা সহীহ হাদীসে যা বলা হয়েছে তার সবকিছু পরিপূর্ণভাবে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করা। নিজের থেকে কোন কিছু বাড়িয়ে বলা যাবে না, কারণ তা আমাদেরকে মিথ্যা ও বাড়াবাড়ির পথে ঠেলে দেবে, যা কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে বারংবার কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

১২. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ : কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের আলোকে একজন মুমিন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, সকল মর্যাদা ও সম্মানসহ তিনি একজন মানুষ ছিলেন। সৃষ্টির উপাদানে, মানবীয় প্রকৃতি ও স্বভাবে তিনি ছিলেন একজন মানুষ। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁর মূল বৈশিষ্ট্য তাঁর মহান কর্মে, তাঁর মহত্তম চরিত্রে। উপাদানে, সৃষ্টিতে, প্রকৃতিতে অন্য সবার মত হয়েও তিনি সকল মানবীয় দুর্বলতা জয় করেছিলেন। আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসা, আস্থা, ইবাদত, বিধান পালন, ন্যায়বিচার, সেবা ইত্যাদি সকল দিকে মানবতার পূর্ণতম নিদর্শন ও আদর্শ ছিলেন তিনি। এটাই ছিল তাঁর অন্যতম মু'জিজা। তিনি মানবতার পূর্ণতার শিখরে উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

১৩. অলৌকিক বৈশিষ্ট্য : এগুলির সাথে সাথে মহান আল্লাহ্ তাকে অতিরিক্ত কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, যেগুলি কোন মানুষকে দেন নি। যেমন সাধারণ মানুষের মত তাঁর শরীরের ঘামে কোন দুর্গন্ধ ছিল না, বরং তাঁর শরীরের ঘাম ছিল অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত। তাঁর ঘুম সাধারণ মানুষের মত ছিল না, তিনি ঘুমালে তার চোখ ঘুমাত, আর তাঁর অন্তর সজাগ ও সচেতন থাকত। তিনি তার পিছন দিকেও দেখতে পেতেন। অনুরূপ যত বৈশিষ্ট্য সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সবই আমরা কোনরূপ অপব্যাখ্যা, বাড়াবাড়ি, তুলনা বা সন্দেহ ছাড়া বিশ্বাস করি।

১৪. গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান : আল্লাহ তাঁকে দুনিয়া, আখেরাত, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির অনেক কিছু জানিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের জ্ঞানের উর্ধ্বে অনেক গোপনীয় ও ভবিষ্যতের জ্ঞান তাকে আল্লাহ্ দান করেন। সাথে সাথে কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে বারবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, সার্বিক ভবিষ্যতের কথা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানেন না। আল্লাহ্র জানানো বিষয় ছাড়া কোন ভবিষ্যত কথা, মনের গোপন কথা, বর্তমানের লুকায়িত কথা, গোপনকৃত তথ্য ইত্যাদি তিনি জানতেন না বলে তিনি আমাদেরকে কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে বারবার জানিয়েছেন। আমরা তাঁর সকল কথা সরলভাবে বিশ্বাস করি। এক আয়াত দ্বারা আরেক আয়াতকে বা এক হাদীস দ্বারা অন্য হাদীসকে বাতিল বা অপব্যাখ্যা করি না, কোন একটির জন্য বাড়াবাড়ি করি না বা অতি ভক্তি করি না। আল্লাহ্ ও তাঁর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল কথা সরলভাবে হুবহু মেনে নেওয়াই সর্বোচ্চ ভক্তি।

১৫. নবীজীর ক্ষমতা : আল্লাহ্র আবদ (দাস) ও রাসূল হিসাবে তাঁকে আল্লাহ মানবজাতিকে সতর্ক করা ও সুসংবাদ প্রদান করার দায়িত্ব দান করেন। বিশ্ব জগতের পরিচালনা, কারো মঙ্গল বা অমঙ্গল করার দায়িত্ব বা ক্ষমতা আল্লাহ তাঁকে দেননি। তাঁকে আল্লাহ্ অনেক মুজিযা বা অলৌকিক নিদর্শন দান করেছেন। তাঁর দু'আয় আল্লাহ অগণিত অলৌকিক কর্ম সম্পন্ন করেছেন। এসকল আয়াত

(অলৌকিক নিদর্শনসমূহ) বা মুজিযা সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় সংঘটিত হয়েছে।

১৬. রাসূলের দু'আ ও শাফায়াত : তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতেন, আর দু'আ কবুল করা বা না করা পুরোপুরিই আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে। তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয়তম বান্দা। তার অনেক দু'আ আল্লাহ্ কবুল করেছেন। আবার কখনো কখনো কবুল করেনি। অনেক সময় তিনি বদদোআ করলে আল্লাহ তাঁকে নিষেধ করেছেন। তাঁর দু'আয় আল্লাহ্ অসংখ্য মানুষের গোনাহ মাফ করেছেন। আল্লাহ্‌র অনুমতিতে তিনি শাফায়াত করবেন এবং তাঁর শাফায়াতে অসংখ্য পাপী মুসলিমকে আল্লাহ্ দোযখ থেকে মুক্তি দেবেন। তবে তার দু'আ ও শাফায়াত কবুল করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। আল্লাহ্‌র রহমত ও তাঁর রাসূলের দু'আর কল্যাণ পাওয়ার যোগ্য কে তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

১৭. নবীজীর মৃত্যু পরবর্তী জীবন : তিনি অন্যান্য সকল মানুষের মত মরণশীল। তিনি যথা সময়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ্ তাঁকে মৃত্যুর পরে বিশেষ বারযাখী জীবন দিবেন যাতে তিনি সালাত পড়বেন, উম্মতের দরূদ সালাম ফিরিশতাগণ তাঁর কাছে পৌঁছাবেন, তিনি জবাব দিবেন ও দু'আ করবেন। হাদীসে বর্ণিত এসকল বিষয় আমরা সরলভাবে বিশ্বাস করি। এগুলির উপর নির্ভর করে বাড়িয়ে অন্য কিছু বলি না। আমরা বলি না যে, যেহেতু তাঁর বিশেষ জীবন আছে, সেহেতু তিনি খাওয়া দাওয়া করেন, অথবা ঘুরে বেড়ান, ইত্যাদি। তিনি আমাদের যতটুকু জানার প্রয়োজন তা জানিয়ে দিয়েছেন, তার বেশি বলার অর্থ তাঁর নামে অনুমান করে মিথ্যা কথা বলা, যা কঠিনতম পাপ ও জাহান্নামের কারণ।

১৮. প্রশংসায় ভক্তিকে বাড়াবাড়ি না করা : তিনি নিজে তাঁর বিষয়ে বাড়াবাড়ি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা আমার প্রশংসায় ভক্তিতে বাড়াবাড়ি করবে না, যেমনভাবে খৃষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিলো। আমি তো একজন দাস-মানুষ মাত্র, কাজেই তোমরা বলবে: আল্লাহ্‌র দাস (বান্দা) বা রাসূল।" (সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী ৬ খণ্ড ৪৭৮ পৃ. নং ১৩৪৪৫, মুসনাদে আহমাদ ১/২৩, ২৪, ৪৭, ৫৫, ৬০)

একদা এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন : "আল্লাহ্‌র মর্জিতে এবং আপনার মর্জিতে" তিনি ঐ ব্যক্তিকে ধমক দিয়ে বলেন : "তুমি আমাকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য বানিয়ে দিচ্ছ? বরং একমাত্র আল্লাহ্‌রই মর্জিতেই।" (মুসনাদে আহমাদ ১/২১৪. ১৩১১৭, ১৩১৮৪) এক ব্যক্তি বলেন : ইয়া মুহাম্মাদ, ইয়া সাইয়্যেদানা, ইবনা সাইয়্যেদানা, খাইরানা, ইবনা খাইরানা : হে মুহাম্মাদ, হে আমাদের নেতা, আমাদের নেতার পুত্র,

আমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ও শ্রেষ্ঠ মানুষের সম্ভ্রান্ত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "হে মানুষেরা, তোমরা তাকওয়া (আল্লাহ্ ভীতি) অবলম্বন করে চল। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিপদগামী বা প্রবৃত্তির অনুসারী করে না ফেলে। আমি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্– আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ, আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু আমাকে যে স্থানে রেখেছেন, যে মর্যাদা প্রদান করেছেন, তোমরা আমাকে তার উপরে উঠাবে তা আমি পছন্দ করি না।" (মুসনাদে আহমদ, নং ১২১৪১, ১৩১১৭, ১৩১৮৪)

১৯. নবীজীর ভালবাসা : 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এই বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো যে, এই বিশ্বাস পোষণকারী অবশ্যই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকল মানুষের উর্ধ্বে ভালবাসবেন। তাঁর মহান সাহাবীগণ ও তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বংশধরকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা তাঁর ভালবাসার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এখানে বুঝতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ্‌র ভালবাসা কোন মুখের দাবীর ব্যাপার নয়। তাঁর নির্দেশিত পথে চলা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা, তাঁর শরীয়তকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করা, তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকাই হলো তার মহব্বতের প্রকাশ। যিনি যত বেশী তাঁর শরীয়তকে মেনে চলবেন এবং তাঁর সুন্নত মত জীবন যাপন করবেন, তাঁর ভালবাসা তত বেশি গভীর হবে। সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ, ইমামগণ কর্ম ও অনুসরণের মাধ্যমেই তাঁকে ভালবেসেছেন।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার অর্থ হলো তাঁর উপর ঈমান আনা, তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ও সকল নবীর নেতা ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল বলে বিশ্বাস করা, তার সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা এবং সবকিছুর উর্ধ্বে তাঁকে সম্মান দান করা, তাঁর জন্য বেশি বেশি করে দরূদ ও সালাম পাঠ করা, তাঁর জীবনী, শিক্ষা, আদেশ-নিষেধ ভালভাবে জানার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা। যথাসম্ভব বেশি বেশি তাঁর জীবনী, আকৃতি, প্রকৃতি, কর্ম ও আদর্শ আলোচনা করা। এভাবেই মুসলিমের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালবাসা গভীর হতে থাকে, তখন জীবনের সবকিছুর উর্ধ্বে, সকল মানুষের উর্ধ্বে, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও তাকে ভালবাসতে সক্ষম হয় একজন মুসলিম। আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত অনুসরণের ও প্রকৃত ভালবাসার তাওফীক দান করেন। আমীন।

৫. আখিরাতের উপর ঈমান

আখেরাত বা পরকালের উপর ঈমানের অর্থ হলো মৃত্যুর পরে কী ঘটবে সে বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা। যেমন, মৃত্যু পরবর্তী কবরের জিজ্ঞাসাবাদ, পুরস্কার ও শাস্তির কথা বিশ্বাস করা। কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের আগের আলামত বা চিহ্নসমূহ বিশ্বাস করা। কিয়ামত বা মহাপ্রলয় হবে বা একসময় এই মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করা।

হাশর বা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পরে একসময় আল্লাহ বিশ্বকে পুনরায় তৈরি করবেন। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাইকে পুনরায় জীবিত ও একত্রিত করবেন। সকলের কর্মের হিসাব গ্রহণ করবেন, আমলনামা প্রদান করবেন, মীযানে মানুষের কর্ম ওজন করবেন ও বিচার করবেন। পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করবেন। আল্লাহ পুরস্কার ও শাস্তির জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। সৎকর্মশীলগণ জান্নাতের পুরস্কার ও নিয়ামত লাভ করবেন। অবিশ্বাসী ও অসৎ মানুষেরা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবেন।

হাশরের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সৎকর্মশীল ও তাঁর সুন্নাতের অনুসারী উম্মতকে "কাউসার"-এর পানি পান করাবেন। তিনি ও অন্যান্য নবী ও নেককার মানুষেরা আল্লাহ্‌র অনুমতিতে শাফাআত বা সুপারিশ করবেন। তাঁদের শাফা'আতে আল্লাহ অনেককে ক্ষমা করবেন ও মুক্তি দিবেন। জাহান্নামের উপর সিরাত, জান্নাতে আল্লাহ্‌র দর্শন ইত্যাদি সকল বিষয়ে বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রোকন।

আখিরাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও তৎসংশ্লিষ্ট আকীদা

১. কবর : আমরা জানি যে, প্রত্যেকটি নফসকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং মৃত্যুর মাধ্যমেই আখিরাতে প্রবেশ করতে হয়। আর আখেরাতের প্রথম ঘাঁটি হলো কবর। হযরত উসমান (রা:) কোন কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি ভিজিয়ে ফেলতেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কবর আখিরাতের প্রথম ঘাঁটি। যে ব্যক্তি কবরে নাজাত পাবে পরবর্তী বিষয়গুলি তার জন্য সহজতর হবে। আর কবর থেকে যে রক্ষা পাবে না তার জন্য পরবর্তী অবস্থা আরো কঠিনতর হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, কবরের চেয়ে অধিক ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি কখনোই দেখিনি। (তিরমিযী, ৪/৫৫৩) কবর আখেরাতের প্রথম ধাপ। কবর কাফের ও মুনাফেকের জন্য আগুনের গর্ত, মুমিনের জন্য শান্তির

বাগিচা। বিভিন্ন পাপের কারণে কবরে আযাব হবে। যেমনঃ পেশাব থেকে পবিত্র না থাকা, চুগোলখোরী করা, গনীমতের সম্পদ চুরি করা, সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে থাকা, কুরআন পরিত্যাগ করা, ব্যভিচার করা, পুরুষে পুরুষে সমকামিতা করা, সুদ খাওয়া, ঋণ পরিশোধ না করা ইত্যাদি। এমনিভাবে বিভিন্ন নেক আমলের মাধ্যমে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। যেমনঃ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নেক আমল করা, কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, সূরা মূলক পাঠ করা ইত্যাদি। কবরের আযাব থেকে বাঁচানো হবেঃ শহীদদেরকে, মুসলমান দেশের সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত থেকে মৃত্যু বরণকারীকে, শুক্রবার ও পেটের পিড়ায় মৃত্যুবরণকারীকে।

২. শিঙ্গায় ফুৎকার : একটি বিশাল শিঙ্গা মুখে নিয়ে ইসরাফীল (আ:) আদেশের অপেক্ষায় আছেন। আদেশ পেলেই তিনি তাতে ফুৎকার দিবেন। দু'বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। আতংকের ফুৎকারঃ ১ম বার শিঙ্গায় ফুৎকারের সাথে সাথে চতুর্দিকে মহা আতঙ্ক, আর্তনাদ এবং বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ্ বলেন:

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

''যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন আল্লাহ্ যাকে চান সে ব্যতীত আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে।" (সূরা নমল: ৮৬) সে সময় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

এর চল্লিশ দিন পর পুনরুত্থানের জন্য দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে:

ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنظُرُوْنَ

"অতঃপর পুনরায় তাতে ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে সকলে দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে।" (সূরা যুমার: ৬৭)

৩. পুনরুত্থান : এরপর আল্লাহ বৃষ্টি নাযিল করবেন। তখন মানুষ স্বশরীরে উঠবে। মেরুদণ্ডের হাড্ডির শেষাংশ থেকে তাদের শরীর তৈরি করা হবে। মানুষ নতুন ভাবে সৃষ্টি হবে। তাদের আর মৃত্যু হবে না। নগ্ন পদ ও উলঙ্গ হয়ে সকলে উত্থিত হবে। মানুষ ফেরেশতা ও জিনদেরকে দেখতে পাবে। প্রত্যেককে তার আমল অনুসারে উত্থিত করা হবে।

৪. হাশর : সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ্ হিসাবের জন্য একত্রিত করবেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে অসংখ্য স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এক স্থানে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ

"সেইদিন আল্লাহ্ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী।" (সূরা নূর : ২৫)

সবাই আতঙ্কগ্রস্থের মত বিকারগ্রস্ত অবস্থায় থাকবে। দিনটি ৫০ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ হবে। দুনিয়ার জীবন তাদের কাছে এক ঘণ্টার মত মনে হবে। সূর্য মাথার ওপর এক মাইল দূরত্বে অবস্থান করবে। প্রত্যেক মানুষ তার আমল অনুসারে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। এদিন দুর্বল অহংকারীরা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। কাফের তার বন্ধুর সাথে এবং শয়তানও তার সাথীর সাথে বিতর্ক করবে। তারা একে অপরকে লা'নত করবে। অত্যাচারী নিজের হাতকে দংশন করবে। সেদিন জাহান্নামকে ৭০ হাজার শিকল দিয়ে সামনে টেনে নিয়ে আসা হবে। প্রত্যেক শিকলকে ৭০ হাজার ফেরেশতা ধরে টানবে। কাফের জাহান্নাম থেকে নিজের জান বাঁচানোর জন্য মুক্তিপণ দিতে চাইবে। অথবা চাইবে সে যেন মাটির সাথে মিশে যায়। কিন্তু পাপীদের মধ্যে যারা যাকাত দিত না তাদের সম্পদকে আগুনে চ্যাপ্টা করে তাকে ছ্যাঁকা দেয়া হবে। অহংকারীদেরকে পিঁপড়ার মত ক্ষুদ্র করে উঠানো হবে। বিশ্বাসঘাতক, গনীমতের সম্পদ চোর ও মানুষের সম্পদ আত্মসাতকারীকে সকলের সামনে লাঞ্ছিত করা হবে। চোর যা চুরি করেছিল তা নিয়ে সে উপস্থিত হবে। সকল গোপন বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়বে। কিন্তু পরহেজগারগণ, তাদের কোন ভয় থাকবে না। এ দিন যোহরের নামাযের সময়ের মত অল্পতেই শেষ হয়ে যাবে।

৫. শাফা'আত : শাফা'আত বা সুপারিশ সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, শাফা'আত এর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও শাফা'আতের অধিকার নেই। তবে মহান আল্লাহ্ অনুমতি দিলে কেউ শাফা'আত করতে পারবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে বলেন :

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

"যার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে ব্যতিত আল্লাহ্র কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না।" (সূরা সাবা : ২৩)

বৃহৎ শাফা'আতের অধিকারী শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হাশরের মাঝে সৃষ্টিকুলের দীর্ঘ কষ্ট ও বিপদের অবসান এবং তাদের হিসাব-নিকাশের জন্য তিনি সুপারিশ করবেন। এছাড়া সাধারণভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য মুমিনগণও সুপারিশ করবেন। যেমন পাপী মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য সুপারিশ। জান্নাতে মুমিনদের মর্যাদা উন্নীত করার সুপারিশ। এরপর কুরআন তার তিলাওতকারীকে, সন্তানগণ তাদের পিতা-মাতাকে, অন্যান্য ইবাদাত শাফা'আত করবে এবং তা কবুল করা হবে।

৬. হিসাব-নিকাশ : মানুষকে কাতারবন্দী করে পালনকর্তার সামনে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে তাদের আমল সমূহ দেখাবেন এবং সে সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। তাদের জীবন, যৌবন, ধন-সম্পদ, বিদ্যা এবং অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। আরো প্রশ্ন করবেন বিভিন্ন নেয়ামত, দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি, অন্তর ইত্যাদি সম্পর্কে। কাফের এবং মুনাফেককে ধমকানোর জন্য এবং তাদের উপর দলীল উপস্থাপন করার জন্য সকলের সামনে তাদের হিসাব করা হবে। মানুষ, পৃথিবী, রাত, দিন, সম্পদ, ফেরেশতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। শেষ পর্যন্ত তাদের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তারাও তা স্বীকার করবে। আর মুমিনের সাথে আল্লাহ গোপনে কথা বলবেন এবং তার অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করবেন। সবকিছু স্বীকার করার কারণে যখন সে নিজের ধ্বংস দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ্ বলবেন: "দুনিয়াতে আমি তোমার এ পাপগুলো গোপন করে রেখেছিলাম, আজ তোমাকে আমি তা ক্ষমা করে দিলাম।" (বুখারী ও মুসলিম) সর্বপ্রথম উম্মতে মুহাম্মাদীর হিসাব নেয়া হবে। আর সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব নেয়া হবে তা হচ্ছে সালাত এবং মানুষের দাবী-দাওয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম খুনের।

৭. আমলনামা প্রদান : এরপর মানুষের হাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে। তারা এমন একটি কিতাব পাবে যার মধ্যে ছোট বড় কোন কিছুই ছাড়া হয়নি, সব লিখে রাখা হয়েছে। মুমিনকে তার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে আর কাফের ও মুনাফেককে পিছনের দিক থেকে তার বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

৮. মীযান বা দাঁড়িপাল্লা : অতঃপর সৃষ্টিকুলকে তাদের আমলের প্রতিদান দেয়ার জন্য আমলনামা ওজন করা হবে। ওজনের একটি বিশেষ দিক হলো দু'পাল্লা বিশিষ্ট দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

"আর আমি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদন্ড স্থাপন করবো, সুতরাং কারও প্রতি জুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করবো। এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।" (সূরা আম্বিয়া : ৪৭)

শরীয়তসম্মত যে সমস্ত আমল একনিষ্টভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়েছে সেগুলো পাল্লাকে ভারী করবে। আরো যে সমস্ত আমল মীযানের পাল্লাকে ভারী করবে তা হচ্ছেঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সচ্চরিত্র, যিকিরঃ আলহামদু লিল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম ইত্যাদি। মানুষ তাদের সৎ আমল বা অসৎ আমলের মাধ্যমে ফল ভোগ করবে।

৯. হাউয: এরপর আল্লাহতায়ালা হযরত মুহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি পবিত্র হাউয বা জলাশয় দান করেছেন। যাকে কাউছার বলা হয়। মুমিনগণ হাউযের কাছে সমবেত হবে। যে ব্যক্তি একবার সেখান থেকে পানি পান করবে সে তারপর কখনই তৃষ্ণার্ত হবে না। প্রত্যেক নবীর আলাদা আলাদা হাউয থাকবে। তবে সবচেয়ে বৃহৎ হবে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাউযটি। এর পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা, মধু মিশ্রিত দুধের চেয়ে বেশি মিষ্টি, মিসকের চাইতে সুঘ্রাণ যুক্ত। পান পাত্র স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্মিত হবে। পান পাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের নক্ষত্র বরাবর। হাউযটির দৈর্ঘ্য হবে জর্ডানের আয়লা নামক এলাকা থেকে ইয়ামানের আদন নামক এলাকা পর্যন্ড়। (বুখারী ঃ ৫/২৪০৫, মুসলিম ৪/১৭৯৩, ৪/১৮০০)

১০. সিরাত : জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি রাস্তা বা ব্রিজ স্থাপন করা হবে। যে রাস্তা বা ব্রিজ দিয়ে নবীগণ, সিদ্দিকগণ, কাফিরগণ, সকলকেই অতিক্রম করতে হবে। মুমিনগণ তা পার হয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবরণ দিয়েছেন: "এর পথ এমন পিচ্ছিল হবে যে তাতে পা স্থির থাকবে না। দু'পার্শ্বে এমন কিছু থাকবে যা ছোঁ মেরে নিবে এবং লোহার আঁকড়া থাকবে এবং সা'দান নামক গাছের কাঁটার মত শক্তিশালী কাঁটা থাকবে, এগুলো মানুষের গোস্ড় ছিঁড়ে নিবে। সিরাত চুলের চাইতে চিকন ও তরবারীর চাইতে ধারালো হবে।" (মুসলিম, ১/১৬৪) এ সময় মুমিনদেরকে তাদের আমল অনুসারে আলো দেয়া হবে। যার আমল সবচেয়ে বেশী হবে তার আলো হবে পাহাড়ের মত বিশাল। আর যার আলো সবচেয়ে কম হবে, তার আলো হবে অতি ক্ষুদ্র, যা তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের এক পাশে থাকবে। ঐ আলোক রশ্মিতে তারা সিরাত পার হবে। মুমিন ব্যক্তি কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুতের বেগে, কেউ ঝড়ের বেগে, কেউ পাখীর মতো, কেউ দ্রুতগামি ঘোড়ার মত, কেউ সাধারণ সোয়ারীর মত সিরাত অতিক্রম করবে। "তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিরাপদে পার হবে, কারো শরীরের গোস্ড় ছিঁড়ে যাবে, কেউ আবার জাহান্নামে পড়ে যাবে।" (বুখারী ৬/২৭০৭) কিন্তু মুনাফেকরা কোন আলো পাবে না। তারা মুমিনদের কাছে আলো ভিক্ষা চাইবে। তাদেরকে বলা হবে, পিছনে ফিরে গিয়ে আলো অনুসন্ধান করো। আলোর খোঁজে ফিরে গেলে তাদের মাঝে এবং মুমিনদের মাঝে একটি দেয়াল খাড়া করে দেয়া হবে। তারপরও তারা সিরাত পার হওয়ার জন্য অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে জাহান্নামের মধ্যে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

১১. জাহান্নাম : জাহান্নাম সম্পর্কে কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের ভয়াবহতা থেকে মুমিনদের রক্ষা করার কথা

উল্লেখ করে বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর; যাতে নিয়োজিত আছে পাষান হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফিরিশতাগণ। তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করেন না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করেন।"

(সূরা তাহারীম : ৬)

প্রথমে কাফেররা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তারপর পাপী মুমিনরা, তারপর মুনাফেকরা। প্রত্যেক এক হাজার লোকের মধ্যে নয় শত নিরানব্বই জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। জাহান্নামের রয়েছে ৭টি দরজা। জাহান্নামের আগুনের তাপমাত্রা দুনিয়ার আগুনের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী। কাফেরের দেহকে বিশাল আকারে সৃষ্টি করা হবে যাতে করে সে শাস্ড়ি অনুধাবন করতে পারে। তার দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান তিনদিনের রাস্ড়া বরাবর প্রশস্ড় হবে। তার দাঁতের মাড়ি হবে উহুদ পাহাড়ের মত। শরীরের চামড়া খুবই মোটা হবে। বারবার শাস্ড়ি দেয়ার জন্য বারবার ঐ চামড়াকে পরিবর্তন করা হবে। পান করার জন্য কঠিন গরম পানি তাদেরকে দেয়া হবে। পান করার সাথে সাথে নাড়ি-ভুঁড়ি গলে বের হয়ে যাবে। খাদ্য হবে যাক্কুম, কাঁটা ও পুঁজ। যাদেরকে সর্বনিম্ন শাস্তি দেয়া হবে তা হচ্ছে, তার দু'পায়ের নিচে দু'টি গরম পাথর রেখে দেয়া হবে, ফলে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটবে। জাহান্নাম এত গভীর হবে যদি তার উপরাংশে কোন কিছু ছেড়ে দেয়া হয় তবে নিম্নাংশে পৌঁছতে সত্তর বছর সময় লাগবে। জাহান্নামের ইন্ধন হবে কাফের ও পাথর। এখানকার বাতাস অত্যন্ড় বিষাক্ত। ছায়াও ভীষণ গরম। পোষাক হবে আগুনের। সবকিছু ভস্ম করে ফেলবে; কিছুই বাদ দিবে না। জাহান্নাম ক্রোধান্বিত হয়ে চিৎকার করতে থাকবে। শরীরের চামড়া জ্বালিয়ে হাড্ডি ও অন্ড্র পর্যন্ড় পৌঁছে যাবে।

১২. জান্নাত : জান্নাত সম্পর্কে কুরআনে অনেকগুলো আয়াত বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُوْنٍ يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِيْنَ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ يَدْعُوْنَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِيْنَ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُوْلَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ

الْجَحِيْمِ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

"নিশ্চয় খোদাভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে। উদ্যানরাজি ও ঝরণা সমূহে। তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমী বস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে আনতলোচনা স্ত্রী দেব। তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফলমূল আনতে বলবে। তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতিত এবং আপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহাসাফল্য। আমি আপনার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা স্মরণ রাখে।" (সূরা দুখান : ৫১-৫৭)

মুমিনদের শেষ ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত। জান্নাতের দেয়ালের ইট হবে একটি স্বর্ণের, আরেকটি রৌপ্যের। মিসকের মিশ্রণ দিয়ে তা গাঁথা হবে। উহার কঙ্কর হবে মতি ও ইয়াকূতের। মাটি হবে জাফরানের। জান্নাতের ৮টি দরজা থাকবে। একেকটির প্রশস্ড়তা তিন দিনের রাস্ড়া বরাবর দূরত্বের সমান। কিন্তু তারপরও সেখানে ভীড় থাকবে। জান্নাতে ১০০টি স্ড়র থাকবে। একটি স্ড়র থেকে অপরটির দূরত্ব আকাশ ও যমীনের দূরত্ব বরাবর। সর্বোচ্চ স্ড়রের নাম হচ্ছে 'ফেরদাউস'। সেখান থেকেই সকল নদী প্রবাহিত হবে। জান্নাতের ছাদের উপরে আল্লাহর আরশ অবস্থিত। তার নদীগুলো হচ্ছে: একটি মধুর, একটি দুধের, একটি শরাবের ও একটি পরিষ্কার পানির। সেগুলো প্রবাহিত হবে অথচ তার জন্য গর্তের দরকার হবে না। মুমিন যেভাবে ইচ্ছা তা প্রবাহিত করতে পাবে। খাদ্য-সামগ্রী সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকবে। সেগুলো নিকটেই থাকবে। আদেশ করলেই উপস্থিত হয়ে যাবে। তাদের তাঁবুগুলো হবে মণি-মুক্তা দ্বারা নির্মিত। যার ভিতরের প্রশস্ড়তা হবে ষাট মাইল। তাঁবুর প্রত্যেক কর্ণারে পরিবারের লোকেরা থাকবে। জান্নাতীরা হবে পশম ও দাড়ি-গোঁফবিহীন, কাজল কালো চোখ বিশিষ্ট সুদর্শন যুবক। তাদের যৌবনে কোন দিন ভাটা পড়বে না, পরণের কাপড় পুরাতন হবে না। পেশাব, পায়খানা ও ময়লা-আবর্জনা থাকবে না। তাদের চির ী হবে স্বর্ণের। শরীরের ঘাম হতে মিসক-আম্বরের মত সুঘ্রাণ ছড়াবে। স্ত্রীরা হবে অতিব সুন্দরী, প্রেমময়ী, নবকুমারী, সমবয়সী। সর্বপ্রথম যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, অতঃপর অন্যান্য নবী-রাসূলগণ। সর্বনিম্ন জান্নাতের অধিকারী যে হবে সে যা কামনা করবে তার দশগুণ বেশী তাকে দেয়া হবে। জান্নাতের খাদেমরা হবে শিশু-কিশোর। তাদেরকে দেখে মনে হবে যেন মুক্তা ছড়ানো আছে। জান্নাতের সবচেয়ে বড় নে'য়ামত হবে আল্লাহকে স্বচক্ষে দর্শন, তাঁর রেযামন্দী এবং চিরস্থায়ীত্ব। হে আল্লাহ, আমাদেরকে এই

জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমিন।

কিয়ামাত ও তার আলামত (পূর্বাভাস) সম্বন্ধে আকীদা

১. কিয়ামাত : ঈমানদারগণ এ কথা বিশ্বাস করেন যে, কিয়ামত তথা মহাপ্রলয় অবশ্যই আসবে। তবে তার নির্ধারিত সময় বা ক্ষণ আল্লাহতায়ালা ছাড়া আর কেউই জানেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

"আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও জমিনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে, অজান্তেই এসে যাবে। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহ্‌র নিকটই রয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ লোকেই উপলব্ধি করেনা।" (সূরা আ'রাফ : ১৮৭)

এছাড়া আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : "প্রশ্নকারীর চেয়ে প্রশ্নকৃত ব্যক্তি এ বিষয়ে বেশি জানেনা। আমি তোমাদেরকে কিয়ামতের আলামত বলবো। যখন দাসী তার প্রভূকে জন্ম দেবে। যখন অবলা উটের রাখালগণ সুউচ্চ ইমারত-অট্টালিকা নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে। কিয়ামতের জ্ঞান পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। অত:পর তিনি তিলাওয়াত করেন: "নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান.....।" (বুখারী ১/২৭, মুসলিম ১/৩৯) তাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, কিয়ামতের সময় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জানাননি। তবে কিয়ামতের কিছু আলামত বা পূর্বাভাস তিনি জানিয়েছেন।

২. কিয়ামাতের আলামত বা পূর্বাভাস : পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ

"তারা শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, কিয়ামত অকস্মাৎ তাদের কাছে এসে পড়ুক। বস্তুত কিয়ামতের লক্ষণ সমূহ তো এসেই পড়েছে। সুতরাং কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?" (সূরা মুহাম্মদ : ১৮)

কিয়ামত সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফের আলোকে আলিমগণ কিছু বিষয়কে "আলামাতে সুগরা" অর্থাৎ "ক্ষুদ্রতর আলামত" এবং কিছু বিষয়কে "আলামাতে কুবরা" অর্থাৎ "বৃহত্তর আলামত" বলে উল্লেখ করেছেন।

২.১. আলামাতে সুগরা : আল্লাহ তা'আলা কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, কিয়ামতের পূর্বাভাস প্রকাশিত হয়েছে। এসকল পূর্বাভাসের অন্যতম হলো খাতামান নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন। সাহল ইবন সাদ আস সায়িদী (রা:) বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্রিত করে বলেন "আমি প্রেরিত হয়েছি কিয়ামতের সাথে এভাবে পাশাপাশি"। (বুখারী ৪/১৮৮১, মুসলিম ২/৫৯২)

উপরের এই আলামত ছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে কিয়ামতের আরও অনেক আলামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামাতের পূর্বে সামগ্রিকভাবে মানুষের জাগতিক উন্নতি ঘটবে, জীবন যাত্রা উন্নত হবে। অল্প সময়ে মানুষ অনেক সময়ের কাজ করবে। অধিকাংশ মানুষ অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছল বা স্বাবলম্বী হবে। মানুষের ধার্মিকতা কমে যাবে, নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে। এছাড়া কিয়ামতের পূর্বে আরব উপদ্বীপে নদ-নদী প্রবাহিত হবে এবং ক্ষেত-খামার ছড়িয়ে পড়বে। মক্কার বাড়িঘরগুলো মক্কার পাহাড়গুলো ছাড়িয়ে উর্ধ্বে উঠে যাবে। মক্কার মাটির নীচে সুড়ঙ্গগুলো একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত হবে, পাহাড়গুলো স্থানচ্যুত হবে। ইরাকের ফুরাত নদীর তলদেশ থেকে স্বর্ণ বা সম্পদ প্রকাশিত হবে, সে কারণে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বিগ্রহ ছড়িয়ে পড়বে। পাপ, অনাচার ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে। মিথ্যা ও ভন্ড নবীগণের আবির্ভাব ঘটবে। হত্যা, সন্ত্রাস ও বৃহৎ পরিসরের যুদ্ধ হতে থাকবে। এ সকল আলামতের এক পর্যায়ে বিশেষ বা বড় আলামত গুলো প্রকাশিত হবে।

২.২. আলামতে কুবরা : সাহাবী হুযাইফা ইবনু আসীদ (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফাতের মাঠে (বিদায় হজ্জের সময়ে) অবস্থান করছিলেন। আমরা তাঁর থেকে নিচু স্থানে অবস্থান করছিলাম। তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, তোমরা কি বিষয়ের আলোচনা করছ? আমরা বললাম: আমরা কিয়ামতের আলোচনা করছি। তিনি বলেন "দশটি আয়াত বা নিদর্শন না ঘটা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না : (১) পূর্ব দিকে ভূমিধ্বস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় (ভূপৃষ্ঠ যমীনের মধ্যে ডুবে যাওয়া), (২) পশ্চিমদিকে ভূমিধ্বস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, (৩) আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, (৪) ধোয়া (ধুম্র) প্রকাশ, (৫) দাজ্জালের আবির্ভাব, (৬) ভূমির প্রাণী (দাব্বাতুল আরদ)-এর আবির্ভাব, (৭) ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাব, (৮) পশ্চিম দিক থেকে

সূর্যোদয়, (৯) এডেনের ভূগর্ভ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে মানুষদেরকে তাড়িয়ে নেওয়া এবং (১০) ঈসা ইবনু মরিয়াম (আ:)- এর অবতরণ। (মুসলিম ৪/২২২৫-২২২৬)

৩. ইমাম মাহদী সম্বন্ধে আকীদা : উপরের হাদীসে কিয়ামতের দশটি পূর্বভাসের মধ্যে 'ইমাম মাহদীর' বিষয় উল্লেখ করা হয় নি। তবে বিভিন্ন হাদীসে কিয়ামতের পূর্বে 'ইমাম মাহদী'র আবির্ভাবের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "দুনিয়ার যদি একটি দিনও বাকি থাকে তবে আল্লাহ সে দিনটিকে দীর্ঘায়িত করে আমার বংশধর থেকে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যার নাম ও পিতার নাম আমার নাম ও আমার পিতার নামের মতই হবে। তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করবেন, আরবদের উপর রাজত্ব গ্রহণ করবেন, জুলুম পূর্ণ পৃথিবীকে ইনসাফে পূর্ণ করবেন।" (তিরমিযী : ৪/৫০৫, ২২৩০, ২২৩১)

এছাড়া উম্মু সালামা (রা:) বলেন, "মাহদী আমার বংশের, ফাতিমার বংশধর থেকে।" (আবূ দাউদ, ৪/১৭৪, ৪২৮৬)

এছাড়া বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আলেমগণ বলেন যে, ইমাম মাহদীর সময়েই ঈসা (আ:) অবতরণ করবেন এবং তাঁরই ইমামতিতে তিনি সালাত আদায় করবেন।

'ইমাম মাহদী' বলতে একজন হেদায়াতপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান বুঝানো হয়েছে। যিনি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করলে বিশ্বে প্রাচুর্য, শান্তি, ইনসাফ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশধর এবং ৭ বা ৯ বছর রাজত্ব করবেন। তার রাজত্বকালেই ঈসা (আ:) অবতরণ করবেন। তার ইমামত, খিলাফত বা শাসন আরবদেশ কেন্দ্রিক হবে।

এমনি ভাবে সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা বিশ্বাস করে মেনে নেওয়া ঈমানের দাবী। ইমাম তাহবী (রহ:) বলেন : "আমরা কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করি, যেমন দাজ্জালে আবির্ভাব, ঈসা (আ:)-এর অবতরণ, পশ্চিম আকাশ দিয়ে সূর্যোদয় এবং দাব্বাতুল আরদ (যমীনের জীব) নামে পরিচিত এক বিশেষ জন্তুর স্বীয় স্থান থেকে বের হওয়া। আমরা গণক, জ্যোতিষী বা ভবিষ্যৎ বক্তার কথা বিশ্বাস করি না। অনুরূপভাবে এমন কোনো ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করি না যে, আল্লাহর কিতাব, নবীর সুন্নাত ও উম্মতে ইসলামীর ঐক্যমতের বিপরীত কিছু দাবী করে।" (মাতনুল আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ২০)

তা ছাড়াও কুরআন হাদীসের অর্থগুলো মুমিনদেরকে সরল অর্থে বিশ্বাস করা দায়িত্ব। অধিকাংশক্ষেত্রে এ বিষয়ক ভিত্তিহীন বিতর্ক থেকে আমাদের বেচে থাকা

দরকার। যেমন, দাজ্জাল কে?, ইয়া'জূজ মা'জূজ কারা হতে পারে, তারা কি তাতার? চেঙ্গিশ খানের বাহিনী? চীন জাতি? কোথায় তারা থাকে? তারা বের হয়েছে, না বের হবে? সন্দেহ করে এসব বিষয়ে গবেষণা করা, বিভিন্ন দেশের জাতিকে দাজ্জাল বা ইয়া'জূজ মা'জূজ ধারণা করা এবং বিতর্কে লিপ্ত হয়ে ঈমানদারের কোন লাভ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দেন। আমিন।

৪. দাজ্জাল সম্বন্ধে আকীদা : দাজ্জাল শব্দের অর্থ প্রতারক, ধোঁকাবাজ। আল্লাহ তা'আলা শেষ যমানায় লোকদের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য একজন লোককে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করবেন। আবু হুরাইয়া (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের বিষয়ে একটি কথা বলব যা কোনো নবী তাঁর জাতিকে বলেননি; তা হলো যে, দাজ্জাল কানা। আর সে তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের নমুনা নিয়ে আসবে। যাকে সে জান্নাত বলবে সেটিই জাহান্নাম।" (মুসলিম : ৪/২২৫০)

এছাড়া বুখারীর বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে আমরা জানতে পারি তার এক চোখ কানা আর এক চোখ টেরা থাকবে। চুল কোঁকড়া ও লাল বর্ণের হবে, সে খাটো দেহের অধিকারী হবে। তার দুই চোখের মধ্যবর্তি স্থানে كَافِرٌ অর্থাৎ, কাফের লেখা থাকবে। সকল মু'মিনই সে লেখা পড়তে পারবে। ইরাক ও শাম দেশের মাঝখানে তার অভ্যুত্থান হবে। সে ইয়াহুদী বংশোদ্ভুত হবে। প্রথমে সে নবুওয়াতের দাবী করবে। তারপর ইস্পাহানে যাবে, সেখানে ৭০ হাজার ইয়াহুদী তার অনুগামী হবে, তখন খোদায়ী দাবী করবে। লোকেরা চাইলে সে বৃষ্টি বর্ষণ করে দেখাবে, মৃতকে পর্যন্ড় জীবিত করে দেখাবে, কৃত্রিম বেহেশ্‌ত দোযখ তার সঙ্গে থাকবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বেহেশ্‌ত হবে দোযখ আর তার দোযখ হবে বেহেশ্‌ত। সে আরও অনেক অলৌকিক কান্ড দেখাতে পারবে, যা দেখে কাঁচা ঈমানের লোকেরা তার দলভুক্ত হয়ে জাহান্নামী হয়ে যাবে। এক ভীষণ ফেতনা ও এক ভীষণ পরীক্ষা হবে সেটা। দাজ্জাল একটা গাধার উপর সওয়ার হয়ে ঝড়ের বেগে সমগ্র ভূখন্ডে বিচরণ করবে এবং মক্কা, মদীনা ও বায়তুল মুকাদ্দাস ব্যতীত (এসব এলাকায় সে প্রবেশ করতে পারবে না। ফেরেশতাগণ এসব এলাকার পাহারায় থাকবে।) সবস্থানে ফেতনা বিস্তার করবে। হযরত মাহ্‌দীর সময় তার আবির্ভাব হবে। সে সময় হযরত ঈসা (আ:) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং তাঁরই হাতে দাজ্জাল নিহত হবে। অভ্যুত্থানের পর দাজ্জাল সর্বমোট চল্লিশ দিন দুনিয়াতে থাকবে।

৫. হযরত ঈসা (আ:)-এর পৃথিবীতে অবতরণ সম্বন্ধে আকীদা :

মহান আল্লাহ কুরআন পাকে ইরশাদ করেছেন:

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوا فِيْهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

"আর তাদের এ কথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র রাসূল। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখেনা। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর আহলে কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে। আর কিয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে।" (সূরা নিসা :১৫৭-১৫৯)

দাজ্জালের বাহিনী বায়তুল মুকাদ্দাসের চতুর্দিকে ঘিরে ফেলবে এবং মুসলমানগণ আবদ্ধ হয়ে পড়বে। ইত্যবসরে একদিন ফজরের নামাযের ইকামত হওয়ার পর হযরত ঈসা (আ:) আকাশ থেকে ফেরেশ্‌তাদের উপর ভর করে অবতরণ করবেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকের মিনারার নিকট তিনি অবতরণ করবেন এবং হযরত মাহ্‌দী উক্ত নামাযের ইমামতী করবেন। নামাযের পর হযরত ঈসা (আ:) হাতে ছোট একটা বর্শা নিয়ে বের হবেন। তাঁকে দেখেই দাজ্জাল পলায়ন করতে আরম্ভ করবে। হযরত ঈসা (আ:) তার পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং "বাবে লুদ" নামক স্থানে গিয়ে তাকে নাগালে পেয়ে বর্শার আঘাতে তাকে বধ করবেন।

মুসলমানদের আকীদা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ:)-কে আল্লাহতা'আলা স্ব-শরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন, তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণও করেননি কিংবা ইয়াহুদীরা তাঁকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যাও করতে পারেনি। তিনি আকাশে জীবিত আছেন। তিনি উপর্যুক্ত বর্ণনা অনুযায়ী দাজ্জালের আবির্ভাবের পর দুনিয়াতে আগমন করবেন এবং ৪০ বছর রাজত্ব পরিচালনা করার পর ইন্তেকাল করবেন। তাঁকে আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযা শরীফের মধ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পার্শ্বেই দাফন করা হবে। হযরত ঈসা (আ:) নবী হিসেবে আগমন করবেন না। বরং তিনি আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত হিসেবে আগমন করবেন এবং

এই শরী'আত অনুযায়ীই তিনি জীবন যাপন ও খেলাফত পরিচালনা করবেন।

৬. ইয়া'জূজ মা'জূজ সম্বন্ধে আকীদা : দাজ্জালের ফিতনা ও তার মৃত্যুর পর আসবে ইয়া'জূজ ও মা'জূজের ফিতনা। ইয়া'জূজ মা'জূজ অত্যন্ত অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মানুষ। এ বিষয় মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُم مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُوْنَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِيْنَ

"যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলে কাফেরদের চক্ষু উচ্চে স্থির হয়ে যাবে; তারা বলবে, "হায় আমাদের দূর্ভাগ্য, আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম, বরং আমরা সীমালঙ্ঘনকারীই ছিলাম।" (সূরা আম্বিয়া : ৯৬-৯৭)

ইয়া'জূজ ও মা'জূজের সংখ্যা অনেক বেশি হবে। তারা দ্রুত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং ভীষণ উৎপাত শুরু করবে, হত্যা এবং লুটতরাজ চালাতে থাকবে। তখন হযরত ঈসা (আ:) ও তাঁর সঙ্গীরা পর্বতে আশ্রয় নিবেন। হযরত ঈসা (আ:) ও মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। আল্লাহতা'আলা মহামারীর আকারে রোগ ব্যাধি প্রেরণ করবেন। বর্ণিত আছে– সেই রোগের ফলে তাদের গর্দানে এক ধরনের পোকা সৃষ্টি হবে, ফলে অল্প দিনের মধ্যে ইয়া'জূজ মা'জূজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। তাদের অসংখ্য মৃত দেহের দূর্গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। তখন হযরত ঈসা (আ:) ও তাঁর সঙ্গীদের দুআয় আল্লাহতা'আলা এক ধরনের বিরাটকায় পাখী প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় উটের ঘাড়ের মত। তারা মৃতদেহগুলো উড়িয়ে নিয়ে সাগরে বা যেখানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ফেলে দিবে। তারপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

৭. আকাশের এক ধরনের ধোঁয়া সম্বন্ধে আকীদা : হযরত ঈসা (আ:)-এর ইন্তেকালের পর কয়েকজন নেককার লোক ন্যায় পরায়ণতার সাথে রাজত্ব পরিচালনা করবেন। তারপর ক্রমান্বয়ে ধর্মের কথা কমে যাবে এবং চতুর্দিকে বে-দ্বীনি শুরু হবে। এ সময় আকাশ থেকে এক ধরনের ধোঁয়া আসবে, যার ফলে মু'মিন মুসলমানের সর্দির মত ভাব হবে এবং কাফেররা বেহুশ হয়ে যাবে। ৪০ দিন পর ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে যাবে।

৮. পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় সম্পর্কে আকীদা : তার কিছু দিন পর একদিন হঠাৎ একটি রাত তিন রাতের পরিমাণ লম্বা হবে। মানুষ ঘুমাতে ঘুমাতে ত্যক্ত হয়ে যাবে, গবাদি পশু বাইরে যাওয়ার জন্য চিৎকার শুরু করবে। তারপর

সূর্য সামান্য আলো নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। হযরত আবু যর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন সূর্য অস্তমিত হলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি কি জানো সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তা আরশের নিচে উপনীত হয়ে (আল্লাহ তা'আলাকে) সিজদা করে। অতঃপর (পুনরায় উদিত হওয়ার) অনুমতি প্রার্থনা করে এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়। অচিরেই এমন একদিন আসবে, যখন সে সিজদা করবে কিন্তু তা কবুল হবে না এবং অনুমতি চাইলে অনুমতি আর মিলবেনা, (বরং) তখন তাকে বলা হবে, যে পথে এসেছো সে পথেই ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হবে। (বুখারী ২৯৬১) এই সময় থেকে আর কারও ঈমান বা তওবা কবুল হবে না। তারপর আবার যথারীতি পূর্বের নিয়মে সূর্য পূর্বদিক থেকে উদিত এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে থাকবে।

৯. দাব্বাতুল আর্‌দ সম্বন্ধে আকীদা : পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের কিছু দিন পর মক্কা শরীফের সাফা পাহাড় ফেটে অদ্ভূত আকৃতির এক জন্তু বের হবে। একে বলা হয় "দাব্বাতুল আর্‌দ" (ভূমির জন্তু)। আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِآيَاتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ

আর যখন তাদের উপরে উক্তিটি বর্তাবে তখন তাদের জন্য আমরা বের ক'রে আনব মাটির কীট যেটি তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবে, কেননা মানুষগুলো আমাদের নির্দেশাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেনি। (সূরা নমল : ৮২)

এ প্রাণীটি মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। সে অতি দ্রুত বেগে সারা পৃথিবী ঘুরে আসবে। সে মু'মিনদের কপালে একটি নূরানী রেখা টেনে দিবে, ফলে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যাবে এবং বেঈমানদের নাকের অথবা গর্দানের উপর সীল মেরে দিবে, ফলে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে। সে প্রত্যেক মু'মিন ও কাফেরকে চিনতে পারবে। এ জন্তুর আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামত সমূহের অন্যতম। এ জন্তুটির আকার-আকৃতি সম্পর্কে ইবনে কাছীরে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে, যার অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। (মা'আরেফুল কুরআন)

১০. কিয়ামতের পূর্বক্ষণে দুনিয়ার অবস্থা ও কিয়ামত সংঘটন সম্বন্ধে আকীদা : দাব্বাতুল আর্‌দ গায়েব হয়ে যাওয়ার পর দক্ষিণ দিক থেকে একটি আরাম দায়ক বায়ু প্রবাহিত হবে। তাতে ঈমানদারদের বগলে কিছু অসুখ হবে

এবং তারা মারা যাবে। দুনিয়ায় কোন ঈমানদার ব্যক্তি ও আল্লাহ আল্লাহ করার বা আল্লাহর নাম নেয়ার কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। সারা দুনিয়ায় হাব্শী কাফেরদের রাজত্ব চলবে। তারা বায়তুল্লাহ শরীফকে শহীদ করে ফেলবে। কুরআন শরীফ অন্তর থেকে এবং কাগজ থেকে উঠে যাবে। তারপর হঠাৎ একদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে। সিঙ্গার ফুঁকে প্রথম প্রথম হালকা আওয়াজ হবে। পরে এত কঠোর ও ভীষণ হবে যে, সমস্ড় লোক মারা যাবে। জমিন ও আসমান ফেটে যাবে। পূর্বে যারা মারা গেছে তাদের রূহও বেহুশ হয়ে যাবে। সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।

৬. তাকদীর বা আল্লাহ্র নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ড়ের উপর ঈমান

তাকদীর অর্থ নির্ধারণ। তাকদীরের উপর ঈমানের অর্থ আল্লাহর জ্ঞান, লিখন, সৃষ্টি, ইচ্ছা ও ন্যায় বিচারে বিশ্বাস স্থাপন করা।

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

"আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতরণ করি।" (সূরা হিজর : ২১)

আমরা বিশ্বাস করি যে, মহিমাময় আল্লাহ্র জ্ঞান অসীম, অনন্ড় ও সর্বব্যাপী। তিনি অনাদিকাল থেকে সৃষ্টির সকল বিষয় জানেন। সৃষ্টির আগেই জানেন কখন কোথায় কি ঘটবে ও কিভাবে ঘটবে।

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান লাওহে মাহফূয বা সংরক্ষিত পত্রে লিখে রেখেছেন। আল্লাহ্র লিখন নির্দেশ নয়, বর্ণনা। লিখনের প্রকৃতি আমরা জানি না। মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

"আল্লাহ্ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে।" (সূরা রাদ : ৩৯)

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, বিশ্বের সবকিছু একমাত্র আল্লাহ্রই সৃষ্টি। তিনি ছাড়া সবই তাঁর সৃষ্ট। মানুষের কর্মও আল্লাহর সৃষ্টি। বিশ্বে যা কিছু সংঘটিত হয় সবই মহান আল্লাহ্র ইচ্ছা ও জ্ঞানের মধ্যে। তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাইরে এই মহাবিশ্বের কোথাও সামান্যতম কোন কিছুই ঘটে না।

সর্বোপরি আমরা বিশ্বাস করি যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা রয়েছে। মানুষকে আল্লাহ বিবেক, বিচার শক্তি ও জ্ঞান দান করেছেন। মানুষ তার নিজের জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করে। তবে তার কর্ম আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্যে

সংঘটিত হয়। মহান আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে মানুষের ইচ্ছা হরণ করতে পারেন। কিন্তু সাধারণত তিনি তা করেন না। তিনি মানুষকে তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা ব্যবহারের জন্য পুরস্কার বা শাস্ড়ি প্রদান করবেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। তিনি কখনোই কাউকে জুলুম করবেন না। তিনি মহাকর্ত্থণাময় ও শ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক।

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "শক্তিশালী মুমিন আল্লাহ্র নিকট দুর্বল মুমিন থেকে বেশি প্রিয় ও বেশি ভাল, তবে তাদের উভয়ের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তোমরা যাতে কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে সে বিষয়ে আগ্রহী ও সচেষ্ট হও এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর। অক্ষম, দুর্বল বা হতাশ হয়ে যেওনা। যদিও তোমার কিছু হয় (যদি তুমি আশানুরূপ ফল না পাও বা ব্যর্থ হও) তবে কখনো বলবেনা : হায়, যদি আমি ঐ কাজ করতাম বা সেই কাজ করতাম তাহলে হয়ত এরূপ হতো ... (অতীতের ব্যর্থতা নিয়ে হা হুতাশ করবে না) বরং (তাক্দীরের বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে) বলবে : আল্লাহ্র তাকদীরে যা ছিল হয়েছে, আল্লাহ্র যা মর্জি হয়েছে তাই করেছেন। কারণ, অতীতকে নিয়ে আফসোস করে "যদি ঐ কাজ করতাম তবে হয়ত এরূপ হতো"– এ ধরনের কথা শয়তানের দরজা খুলে দেয়। (মুসলিম, ৪/২০৫২)

তাকদীরে বিশ্বাস হৃদয়ের দরজা শয়তানের জন্য বন্ধ করে দেয়। সেখানে শয়তান হতাশা বা অবসাদের বীজ বপন করতে পারে না। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে ঈমান দান কর্ত্থন। আমাদেরকে ঈমানের শক্তিতে, কর্মের শক্তিতে, দেহের শক্তিতে, জ্ঞানের শক্তিতে শক্তিশালী করে তাঁর প্রিয় শক্তিশালী মুমিন হওয়ার তাওফিক দান কর্ত্থন। আমিন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : "যদি আল্লাহ্তায়ালা আসমান ও জমিনের সকল অধিবাসীকে আজাব দেন তাহলে তার আজাব দেয়াটা কোন প্রকার অন্যায় হবে না। আর যদি দয়া করেন তাহলে তাদের আমলের তুলনায় অনেক বেশি হবে। যদি কোন ব্যক্তির নিকট ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং তা আল্লাহর রাস্ড়ায় ব্যয় করে, আল্লাহ তার এ দান বিন্দু পরিমাণ গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ড় না সে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করে। আর একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, কোন ব্যক্তি সঠিক কাজ করলে সে তা তাকদীর অনুযায়ী করেছে, এটা ভুল করা তার জন্য নির্ধারিত ছিল না। আর যা সে ভুল করল এটা সঠিকভাবে করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যদি তুমি এ বিশ্বাসের বাইরে মৃত্যু বরণ কর তবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সহীহ কিতাবুস সুন্নাহ : ইবনে আবী আসিম আশ-শায়বানী)

মুসলমানদের আরো কতিপয় আকীদা

মি'রাজ সম্বন্ধে আকীদা

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহতা'আলা একদা রাত্রে জাগরিত অবস্থায় স্ব-শরীরে মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ড় নিয়ে যান। সেখান থেকে সাত আসমানের উপর এবং সেখান থেকেও আরও উপরে যতদূর আল্লাহ্র ইচ্ছা নিয়ে যান। সেখানে আল্লাহ্র সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাবার্তা বলেন। তখনই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিধান দেয়া হয় এবং সেই রাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন। একে মি'রাজ বলে।

আরশ কুরছী সম্বন্ধে আকীদা

'আরশ' অর্থ চেয়ার বা আসন। আল্লাহ যেমন, তাঁর আরশ এবং কুরছীও তেমনই শানের হয়ে থাকবে। সপ্তম আসমানের উপর আরশ ও কুরছী অবস্থিত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আরশ কুরছী এত বিশাল যে, তা সমগ্র আকাশ ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহপাক কোন মাখ্লূকের ন্যায় উঠা-বসা করেন না এবং তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নন। মাখলূকের কোন কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের সাথে আল্লাহর কোন কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের তুলনা হয় না। তারপরও তাঁর আরশ কুরছী থাকার কি অর্থ, তা অনুধাবন করা মানব জ্ঞানের উর্ধ্বে। আমাদেরকে শুধু আরশ কুরছী সম্বন্ধে আকীদা বিশ্বাস রাখতে হবে।

সাহাবীদের সম্বন্ধে আকীদা

• সকল সাহাবী আদিল অর্থাৎ, নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী, মুত্তাকী, পরহেয্গার, ন্যায়পরায়ণ এবং ইসলাম ও উম্মতের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দানকারী। প্রত্যেক সাহাবীর মধ্যে হেদায়েতের নূর এবং আলো রয়েছে; কারও মধ্যে অন্ধকার নেই।

• সকল সাহাবী সমালোচনার ঊর্ধ্বে। তাঁদের সমালোচনা করা, দোষত্র্ুটি অন্বেষণ করা সম্পূর্ণ অমার্জনীয় অপরাধ। সাহাবীদের সমালোচনাকারীগণ ফাসেক ফাজের ও গুমরাহ্।

• সাহাবীদের প্রতি মহব্বত ও ভক্তি শ্রদ্ধা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম শেয়ার বা প্রতীকী বৈশিষ্ট্য।

• প্রত্যেক সাহাবী সত্যের মাপকাঠি। সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ঈমানের কষ্টিপাথর, যার নিরিখে অবশিষ্ট সকলের ঈমান পরীক্ষা করা হবে। আমল এবং দ্বীনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁরা মাপকাঠি। এক কথায় সাহাবায়ে কেরাম হকের মাপকাঠি, তাঁদের নিরিখে নির্ণীত হবে পরবর্তীদের হক বা বাতিল হওয়া।

• যে সব ক্ষেত্রে সাহাবীদের মধ্যে দ্বিমত বা বাহ্যিক বিরোধ দেখা দিয়েছে, সেসব ক্ষেত্রেও প্রত্যেক সাহাবী হক ছিলেন। তাঁদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সংঘর্ষের ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে তাঁদের কোন পক্ষের এজতেহাদী ভুল-চুক থাকতে পারে, তবে প্রত্যেকের নিয়ত সহীহ ছিল, ব্যক্তি স্বার্থ কিংবা ব্যক্তিগত আক্রোশে তাঁরা সেটা করেননি। বরং দ্বীনের খাতিরে এবং ইখলাছের সাথেই করেছেন, এই আকীদা-বিশ্বাস রাখতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রেও যে কোন একজন বা এক পক্ষের অনুসরণ করলে হেদায়াত, মুক্তি ও নাজাত পাওয়া যাবে। কিন্তু একজনের অনুসরণ করে অন্যজনের দোষ চর্চা করা যাবে না। দোষ চর্চা করা হারাম হবে।

• সাহাবীদের মর্যাদা সমস্ড় ওলী আউলিয়াদের ঊর্ধ্বে। যিনি উম্মতের সবচেয়ে বড় ওলী (যিনি সাহাবী নন) তার মর্যাদাও একজন নিম্নস্ড়রের সাহাবীর সমান হতে পারেনা। বরং সাহাবী আর সাহাবী নন-এমন দুই স্ড়রের মধ্যে মর্যাদার তুলনাই অবান্ড়র।

• সমস্ড় সাহাবীর মধ্যে চারজন সর্বপ্রধান। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান (১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:) এবং তিনি প্রথম খলিফা। তারপর (২) হযরত ওমর (রা:), তিনি দ্বিতীয় খলিফা। তারপর (৩) হযরত ওসমান গনী (রা:), তিনি তৃতীয় খলিফা। তারপর (৪) হযরত আলী (রা:), তিনি চতুর্থ খলিফা। খলিফা হওয়ার ক্ষেত্রে এই তারতীব অর্থাৎ, এই পর্যায়ক্রম হক ও যথার্থ।

• সকল সাহাবীর প্রতি আল্লাহতা'আলা চির সন্তুষ্টির খোশ-খবরী দান করেছেন। বিশেষভাবে একসাথে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বারা দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখপূর্বক তাঁদের জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। উক্ত দশজনকে "আশরায়ে মুবাশ্শারাহ্" (সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন) বলা হয়। তাঁরা হলেন (১) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা:), (২) হযরত ওমর (রা:), (৩) হযরত ওসমান গনী (রা:), (৪) হযরত আলী (রা:), (৫) হযরত তাল্হা (রা:), (৬) হযরত যোবায়ের (রা:), (৭) হযরত আবদুর রহমান ইব্নে আওফ (রা:), (৮) হযরত সাআদ ইব্নে আবী ওয়াক্কাছ (রা:), (৯) হযরত সাঈদ ইব্নে যায়েদ (রা:) এবং (১০) হযরত আবু উবায়দা ইব্নুল জাররাহ (রা:)।

এছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও কতিপয় সাহাবী

সম্পর্কে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

জিন সম্বন্ধে আকীদা

আল্লাহতা'আলা আগুনের তৈরি এক প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন, যারা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে, তাদেরকে জিন বলে। তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ সবরকম হয়। তাদের সন্তানাদিও হয়। তাদের মধ্যে বেশি প্রসিদ্ধ এবং বড় দুষ্ট হল ইবলীস অর্থাৎ, শয়তান। জিন মানুষের উপর আছর করতে পারে।

কারামত, কাশ্‌ফ, এল্‌হাম ও পীর বুজুর্গ সম্বন্ধে আকীদা

• বুজুর্গ এবং ওলী আউলিয়াদের দ্বারা আল্লাহতা'আলা যেসব অসাধারণ কাজ দেখিয়ে থাকেন, তাকে বলা হয় কারামত। আর জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় তাঁরা যে সব ভেদের কথা জানতে পারেন বা চোখের অগোচর জিনিসকে দেলের চোখে দেখতে পারেন, তাকে বলা হয় কাশ্‌ফ ও এল্‌হাম। বুজুর্গদের কারামত ও কাশ্‌ফ এল্‌হাম সত্য।

• কারামত ও কাশ্‌ফ এল্‌হাম হয়ে থাকে বুজুর্গ এবং ওলীদের। আর বুজুর্গ এবং ওলী বলা হয় আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাকে। শরী'আতের বরখেলাফ করে কেউ আল্লাহ্‌র প্রিয় তথা ওলী বা বুজুর্গ হতে পারে না। অতএব যারা শরী'আতের বরখেলাফ করে যেমন সালাত রোযা করে না, গাঁজা, শরাব বা নেশা খায়, বেগানা মেয়েলোককে স্পর্শ করে বা দেখে, গান-বাদ্য করে ইত্যাদি, তারা কখনও বুজুর্গ নয়। যদি তারা অলৌকিক কিছু দেখায়ও তবুও তা কারামত নয়। বরং বুঝতে হবে হয় সেটা যাদু বা কোনরূপ তুকতাক ও ভেল্কিবাজী, কিংবা যে কোন রূপ প্রতারণা। অনেক সময় শয়তান এসব লোকদেরকে গায়েব জগতের অনেক খবর জানিয়ে দেয়। যাতে করে তা শুনে মূর্খ লোকেরা তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং এভাবে তারা বিভ্রান্তির শিকার হয়। এসব দেখে তাদের ধোঁকায় পড়া যাবে না।

• কাশ্‌ফ এবং এল্‌হাম যদি শরী'আতের মোয়াফেক হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।

• কোন বুজুর্গ বা পীর সম্বন্ধে এই আকীদা রাখা শির্‌ক যে, তিনি সব সময় আমাদের অবস্থা জানেন।

• কোন পীর বা বুজুর্গকে দূর দেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে তিনি জানতে পেরেছেন– এটা শির্‌ক। কোন পীর বুজুর্গ গায়েব জানেন না, তবে কখনও কোন বিষয়ে তাদের কাশ্‌ফ এল্‌হাম হতে পারে, তাও আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

• কোন পীর বুযুর্গের মর্যাদা– চাই সে যতবড় হোক– কোন নবী বা সাহাবী থেকে বেশি বা তাঁদের সমানও হতে পারে না।

আসবাব/বস্তুর ক্ষমতা সম্বন্ধে আকীদা

কোন আসবাব বা বস্তুর নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। কোন আসবাব বা বস্তুর নিজস্ব ক্ষমতা আছে– এরূপ বিশ্বাস করা শির্‌ক। তবে বস্তুর মধ্যে যে ক্ষমতা দেখা যায় বা বস্তু থেকে যে প্রভাব প্রকাশ পায় তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত, তার নিজস্ব ক্ষমতা নয়। তাই আল্লাহ ক্ষমতা না দিলে বা তার স্বাভাবিক কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে না– আল্লাহ পাকের এরূপ ফয়সালা হলেই বস্তুর স্বাভাবিক ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। বস্তু সম্বন্ধে এ হচ্ছে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা।

ঈমানবিধ্বংসী বিষয়াবলী

ঈমানের কল্যাণ লাভ করতে হলে ঈমান বা বিশ্বাসকে অবশ্যই পরিপূর্ণ, নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ হতে হবে। ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াবলী থেকে মুক্ত হতে হবে। ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত 'অবিশ্বাস'। 'অবিশ্বাস' সামগ্রিক বা ব্যাপক হতে পারে এবং আংশিকও হতে পারে। ঈমান বা বিশ্বাসের বিভিন্ন রোকন ও বিষয়ের পুরোটাই কেউ 'অবিশ্বাস' করতে পারে, বিশ্বাসের বিভ্রান্তিও আংশিকও হতে পারে।

মূলত চারটি বিষয় ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়। যথা– কুফর, শিরক, নিফাক ও বিদ'আত।

১. কুফর : বিশ্বাসের অবিদ্যমানতাই কুফর বা অবিশ্বাস। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং ঈমানের রোকনগুলোতে বিশ্বাস না থাকাকেই ইসলামের পরিভাষায় 'কুফর' বলে। অস্বীকার, সন্দেহ, দ্বিধা, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি যেকোনো কারণে যদি কারো মধ্যে ঈমান বা দৃঢ় প্রত্যয়ের বিশ্বাস অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে ইসলামী পরিভাষায় 'কুফর' বলে গণ্য করা হয়। যার মধ্যে 'কুফর' থাকে সে হল 'কাফের'।

২. শিরক : অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে কোনো বিষয়ে তাঁর সমতুল্য বা সমকক্ষ বা তাঁর সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করা, আল্লাহ্‌র প্রাপ্য কোন ইবাদত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর জন্য পালন করা বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র একত্ব ও অতুলনীয়ত্ব অস্বীকার করাও কুফর। তবে এ পর্যায়ের কুফরকে ইসলামী পরিভাষায় 'শিরক' বলা হয়। এক কথায়

'আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে অন্য কাউকে অংশী বানানোই শিরক।' যে শিরক করে তাকে বলা হয় 'মুশরিক'।

শিরক অর্থ অংশীদারত্ব। আল্লাহ্‌র কোনো কর্ম, গুণ, নাম বা ইবাদতে অন্য কোনো সৃষ্টিকে অংশীদার বানানো বা তাঁর সমকক্ষ বলে মনে করা বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টি– ফিরিশতা, নবী, ওলী, তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান, দ্রব্য, গাছ, পাথর, বা অন্য কিছুর ঈশ্বরত্ব, ঐশ্বরিক গুণ বা আল্লাহর মত ক্ষমতা, শক্তি, গুণ বা কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা আছে বলে মনে করা শিরক।

৩. নিফাক : মনের মধ্যে শিরক-কুফর গোপন রেখে জাগতিক স্বার্থ, ক্ষমতা, প্রয়োজন ইত্যাদির কারণে মুখে ঈমানের দাবি করাকে 'নিফাক' বা মুনাফিকী বলা হয়। নিফাকে লিপ্ত মানুষকে 'মুনাফিক' বলে। ইসলামী পরিভাষায় নিফাক দু'প্রকার :

৩.১. বিশ্বাসের নিফাক : অন্তরের মধ্যে অবিশ্বাস গোপন রেখে মুখে বিশ্বাসের প্রকাশকে বিশ্বাসের নিফাক বা নিফাকে ই'তিকাদী বলা হয়। এ নিফাকের স্বরূপগুলো নিম্নরূপ : (১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সকল শিক্ষা বা দাও'আত বা তাঁর শিক্ষার কোনো দিককে মিথ্যা বলে মনে করা, (২) তাঁকে ঘৃণা করা বা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা (৩) তাঁর কোনো শিক্ষাকে ঘৃণা করা, (৪) তাঁর দীনের অবমাননায় আনন্দিত হওয়া অথবা (৫) তাঁর দ্বীনের সাহায্য করতে অপছন্দ করা। মূলত কুরআন-হাদীসে এরূপ নিফাকের কথাই বলা হয়েছে। এরূপ নিফাক কুফরেরই একটি প্রকার; কারণ এরূপ নিফাকে লিপ্ত ব্যক্তির অন্তরে অন্যান্য কাফিরের মতই অবিশ্বাস বিদ্যমান, যদিও সে জাগতিক স্বার্থে মুখে ঈমানের দাবি করে।

৩.২. কর্মের নিফাক : আমরা জানি যে, বিশ্বাসই মানুষের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাহ্যিক কর্ম মানুষের আভ্যন্তরীন বিশ্বাসের প্রতিফল। যার অন্তরে বিশ্বাস নেই, কিন্তু বাইরে বিশ্বাস দাবি করে, স্বভাবতই তার অন্তরের অবিশ্বাস তার কর্মে প্রকাশিত হয়, সেগুলি প্রমাণ করে যে, সে ঈমান ও তাকওয়ার দাবি করলেও বস্তুত তার মধ্যে ঈমান ও তাকওয়া অনুপস্থিত। হাদীস শরীফে এ জাতীয় কিছু কর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "চারটি বিষয় যার মধ্যে বিধ্যমান থাকবে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলির মধ্য থেকে কোনো একটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে তার মধ্যে নিফাক বা কপটতার একটি দিক বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে : (১) যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয় সে তা খিয়ানত করে, (২) যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, (৩) যখন সে

চুক্তি বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তখন তা ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন সে ঝগড়া করে তখন সে অশ্লীল কথা বলে।" (বুখারী, ১/২১, ৩/১১৬০; মুসলিম, ১/৭৮)

এ সকল কর্ম বাহ্যত অন্তরে বিশ্বাসের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে। তবে যদি অন্তরে প্রকৃত অবিশ্বাস না থাকে, তবে এ সকল কর্ম 'কুফর' বা অবিশ্বাসের নিফাক বলে গণ্য হবে না। বরং কুফর আসগারের ন্যায় নিফাক আমালী বা কর্মের নিফাক বলে গণ্য হবে।

৪. বিদ'আত : বিদ'আত অর্থ উদ্ভাবন। যে কর্ম, বিশ্বাস, রীতি বা আচার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ ধর্মীয় কর্ম হিসাবে, সাওয়াব, আল্লাহ্‌র নৈকট্য বা ইবাদত হিসাবে পালন করেননি, এরূপ কোনো কর্ম, বিশ্বাস, রীতি বা আচারকে ধর্মের অংশ বা সাওয়াবের কর্ম বলে মনে করা হলো বিদ'আত। বিদ'আত অনেক সময় শিরক ও কুফরীতে নিপতিত করে। এছাড়া বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তির ইবাদত, বন্দেগি আল্লাহ্ কবুল করবেন না বলে বিভিন্ন হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে।

ঈমানবিধ্বংসী আকীদা বিশ্বাস বা শিরক-কুফরের ভয়াবহ পরিণতি

ঈমানবিধ্বংসী আকীদা বিশ্বাস বা শিরক-কুফরের মূলোৎপাটনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহে বিশেষভাবে বারংবার এর ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা এ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানতে পারি।

১. ভয়ঙ্করতম পাপ : কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিরক-কুফর মানব জীবনের ভয়ঙ্করতম পাপ। মহান আল্লাহ্ বলেন : "বল, এস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শুনাই; তা এই যে, তোমরা তাঁর কোনো শরীক করবে না ....।" (সূরা আন'আম : ১৫১) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা:) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "সবচেয়ে কঠিন পাপ এই যে, তুমি কাউকে আল্লাহ্‌র সমতূল্য বানাবে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (বুখারী ৪/১৬২৬, ৫/২২৩৬, ৬/২৪৯৭, ২৭৩৯, মুসলিম ১/৯০-৯১) অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হলো আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা, মানুষ হত্যা করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা এবং মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।" (বুখারী, ৬/২৫১৯, ২৫৩৫)

২. কুফর-শিরকের পাপ আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না : তাওবা বা অনুতপ্ত হয়ে পাপ বর্জণ করা সকল পাপের ক্ষমার পথ। তবে মহান আল্লাহ তাওবা ছাড়াও নেক কর্মের কারণে, শাস্তির মাধ্যমে বা তাঁর অপার করুণায় অন্য সকল পাপ ক্ষমা করতে পারেন। তবে শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করেন না। মহান আল্লাহ্ বলেন : "আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।" (সূরা নিসা : ৪৮) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক করে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।" (সূরা নিসা : ১১৬)

৩. শিরক-কুফর সকল নেক কর্ম ধ্বংস করে : অন্য সকল পাপের সাথে শিরক-কুফরের মৌলিক পার্থক্য এই যে, সাধারণভাবে পাপের কারণে পুন্য বিনষ্ট হয় না। কিন্তু শিরকের কারণে মানুষের সকল নেক কর্ম নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ্ বলেন : "তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, 'তুমি আল্লাহ্র শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা যুমার : ৬৫) অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন : "কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা মায়িদা : ৫) মহান আল্লাহ ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, নূহ, দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসূফ, মূসা, হারুন, যাকারিয়্যা, ইয়াহইয়া, ঈসা, ইলইয়াস, ইসমাঈল, ইলইয়াসা, ইউনুস, লুত (আলাইহিমুস সালাম) ও তাঁদের বংশের নেককার মানুষদের কথা উল্লেখ করে বলেন : "এ হলো আল্লাহ্র হেদায়াত, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এদ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন। তারা যদি শির্ক করত তবে তারা যা কর্ম করত সবই বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যেত।" (সূরা আন'আম : ৮৮)

৪. শিরক-কুফর জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ : শিরক মুক্ত সকল পাপে লিপ্ত মানুষ আখিরাতে মহান আল্লাহ্র ক্ষমা লাভ করে, অথবা আল্লাহ্র অনুগ্রহে কারো শাফা'আতের কারণে বা শাস্তি ভোগের পরে জান্নাত লাভ করবেন। সকল পাপীই মহান আল্লাহ্র বিশেষ ক্ষমার আশা করতে পারেন। তবে শিরকে লিপ্ত মানুষের জন্য কোনোই আশা নেই। জান্নাত একমাত্র তাওহীদপন্থীদের আবাসস্থল। এজন্য মহান আল্লাহ্ শিরকে লিপ্তদের জন্য তা হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন : "কেউ আল্লাহ্র শরীক করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও তার আবাস জাহান্নাম; জালিমদের জন্য কোনো

সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়িদা : ৭২) আবু যার (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে পৃথিবী পরিমাণ পাপসহ আমার সাথে সাক্ষাত করবে আমি সমপরিমাণ ক্ষমাসহ তার সাথে সাক্ষাত করব।" (মুসলিম, ৪/২০৬৮) আনাস ইবনু মালিক (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "জাহান্নামে সবচেয়ে কম শাস্তি ভোগ করবে যে ব্যক্তি তাকে মহান আল্লাহ বলবেন, পৃথিবীর সবকিছুর মালিকানা তুমি যদি পেতে তবে কি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সবকিছু ফিদইয়া হিসেবে দান করে দিতে? লোকটি বলবে : হ্যাঁ। মহান আল্লাহ্ বলবেন, আমি তো তোমার কাছে এর চেয়ে অনেক সহজ একটি বিষয় চেয়েছিলাম; তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করছিলে তখন আমি তোমার কাছে চেয়েছিলাম যে, তুমি আমার সাথে শিরক করবে না। কিন্তু তুমি শিরক পরিত্যাগ করলে না।" (বুখারী ৩/১২১৩)

সমাজে প্রচলিত ঈমানবিধ্বংসী আকীদা-বিশ্বাস

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, প্রচলিত কুসংস্কার, নামধারী ভন্ড পীর-ফকির ও মাজার পূজারীদের কথায় বিশ্বাস, ভুল ধারণা ও অতিভক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন কারনে আমাদের সমাজের অগণিত সরলপ্রাণ মুসলমান বিভিন্ন প্রকার শিরক ও কুফরীর মধ্যে জড়িয়ে পরে ঈমানহারা হয়ে যাচ্ছেন। নিজের ও পরিজনের ঈমান রক্ষা করা দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার মূল চাবিকাঠি। ঈমানবিধ্বংসী আকীদা বিশ্বাসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবরণ শিক্ষা করা প্রত্যেক মুমিনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। এখানে স্বল্প-পরিসরে আমাদের সমাজের প্রচলিত কিছু ঈমান বিধ্বংসী আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল যাতে আমরা এসব থেকে দূরে থেকে নিজেদের ঈমান-আমল হেফাজত করতে পারি।

গায়রুল্লাহর উপর নির্ভর করা সম্পর্কে আকীদা

১. তাওয়াক্কুল অর্থ মনের প্রগাঢ় নির্ভরতা। মানুষ যার বা যাদের উপাসনা করে, অন্তরের গভীরে তার বা তাদের অতিপ্রাকৃতিক সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষনের আশা করে এবং এই সাহায্যের উপর তার নির্ভরতা থাকে। সে তার উপাস্যের নাম নিয়ে বা তার উপাস্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করে তার কর্ম শুরু করে। এই নির্ভরতা এক প্রকার ইবাদত। কেউ যদি কারো নাম নিয়ে বা কারো অতিপ্রাকৃতিক সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর অন্তরের আস্থা বা নির্ভরতা নিয়ে কোন কর্ম শুরু করেন, তাহলে তিনি তার উপাসক বলে গণ্য হবেন। ইসলামের

দৃষ্টিতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না। কুরআন করীমে একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করতে, তাওয়াক্কুল করতে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

"আর মুমিনগণ (বিশ্বাসীগণ) একমাত্র আল্লাহর উপরেই নির্ভর করুক।" (সূরা আল ইমরান : ১২২, ১৬০; মাইদা : ১১; তাওবা (বারাআত) : ৫১; ইব্রাহীম : ১১ মুজাদালাহ : ১০, তাগাবুন: ১৩, ইউসুফ : ৬৭, ইব্রাহীম : ১২, যুমার : ৩৮)

وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۚ وَ كَفٰى بِاللهِ وَكِيْلًا

"এবং আপনি আল্লাহর উপরে নির্ভর করুন, ভরসা করুন, নির্ভরযোগ্য কর্ম বিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা নিসা: ৮১, ও সূরা আহযাব : ৩)

২. অন্যত্র বলা হয়েছে:

اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ

"তোমরা যদি আল্লাহর উপরে ঈমান এনে থাক, আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে থাক, যদি তোমরা মুসলিম হও (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনকারী হও) তাহলে শুধু মাত্র তার উপরেই নির্ভর কর, ভরসা কর।" (সূরা ইউনুস: ৮৪)

৩. আল্লাহ আরো বলেছেন:

قُلْ هُوَ رَبِّىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ مَتَابِ

"আপনি বলুন : তিনিই আমার প্রভু, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই, আমি একমাত্র তার উপরেই নির্ভর (তাওয়াক্কুল) করেছি এবং তার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন।" (সূরা রাদ : ৩০)

৪. কাজেই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বা আল্লাহর ইবাদাতের একত্বে বিশ্বাসকারী কোন অবস্থাতেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর নির্ভর করবেন না। তাঁর অন্তরের প্রগাঢ় নির্ভরতা ও সমর্পণ একমাত্র আল্লাহর উপরেই থাকবে। যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কোন কাজ করেন, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো অতিপ্রাকৃতিক সাহায্যের উপর মনের নির্ভরতা রেখে কর্ম শুরু করেন তাহলে তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তে বিশ্বাসী বলে গণ্য হবেন না। বরং তিনি যার উপর নির্ভর করলেন, যার নামে তার কর্ম শুরু করলেন তিনি তারই উপাসক।

গায়রুল্লাহকে ভয় করা বা গায়রুল্লাহর কাছে আশা করা সম্পর্কে আকীদা

১. তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতার সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ ইবাদত হলো আশা ও ভয়।

আমাদের ভয়-ভীতি আশা-ভরসা ও ভালবাসা দুই প্রকারের: প্রাকৃতিক বা বৈষয়িক ও অতিপ্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক। সাধারণত: প্রাকৃতিক ভয়-ভীতি, আশা-ভরসা ও ভালবাসার সৃষ্টি হয় দুনিয়ার জীবনের বিভিন্ন বস্তুগত ও বৈষয়িক কারণে। যেমন আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজন, সন্তান সন্ততি ও বন্ধু বান্ধবকে ভাল বাসি। হিংস্র বা বিষাক্ত জীব দেখলে ভয় পাই। অনুরূপভাবে পার্থিব জীবনে একে অপরের বিভিন্ন ধরণের উপকারের আশা করি। এ ধরণের পার্থিব ও বৈষয়িক ভয়-ভীতি, আশা-ভরসা ও ভালবাসা মানুষ এবং মানবেতর জীব জানোয়ারের মধ্যে বিরাজমান এবং তা ইবাদতের মধ্যে গণ্য নয়।

২. পক্ষান্তরে মানুষ যখন কোন ব্যক্তি, সত্ত্বা বা শক্তিকে প্রগাঢ়ভাবে ভক্তি করে, স্বাভাবিক মানবীয় বা প্রাকৃতিক শক্তির উর্ধ্বে তাকে শক্তিমান বলে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ বিশ্বাস করে যে, তিনি অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী, তিনি ইচ্ছা করলেই কল্যাণ বা অকল্যাণ, উপকার বা ক্ষতি করতে পারেন, তখন ঐ মানুষের মনে ঐ ব্যক্তি, সত্ত্বা বা শক্তির প্রতি ভয় ও আশার সঞ্চার হয়। এই অতিপ্রাকৃতিক ভয়-ভীতি ও আশা-ভরসা ইবাদত বলে গণ্য যা একমাত্র আল্লাহর নিমিত্ত নির্ধারিত।

৩. কুরআন করীমে বলা হয়েছে:

فَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ

"অতএব তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় কর।" (সূরা নাহল : ৫১)

৪. অন্যত্র মুমিন বা বিশ্বাসীদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে:

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ لَمْ يَخْشَ اِلَّا اللهَ فَعَسٰۤى اُولٰۤئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ

"আল্লাহর মসজিদসমূহকে আবাদ করে তারাই যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন, আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছেন, সালাত (সালাত) কায়েম করেন, যাকাত প্রদান করেন এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করেন না। আশা করা যায় এরা সুপথপ্রাপ্ত হবেন।" (সূরা তাওবা: ১৮)

৫. অন্য আয়াতে আল্লাহর রাসূলগণের কথা বলা হয়েছে:

اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللهِ وَ يَخْشَوْنَهٗ وَ لَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللهَ

যারা আল্লাহর বাণীসমূহকে পৌঁছে দেন এবং আল্লাহকে ভয় করেন, তারা

আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করেন না। (সূরা আহযাব : ৩৯)

৬. বিশ্বাসীরা আল্লাহর রহমতের আশা করেন একথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ جَاهَدُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ
يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"যারা ঈমান এনেছে, এবং যারা হিজরাত করেছে, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের আশা রাখে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।" (সূরা বাকারা : ২১৮)

৭. এই ধরণের ভয় ও আশার কারণ হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোন উপকার বা অপকারের ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা। আমরা দেখেছি যে, মক্কার কাফিররা বিভিন্ন দেবদেবীর উপাস্যদের উপাসনা করত এই বিশ্বাসে যে, এরা আল্লাহর প্রিয়, এদেরকে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন যার ফলে এরা মানুষের উপকার অপকার করতে পারে বা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে মানুষের কল্যাণ করতে পারে। যদিও তারা প্রকারান্তরে স্বীকার করত যে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এদের কিছুই করার নেই, তারপরেও তাদের ধারণা ছিল আল্লাহ এদের কিছু সুযোগ দিয়েছেন এবং কিছু ক্ষমতা এদের আছে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটনের জন্য আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলেছেন যে, আল্লাহ কাউকে কোন ক্ষমতা দেননি। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোন প্রকারের উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই। কাজেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ভয় বা আশা করে শিরকে লিপ্ত হওয়া একেবারেই অর্থহীন।

গায়রুল্লাহর ইচ্ছা বা অভিপ্রায় বিষয়ক আকীদা

১. অধিকাংশ পূণ্যবান লোকদের সম্পর্কে মনে করা হয় যে, তাঁদের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ই হচ্ছে আল্লাহর মূল ইচ্ছা বা অভিপ্রায়। এই শ্রেণীর মনোভাবের সাথে শুধু কেবল ভ্রান্ত বিশ্বাসীরাই নয়, বরং তাওহীদের অনুসারীরাও এই ভুল বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে এই সূক্ষ্ম ভুল সম্পর্কেও অবহিত করেছেন এবং বলেছেন যে, পৃথিবীতে মাশিয়াত বা অভিপ্রায় শুধুমাত্র আল্লাহর। তাঁর অভিপ্রায় অনুসারেই পৃথিবী চলছে। সকল অভিপ্রায় এবং আশা আকাঙ্খা তাঁর অভিপ্রায়েরই অধীনস্থ। তাঁর অভিপ্রায়ের সাথে কোন মাখলুকের অভিপ্রায়ের কোন অংশী নেই। কিন্তু মানুষ আল্লাহর অভিপ্রায়ের সাথে গায়রুল্লাহর অভিপ্রায়কেও শরীক করে নিয়েছে। কামেল ও পরিপূর্ণ তাওহীদের মুয়াল্লিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ধারণাকে কঠোরভাবে মূলোৎপাটিত করেছেন। কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে এই হাকীকতকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, আল্লাহর অভিপ্রায় ছাড়া আর কারো প্রকৃত অভিপ্রায় হতে পারেনা। অন্য সকল অভিপ্রায় তাঁর অভিপ্রায়েরই অধীনস্থ। তবে ঈমান ও আকীদার এই ভুল এতখানি ব্যাপক ও সাধারণ হয়ে পড়েছিল যে, যারা আদৌ বিশ্বাসী ছিল না, তারাও রাজা-বাদশাহ, প্রশাসক এবং বয়োবৃদ্ধদের সাথে কথাবার্তা বলার সময় এ কথা বলাকে উত্তম শিষ্টাচার বলে মনে করত। আপনি যা চান, হুজুর যা চান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে কথা বলাকে নিষেধ করেছেন। এমনকি আল্লাহপাকের অভিপ্রায়ের সাথে তাঁর অভিপ্রায়কে সমকক্ষ বলে উল্লেখ করতেও সাহাবীদেরকে বারণ করেছেন। এই জাতীয় কথাবার্তা মানুষের কথোপকথনে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল বলেই তিনি এর সংস্কার সাধন করেছেন এবং নির্দেশ করেছেন : আল্লাহ এবং গায়রুল্লাহর অভিপ্রায়ের মাঝে সংযুক্তির চিহ্ন পর্যন্ত যেন উপস্থাপন করা না হয় এবং এর সমকক্ষতার গন্ধও যেন বেরিয়ে না আসে। বরং 'অত:পর' শব্দটি যোগে কথা বলবে যেন, আল্লাহর অভিপ্রায়ের পর অন্যান্য সকলের অভিপ্রায় বলে প্রতিপন্ন হয়।

২. একদা একজন ইহুদী খেদমতে নবুবীতে হাজির হয়ে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বললো, তোমরা শিরক করছ এই কথা বলে যে, যা আল্লাহ চান এবং যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা এভাবে বল যে, তিনি একক অদ্বিতীয়; যা চান, তাই করেন। অত:পর আপনি যা চান। (নাসাঈ: কিতাবুল ঈমান ওয়ানুজুর)

৩. এই ঘটনাটিই ইবনে মাজাহ থেকে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে-"একদিন একজন সাহাবী স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, একজন ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান তাঁকে লক্ষ্য করে বলছে, তোমরা মুসলমানরা খুবই উত্তম লোক হতে, যদি তোমরা শিরক না করতে। তোমরা বল, "আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা চান।" সে সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হয়ে নিজের এই স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আমিও এই ধরনের কথাকে খারাপ বলে জানি। তবে তোমরা এভাবে বল, "যা আল্লাহপাক চান এবং অত:পর যা মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চান।" (ইবনে মাজাহঃ কিতাবুন নুজুর)

৪. আবু দাউদ শরীফে এই ঘটনার প্রেক্ষিত ছাড়াও এভাবে তালিম দেয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা এ কথা বলো না যা আল্লাহ চান এবং যা অমুকে চায়।' বরং তোমরা এভাবে বল যে, 'যা আল্লাহ চান, এবং অত:পর যা অমুক ব্যক্তি চায়।'

৫. কিন্তু ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদ ও ইমাম বায়হাকী কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাতে যে সকল বর্ণনা সন্নিবেশ করেছেন, এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহর অভিপ্রায়ের সাথে অন্য কারো অভিপ্রায়ের নামও নিতে নেই। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র খেদমতে হাজির হয়ে কথা প্রসঙ্গে বললো, যা আল্লাহ চান এবং যা আপনি চান। ইরশাদ হলো, "তুমি আল্লাহর সাথে সমকক্ষ দাঁড় করেছো, অথচ আল্লাহর প্রতিপক্ষ বলতে কিছুই নেই, তিনি একক ও অদ্বিতীয়।" (আবু দাউদ : কিতাবুল আদব)

৬. এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতটুকু সচেতনতাও দেখিয়েছেন যে, এমন একটি কাজের অবতারণা করাও ঠিক নয়, যার কর্তা হবেন আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এতে করে আল্লাহর ও রাসূলের কর্তব্য ও দরজা কখনো এক বরাবর বলে প্রতীয়মান হবে না। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে কোন এক ব্যক্তি বক্তব্য পেশ কালে কথার ফাঁকে বললো, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করেছে, সে হেদায়েত লাভ করেছে এবং যে তাদের দু'জনের নাফরমানী করেছে... সে এই পর্যন্ড় বলার পরই তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারণ করলেন, এবং বললেন, "চলে যাও, তুমি হলে একজন নিকৃষ্ট খতীব।" (আদাবুল মুফরাদ : ইমাম বুখারী ১৫৭পৃ:, বায়হাকী পৃঃ ১১০, কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত)

৭. এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসন্তুষ্টি এজন্য প্রকাশ করেছিলেন যে, আল্লাহ ও রাসূলকে একসাথে উপস্থাপনের ফলে শ্রোতামন্ডলীর মাঝে এই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূলের আনুগত্য একই বরাবর। এর মাঝেও শিরকের গন্ধ নিহিত আছে। এজন্য খতীবকে একথা বলা দরকার ছিল... ' যে আল্লাহ এবং রাসূলের নাফরমানী করবে' যা বার বার কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একই শিক্ষা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষণেও পাওয়া যায়।

৮. ধর্ম সম্বন্ধীয় ও শরিয়ত সম্পর্কীয় কোন কথায় যদি এই প্রকার বলা যায় যে, "ইহা আল্লাহ এবং তার রাসূল জানেন" অথবা "এই সম্বন্ধে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ এই প্রকার", তাতে কোন দোষ নেই। কারণ ধর্ম সম্বন্ধীয় সমস্ড় বিষয় আল্লাহতা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জানিয়ে দিয়েছেন, সমস্ড় লোককে তাঁর আদেশ অনুসরণ করতে

বলেছেন।

লোক দেখানো আমল (রিয়া) সম্পর্কে আকীদা

১. মানুষের সকল কাজে কোন না কোন মানসিক প্রেরণা থাকে। কেউ নাম ও যশের জন্য কাজ করে, কেউ দুনিয়ায় বিনিময় লাভের আশায় কাজ করে, কেউ দেখানোর জন্য এবং প্রদর্শনের জন্য কাজ করে। কেউ অপরের ভালবাসায় অথবা শত্রুতা সাধনের জন্য কাজ করে। এ সকল কাজের অনুপ্রেরণা মূলত আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু। যেগুলো আল্লাহর স্থানে বসে গেছে। এ জন্যই কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, أَرَ أَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ

"আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে?"

(সূরা ফুরকান : ৪৩)

২. এজন্য সবচেয়ে বড় দেবতা হচ্ছে সেটি, যা মানুষ স্বীয় অন্ড়রের দেবালয়ে প্রচ্ছন্ন রেখেছে। এই দেবালয়কে নির্মূল করলে সত্যিকার তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাও বলেছেন যে, মানুষের সকল কাজের নির্ভরশীলতা তার অন্ড়রের অভিব্যক্তির উপরই ন্যস্ড় । এ জন্য এক জন মুসলমানের সকল প্রকার কাজের মূল প্রেরণা হচ্ছে আল্লাহর ভয়, আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর সন্তুষ্টি, আল্লাহর মহব্বত। মোটকথা, উদ্দেশ্য হবে একমাত্র আল্লাহ। মানুষ আল্লাহর উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন নিয়ত বা উদ্দেশ্যে যে সকল কাজ নির্বাহ করে এমতাবস্থায় সে তার এ কাজের জন্য অন্য একজনকে আল্লাহ বলে সাব্যস্ড় করে নেয়। যদিও সে ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি শাব্দিক বা নৈতিক শিরকের দ্বারস্থ নয়, কিন্তু আত্মিক ও অদৃশ্য শিরকের সে অনুসারী, তা' সুস্পষ্টভাবে বলা যায়।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করলো, এবং আল্লাহরই উদ্দেশ্যে বিরত রইল এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে কামনা করলো, আল্লাহরই উদ্দেশ্যে বিরুদ্ধাচারণ করলো, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিবাহ করলো, সে প্রকৃতই স্বীয় ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিল।

(মোস্তাদরেকে হাকেম, তিরমিজি)

৪. বিভিন্ন সাহাবীদের থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "রিয়া হলো প্রচ্ছন্ন শিরক।" হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ প্রচ্ছন্ন শিরক হলো এই যে, মানুষ কোন কাজ অন্যের উপস্থিতির কারনে নিষ্পন্ন করে। (মোস্ড়দরেকে হাকেমঃ কিতাবুর রিকাক, ৪র্থ খ: ৩২৯ পৃঃ)

৫. হযরত শাদ্দাদ বিন আউস (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি লোক দেখানো নামাজ পাঠ করলো, সে শিরক করলো, যে লোক দেখানো রোজা রাখলো, সে শিরক করলো; যে লোক দেখানো খয়রাত করলো, সে শিরক করলো। (মোস্তাদরেকে হাকেম, ইবনে হাম্বল, মোসনাদে শাদ্দাদ বিন আউস ৪খ: পৃ: ১২৬)

৬. একই সাহাবী হতে বর্ণিত, একবার সাহাবীদের সমবেত স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন, "আমি স্বীয় উম্মতের উপর সবচেয়ে বেশী যে বস্তুর ভয় করছি, তাহলো শিরক। তবে আমার কথার অর্থ এই নয় যে, তারা চন্দ্র- সূর্যের সিজদা করবে, কিংবা প্রতিমার পূজা করবে। বরং আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে না জানি তারা গায়রুল্লাহর জন্য কাজ শুরু করে দেয়, না জানি মনের গোপন খাহেশের মাঝে জড়িয়ে পড়ে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ)

৭. হযরত মাহমুদ বিন লবীদ আনসারী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছেন, যে জিনিসটা তোমাদের উপর বেশী ভয় করি, তাহলো শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। সাহাবীগণ আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! ছোট শিরক কি?' তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন মানুষ যখন নিজ নিজ কাজের বিনিময় লাভ করবে, তখন আল্লাহপাক রিয়াকার লোকদের লক্ষ্য করে বলবেন, তোমাদের জন্য আমার কাছে কিছুই নেই। তোমরা ঐ সকল লোকের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর জন্য দুনিয়াতে কাজ করেছিলে। (ইবনে হাম্বল: মোসনাদে মাহমুদ বিন লবীদ আনসারী, ৫খ: ৪২৮ পৃ, আবু দাউদ)

৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, এক দল লোকের সামনে আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে আপোষে কথাবার্তা বলছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, দাজ্জাল হতেও বেশী ভয়ঙ্কর যে জিনিস আমার কাছে আছে, আমি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করব না? আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি অবশ্যই তা আমাদেরকে বললেন। তিনি বললেন, তাহলো গোপন শিরক। এর উদাহরণ হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি নামাজ পড়ছে। সে এজন্য ভালোভাবে নামাজ পড়ছে যে, অন্যলোক তার নামাজ দেখছে। (সুনানে ইবনে মাজাহ: কিতাবুর রিয়া এবং ছাময়া)

৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহপাক বলেছেন, আমি সকল অংশীদের থেকে সার্বিকভাবে মুক্ত ও পবিত্র। যে ব্যক্তি নিজের কোনও আমলে গায়রুল্লাহকে শরীক বানিয়ে নিয়েছে তবে সে যেন নিজের সাওয়াব গায়রুল্লাহর নিকট চায়। কেননা আল্লাহ পাক অংশীবাদীদের থেকে বেনিয়াজ।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, তিরমিজি, মুসনাদে ইবনে হাম্বল: রিয়া অধ্যায়)

১০. এ সকল শিক্ষার প্রভাব এতই কার্যকর হয়েছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম

প্রত্যেক কাজেই ছোট শিরক এবং গোপন শিরক হতে বেঁচে থাকতে প্রয়াস পেতেন। হযরত শাদ্দাদ বিন আউস (রা:) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র হায়াতে রিয়াকে ছোট শিরক বলে সাব্যস্ত করতাম। (মোস্তাদরেকে হাকেম, কিতাবুর রিকাক, ৪খ: পৃঃ ৩২৯) একবার হযরত ওমর ফারুক কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, হযরত মায়াজ বিন জাবাল (রা:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর মোবারকের পাশে বসে কাঁদছেন। হযরত ওমর (রা:) কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি কবর মোবারকের দিকে ইশারা করে বললেন, এই কবরে সমাহিত পবিত্র সত্তা বলেছিলেন, 'রিয়া এর সামান্য চিহ্নও শিরক।' (মোস্তাদরেকে হাকেম, কিতাবুর রিকাক, ৪ খ: ১৩২৮)

১১. অনুরূপভাবে একবার তাবেয়ী হযরত ওবাদাহ দেখলেন যে, সাহাবী হযরত শাদ্দাদ বিন আউস (রা:) স্বীয় জায়নামাজে বসে অঝোর ধারায় কান্না করছেন। তিনি কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হযরত শাদ্দাদ (রা:) বললেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মোবারকে চিন্তা এবং বেদনার ছাপ দেখতে পেলাম। আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক, আপনার দুশ্চিন্তার কারণ কি? ইরশাদ হলো, আমি আমার পরে উম্মতের উপর একটি জিনিসের ভয় করছি। আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেটি কি? তিনি বললেন, শিরক এবং প্রচ্ছন্ন নফসানী খাহেশ। আমি দ্বিতীয়বার আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে কি আপনার পর উম্মতগণ শিরকে জড়িয়ে পড়বে? তিনি বললেন, হে শাদ্দাদ! আমার উম্মত অবশ্যই সূর্য, চন্দ্র, প্রতিমা এবং পাথরের পূজা করবে না। কিন্তু তারা নিজেদের কাজের নুমায়েশ ও রিয়া করবে। আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উহা কি শিরক? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

১২. এই ঘটনাবলী ও এর শিক্ষা গ্রহণ করে প্রত্যেকেই অনুমান করতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঠিকভাবে কেমন করে শিরকের মূলোৎপাটন করেছেন এবং তাওহীদকে পূর্ণতা দান করেছেন। সেই আরব যারা গায়রুল্লাহর পূজায় উজাড় হয়ে পড়েছিল, তারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষার প্রভাবে তাওহীদ ও আল্লাহর ইবাদতের শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

শরিয়ত প্রবর্তন ও হালাল-হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষমতা সম্পর্কে আকীদা

১. বান্দাগণের স্বীয় ইবাদত, উপাসনা কাজ কারবার তথা যাবতীয় ব্যাপারে পথ নির্দেশ এবং বান্দাদের পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ, মামলা-মোকাদ্দমা ইত্যাদি সম্পর্কে হুকুম-আহকাম, বিধি-নিষেধ আরোপ করার একমাত্র অধিকার শুধুমাত্র

আল্লাহরই, যিনি সমস্ত মানবকুলের প্রভু এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা।

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

তারই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ করা। আল্লাহ বরকতময়, যিনি প্রতিপালক বিশ্বজগতের। (সূরা আ'রাফ : ৫৪)

আর মহান আল্লাহপাকই সম্যকভাবে অবগত আছেন যে স্বীয় বান্দার জন্য কোন জিনিস অধিক কল্যাণকর হবে। সুতরাং তিনি ঐ জিনিস বা ঐ বিষয়কেই বান্দার জন্য নির্ধারণ করে দেন।

২. সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা প্রভুত্বের দাবিতেই বান্দাদের জন্য নীতি মালা প্রণয়ন ও নির্ধারণ করে দেন। আর বান্দাগণও মহান প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য ও দাসত্বের নিদর্শন হিসেবে প্রভুর বিধানগুলো মাথা পেতে কবুল করে নেয়। আর এ মানামানির উপকারিতা ও ফল বান্দাগণই ভোগ করে থাকে। আল্লাহ বলেন-

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

'অত:পর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে প্রত্যার্পন কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই হল কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (সূরা নিসা : ৫৯)

৩. মহান আল্লাহ আরো বলেন-

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّٰهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّي

'তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো তার ফায়সালা আল্লাহর কাছেই সোপর্দকৃত। ইনিই আল্লাহ যিনি আমার পালনকর্তা।' (সূরা শুরা : ১০)

৪. আর মহান আল্লাহতা'য়ালাকে বাদ দিয়ে তাঁর বান্দাগণ কর্তৃক দ্বিতীয় কোন নীতিমালা ও শরিয়ত প্রবর্তন বা গ্রহণ করাকে তিনি অনুমোদন দেন নি। তিনি বলেন- 'তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে যারা তাদের জন্য ঐ ধর্ম বা শরিয়ত সিদ্ধ করেছে যার অনুমতি আল্লাহপাক প্রদান করেননি।' (সূরা শুরা, ২২)

৫. সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়ত বাদ দিয়ে অন্য শরিয়ত বা তরীকা গ্রহণ করল সে আল্লাহর সাথে শিরক করল আল্লাহতা'য়ালা এবং তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমোদন বহির্ভূত ইবাদতরূপী কাজগুলো হল বিদ'আত। আর সর্ব প্রকার বিদআত বা নব আবিস্কার হল গোমরাহী।

৬. আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধান বহির্ভূত যে সমস্ত শাসন ব্যবস্থা ও আইন কানুন প্রয়োগ করা হয় এগুলো শয়তানী বিধান এবং মুর্খপনা হুকুম।

اَ فَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

তারা কি মুর্খতার বিধানগুলো কামনা করছে, (কিন্তু) বিশ্বাসী লোকদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম ফয়সালাকারী আর কে? (সূরা মায়দা, ৫০)

৭. অনুরূপভাবে হালাল-হারাম সাব্যস্ত করা একমাত্র আল্লাহতায়ালারই বিশেষত্ব। দ্বিতীয় কাউকে এ ব্যাপারে আল্লাহর সংগে শরীক করা কিছুতেই সিদ্ধ নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে সব জন্তুর উপর আল্লাহ তায়ালার নাম উচ্চারণ করা হয় নি, তোমরা এগুলো থেকে ভক্ষন করো না। ইহা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। নিশ্চয় শয়তানরা তার বন্ধুদের প্রত্যাদেশ করে যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। সুতরাং যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তবে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।' (সূরা আনআম, ১২১)

সুতরাং উক্ত আয়াতে শয়তান ও তার সহচরদের আনুগত্য করে আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত জিনিসকে হালাল জ্ঞান করাকে আল্লাহপাক শিরক বলে আখ্যা দিয়েছেন।

৮. অনুরূপভাবে যারা আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত বস্তুকে হারাম ও হারামকৃত বস্তুকে হালাল জ্ঞান করার মাধ্যমে তথাকথিত আলেম উলামা ও নেতৃবর্গের অনুগত হয়ে থাকে তারা যেন আল্লাহকে ত্যাগ করে একাধিক প্রভু গ্রহণ করল।

এ প্রেক্ষাপটেই মহান আল্লাহ বলেন-

اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিতবৃন্দ ও সংসার বিরাগীদেরকে এবং মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ:) কে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছে। অথচ একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্যই তারা আদিষ্ট ছিল। তিনি ছাড়া আর কোন প্রভূ নাই। মুশরিকদের কথিত শিরক হতে তিনি পবিত্র। (সূরা তাওবাহ, ৩১)

৯. হাদীস শরীফের বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত আয়াতখানা হাতেম তাঈর পুত্র হযরত আদি (রা:) এর সামনে তেলাওয়াত করলেন। আদি ইবনে হাতেম তাঈ বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তো আমাদের ধর্মীয় গুরুদের উপাসনা করিনা। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা কি তোমাদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষিত বস্তুকে হালাল বা বৈধ বলে প্রচার করে নি, অত:পর তোমরাও উক্ত বস্তুকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করেছ। অনুরূপভাবে তারা কি আল্লাহ কর্তৃক বৈধ ও হালাল ঘোষিত বস্তুকে হারাম বলে আখ্যা দেয় নি? অত:পর তোমরাও ঐ বস্তুকে হারাম বলেই গ্রহণ করেছ।

১০. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ কথার জবাবে হযরত আদি

বললেন যে, হুজুর হ্যাঁ। (আমাদের ধর্মীয় অবস্থা এমনই)। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, এটাই হল ধর্মীয় গুরুদের পূজা করা। সুতরাং হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার ব্যাপারে ধর্মীয় গুরুদের আনুগত্য করার নামই হল তাদের উপাসনা করা। আল্লাহর সাথে শরীক করা। আর এটা হল উচ্চ পর্যায়ের শিরক যা আল্লাহর একত্ববাদের অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নাই- এ মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থি। কেননা এ কালেমার দাবি ও চাহিদা এটাই যে সর্ব প্রকার বৈধ অবৈধ করার সার্বিক ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহতায়ালারই। দ্বীনের মুজতাহিদ ও শাস্ত্রবিদ যখন কোন বিষয়ে ভুলবশত সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত না হতে পারেন তখনও তারা সাওয়াব পেয়ে থাকেন, কিন্তু দ্বীন ও ইলমের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও আলেমগণ শরীয়াতের বিপরীতভাবে যে কোন বৈধ বস্তুকে অবৈধ এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ বলে ঘোষণা করলে তাদের আনুগত্য স্বীকার করাকে যখন শরীয়াতে ধর্মীয় গুরুদের পূজা ও শিরক করা হয় বলে উক্ত হয়েছে, তখন যারা কাফের এবং ধর্মে অবিশ্বাসী লোকদের দ্বারা প্রণয়নকৃত অর্থাৎ মানব রচিত আইনের অনুসরণ করে এবং সেগুলোকে মুসলিম বিশ্বে প্রচলন ও বাস্তবায়ন করার জন্য সচেষ্ট হয় তাদের সম্পর্কে নতুন করে মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই।

১১. সাধারণত ধর্ম বিশ্বাসীরা পয়গাম্বরদেরকে প্রকৃত শরিয়ত প্রদানকারী মনে করে। কিন্তু এটাও এক প্রকার শিরক। বস্তুত: শরীয়াতের ভিত্তি, আদেশ ও নিষেধ প্রদান করা সব কিছুই আল্লাহর সাথে সুনির্দিষ্ট। পয়গাম্বরগণ শুধু প্রচারক এবং পয়গাম পৌঁছে দেয়ার কাজ করেন। আল্লাহর শিক্ষা লাভের ফলেই শরীয়াতের বিধানাবলী প্রচার করেন।

১২. আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (রহ:) 'তাকভিয়াতুল ঈমান' কিতাবে এভাবে লিখেছেন : আল্লাহতা'আলা বলেছেন-

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ

'আল্লাহতা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করার জন্য; তোমাদের জিহ্বা মিথ্যারূপে ইহা হালাল (বৈধ), ইহা হারাম (অবৈধ) বলে যা বর্ণনা করে, এরূপ কথা বলো না। আল্লাহর উপর যারা মিথ্যা আরোপ করে, নিশ্চয়ই তারা সকলকাম হতে পারে না।' (সূরা নহল : ১১৬)

নিজেদের মত মতো 'ইহা করা দোরস্ত, উহা করা দোরস্ত নহে' এরূপ কিছু নির্দিষ্ট করে নেয়া ঠিক নয়। কারন যা কিছু কর্তব্য অকর্তব্য, আল্লাতা'আলাই তার বিধানপ্রদান করবার একমাত্র মালিক এবং তিনিই তা নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

তার মধ্যে নিজের সিদ্ধান্তকে স্থান দিলে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করা হয়। এরূপ কাজ যারা করে, আল্লাহতা'আলা তাদের মনের বাসনা কখনই পূর্ণ করেন না।

এই আয়াতের দ্বারা জানা যায় যে, মুর্খ লোকেরা বলে থাকে যে, মহররম মাসে পান খাওয়া, লাল কাপড় পরা উচিত নহে, হযরত বিবির নেয়ায (তাবারুক) পুরষে খাবে না, তা প্রস্তুত করতে অমুক অমুক তরকারী নিশ্চয়ই দিতে হবে, তা দাসী বাঁদী বা দ্বিতীয় স্বামীর স্ত্রী ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা খেতে পারবে না; শাহ আবদুল হক সাহেবের ছামানা (তুশা), হালুয়া (মিষ্টি) সতর্কতার সাথে প্রস্তুত কর এবং তা হুক্কা সেবীকে প্রদান করো না; অমুক পীরের নজর স্ত্রীলোক খেতে পারবে না, শাহ মাদারের নিয়ায মালিদা, বুআলী কলন্দরের হালুয়া এবং আসহাবে কাহাফের নামের রুটি ও গোশত ইত্যাদি হালুয়া (মিষ্টি) সতর্কতার সাথে প্রস্তুত কর এবং তা' হুক্কা সেবীকে প্রদান করো না। বিবাহাদিতে অমুক অমুক আচার পালন করতে হবে ইত্যাদি। এই সমস্তই মিথ্যা, কুসংস্কার এবং শিরকের পর্যায়ভুক্ত। কারণ ইহাতে আল্লাহতাআলার আদেশ নিষেধসমূহের মধ্যে নিজের বাতিল সিদ্ধান্তকে প্রশ্রয় দেয়া হয়।" (তাকভিয়াতুল ঈমান, আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (রহ:), অনুবাদ মৌ: মো: মনিরুজ্জামান, পৃঃ ৬৭,৬৮)

আল্লাহতা'আলা কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত শরিয়তী বিধানের পরিবর্তন সম্পর্কে আকীদা

১. কুরআন মাজীদের একটি বক্তব্য ও এর ব্যাখ্যা এ বিষয়ে যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত কুরআন মাজীদের প্রচারে যখন আত্মনিয়োগ করলেন, এ পথে তিনি শত্রুদের পক্ষ থেকে চরম বাধাপ্রাপ্ত হলেন। এরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভ্রান্তিতে ফেলতে চেষ্টা তদবীরের ত্রুটি করেনি। তারা প্রস্তাব রেখেছিল, এ কুরআন বাদ দিয়ে অন্য কুরআন নিয়ে আসা হোক অথবা, এ কুরআন সমাজের লোকদের সুবিধামত পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হোক। যারা এ ধরনের প্রস্তাব রেখেছিল, তাদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করে আল্লাহতা'আলা বলে দিলেন:

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَاۤ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

'তাদের সামনে যখন আমার সুস্পষ্ট বর্ণনা সম্পন্ন আয়াতগুলো পড়ে শোনানো হয়, যারা পরকালে আমার সাক্ষাতের আশা কিংবা ভয় রাখে না তারা (কাফিররা)

বলে, হে মুহাম্মদ, আপনি এ কুরআন ব্যতীত অপর একটি কুরআন নিয়ে আসুন অথবা এ কুরআনেই পরিবর্তন পরিবর্ধন করে দিন। (তখন আল্লাহতা'আলা বললেন), হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন, আমার মনগড়া মতে এ কুরআনে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটানোর সাধ্য নেই। আমি তো কেবল সেসব কিছুরই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি অহী করা হয়। আমি কিয়ামতের কঠোর দিনের ভয়াবহ আযাবকে ভয় করি, যদি আমি আমার পালনকর্তার হুকুমের বিপরীত করি (তবে খোদায়ী বিচার আমাকেও বিপদগ্রস্থ করতে পারে)।' (সূরা ইউনূস : ১৫)

২. উল্লেখিত কুরআনিক বক্তব্যটিতে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, খোদায়ী বিধান অমান্য করার অধিকার কোন মানুষ কিংবা জিনের নেই। এমনকি রাসূলে খোদা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এরও এ ক্ষমতা ছিল না। কুরআন মাজীদের উক্ত দ্বার্থহীন ঘোষণার নিরিখে শিক্ষা নিতে হবে সকল মানুষকে। বিশেষ করে মুসলমান হওয়ার দাবীদার হয়ে যারা কুরআন মাজীদের কিছু অংশ মানছে, আর কিছু অংশকে প্রত্যাখান করছে তাদেরকে। তাছাড়া যারা নিজেদের ইচ্ছা মোতাবেক কুরআন মাজীদের বিষয়াবলীতে বিকৃতি ঘটাচ্ছে তাদেরকে ভেবে দেখতে হবে, তারা কুফরী করছে কিনা।

দ্বীনের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং দ্বীনের অবমাননা করা প্রসঙ্গে আকীদা

১. দ্বীনকে নিয়ে উপহাস করার অর্থ প্রকৃত পক্ষে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা এবং দ্বীন হতে সার্বিক ভাবে বের হয়ে যাওয়া। আল্লাহতা'আলা বলেন–

قُلْ اَبِاللّٰهِ وَ اٰيٰتِهٖ وَ رَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ۝ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ

'হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ তায়ালার সাথে এবং তাঁর হুকুমসমূহের সাথে এবং রাসূলের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছিলে, বাহানা বাদ দাও, তোমরা কুফরী করেছো ঈমান লাভ করার পর।' (সূরা তাওবা, ৬৫-৬৬)

২. সুতরাং উপরে উল্লেখিত আয়াতের মর্মার্থ দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালার সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা কুফরী কাজ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে উপহাস করারও কুফরী। অনুরূপভাবে আল্লাহতায়ালার বিধি নিষেধের সাথে খেল তামাশা করাও কুফরী কাজ। সুতরাং যে ব্যক্তি দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন একটি বিষয়ের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করল,

সে যেন গোটা দ্বীনের সাথেই উপহাস করল।

৩. মুনাফিকরা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনদের সাথে উপহাস বিদ্রুপ করার পরিপ্রেক্ষিতেই কুরআনের এই আয়াত নাজিল হয়। সুতরাং দ্বীনি কোন বিষয়ে উপহাস করা কুফরীরই নামান্তর মাত্র।

কুরআনী আইন ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কোন আইন প্রয়োগ করা সম্পর্কে আকীদা

১. আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনা এবং আল্লাহর ইবাদত উপাসনা করার দাবী হল- বান্দা মহান আল্লাহতায়ালার হুকুমের সামনে নম্র অনুগত থাকবে, প্রভুর শরীয়াতের উপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং কথা-বার্তা, কাজ-কর্মে, বিভিন্ন মৌলিক ব্যাপারে, কিংবা ঝগড়া-বিবাদ, মামলা মোকাদ্দমা, খুন খারাবী তথা সর্ব প্রকার দেনা পাওনার মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে কুরআন ও হাদীসের আলোকেই মীমাংসা গ্রহণ করবে। কেননা আল্লাহতায়ালাই প্রকৃত মীমাংসাকারী এবং তাঁর পক্ষ হতেই রায় প্রদান করা হয়। মুসলিম দেশগুলোর শাসন কর্তাদের কর্তব্য হল ইসলামী শরীয়তের আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন-কানুন প্রবর্তন করা এবং শরীয়ার আইনে বিচার ফায়সালা করা। একইভাবে প্রজা বা বিচার প্রার্থীদের উপর আবশ্যকীয় বিষয় হল যে, তারাও যাতে কুরআন ও হাদীস শরীফের হুকুম অনুসারেই বিচার প্রার্থনা করে।

২. যে ব্যক্তি ইসলামী শরিয়াতের বিধান বর্জন করে তার পরিবর্তে মানব রচিত আইন প্রয়োগ করে তার এ কাজ দ্বারা সে এ কথাই প্রমাণ করল যে তার দৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার বিধানের চাইতে সৃষ্টজীব মানবের আইন অধিকতর উত্তম ও কল্যাণকর। আর এ মত পোষণ করা যে কুফরী কাজ এতে বিন্দু পরিমান অবকাশ নেই।

আর উক্ত কুফরীই উচ্চ পর্যায়ের কুফরী যা মানুষকে দ্বীন ইসলাম থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং আল্লাহর একত্ববাদকে ধ্বংস করে দেয়।

তাশবীহ বা আল্লাহপাকের জন্য সৃষ্টির সাথে তুলনীয় মানবীয় গুণাবলী সাব্যস্ত করা সম্পর্কে আকীদা

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ) তাঁর রচিত 'ফাওজুল কবীর'

গ্রন্থে 'তাশবীহ' এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-

اَلتَّشْبِيْهُ عِبَارَةٌ عَنْ اِثْبَاتِ الصِّفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ لِلّٰهِ تَعَالٰى

অর্থাৎ মানবীয় কোন গুণাবলী আল্লাহপাকের জন্যে সাব্যস্ড় করাকে তাশবীহ বলে। যথা- আল্লাহর জন্য সন্ড়ন, স্ত্রী, আকৃতি এবং দেহ ইত্যাদি সাব্যস্ড় করা। মোটকথা কোন মাখলুককে আল্লাহর কোন খাছ গুণে অংশীদার বা সমতুল্য মনে করা শিরক। আর মাখলুকের যে কোন গুণাবলীতে আল্লাহকে তাদের সমতুল্য মনে করা তাশবীহ। আল্লাহ সম্পর্কে এ উভয় প্রকার আকীদাই তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি এগুলো হতে পাক ও পবিত্র। অর্থাৎ কোন মাখলুক যেমন কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহর সাথে তুলনীয় নয়, তদ্রূপ তিনিও কোন ভাবেই কোন মাখলুকের সাথে তুলনীয় নন। এবং তুলনীয় হওয়া অসম্ভব। তাওহীদের প্রকৃত অর্থ এটাই।

তাশবীহর আকীদা পোষনকারীদেরকে মোশাব্বেহা ফেরকা বলা হয়। মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন মোশাব্বেহা ফেরকা রয়েছে। যেমনঃ মোজাচ্ছেমা, মোনাওভেরা, হলুলিয়া, এত্তেহাদীয়া ইত্যাদি।

আল্লাহপাকের দীদার প্রসঙ্গে আকীদা

১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে মুমিনগণ পরকালে আল্লাহর দীদার বা দর্শন লাভে ধন্য হবে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন :

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

ঐদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল সজীব হবে, স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সূরা ক্বিয়ামাহ : ২২-২৩)

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে শীঘ্রই এভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা চৌদ্দই রাত্রের চাঁদ দেখতে পাও। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন : নিশ্চয়ই ঈমানদার বান্দারা বেহেশতে আল্লাহতা'আলাকে দেখতে পাবে।

৩. অতএব, পরকালে আল্লাহকে ঈমানদার বান্দারা দেখতে পাবে- একথা কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উলামাগণ গ্রহণ করেছেন। তবে বেহেশতেও বান্দারা আল্লাহকে দেখবে ঠিকই, কিন্তু সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে না, যেরূপ দেখলে কোন বস্তুর আদ্যপান্ড় সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায়। দুনিয়ার হায়াতে সৃষ্টিজগতের আওতায় আল্লাহকে কেউ দেখতে পাবে না।

৪. আল্লাহতা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন :

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۫ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ

সৃষ্টিজগতের চোখগুলো আল্লাহতা'আলাকে দেখতে পাবে না।

(সূরা আল আন'আম : ১০৩)

৫. ইহজগতে চোখের দৃষ্টিশক্তি সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী। তাই এ চোখ আল্লাহকে দেখতে অক্ষম। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছীর লিখেছেন, এ বিষয়ে পূর্ববর্তী উলামাগণের প্রথম কথা হলো–

لَا تُدْرِكُهُ فِى الدُّنْيَا وَ اِنْ كَانَتْ تَرَاهُ فِى الْاٰخِرَةِ

চোখগুলো এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখবে না; যদিও পরকালে বেহেশতীরা আল্লাহকে দেখতে পাবে। বেহেশতী বান্দারা আল্লাহতা'আলাকে বেহেশতে দেখতে পাবে।

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সত্য কথা হলো, তোমাদের কেউ যতক্ষণ না মরবে, সে তার রব, অর্থাৎ আল্লাহতা'আলাকে কখনো দেখতে পাবে না। (বুখারী)

৭. কেউ যদি স্বপ্নে দেখে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলছে, তবে যার মুখ থেকে কথা শুনেছে, সে আল্লাহর সৃষ্টি কোন কিছু হতে পারে। তার দিকে তাকিয়ে স্বপ্নদর্শক কথা শুনছে। কথাটি এমনও হতে পারে, স্বপ্নে দেখা সত্তাটি আল্লাহর কথা শোনাবার জন্য মুসা (আ:) এর বৃক্ষটির মত ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই বৃক্ষটি যেমন আল্লাহ নন, স্বপ্নে দেখা সত্তাটিও আল্লাহ নন। সত্তাটিকে আল্লাহ বলে ধরে নেয়া হলে সৃষ্টির সাথে আল্লাহর কোন সাদৃশ্যতা নেই কথাটি ঠিক থাকে না। স্বপ্নে দেখা ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহ বলা তেমনি ভুল হবে, যেমনি মুসা (আ:) এর বৃক্ষটিকে আল্লাহ বলতে গেলে ভুল হবে।

৮. বর্ণিত আছে– رَاَيْتُ رَبِّىْ فِىْ صُوْرَةِ شَابٍّ 'আমি আমার রবকে যুবকের আকৃতিতে দেখেছি।' কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা নয়। সম্ভবত: পরবর্তী হাদীস জালকারীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে জাল হাদীস রচনা করতে গিয়ে এসব কথা ছড়িয়ে দিয়েছে।

যারা স্বপ্নযোগে আল্লাহ দর্শন সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেছেন, তারাও আল্লাহতা'আলার আকার আকৃতি নির্ধারণ ও বর্ণনার বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন।

৯. এ বিষয়ে যে সকল মহান ব্যক্তিগণের স্বপ্ন হয়েছে এবং স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি ইল্ম, রহমত ও মহব্বতের প্রবাহ পৌঁছেছে, তাদের অন্তরাত্মা আল্লাহতা'য়ালার প্রতি প্রত্যয় ও বিশ্বাসের দিক থেকে পূর্বের চাইতে অধিক প্রত্যক্ষতা ও বাস্ড়বতা অর্জনে সফলতা অর্জন করেছে। আর

এটাই হলো অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দর্শন। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এ ধরণের আল্লাহ দর্শনের সম্ভাব্যতার বিষয়টাই আহলুছছুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের উলামাগণ কর্তৃক স্বীকৃত। এ ধরনের অন্তরাত্মা সম্পন্ন বান্দাগণ শরী'আতের সঠিক আনুগত্য ও আল্লাহর ধ্যানে বৈষয়িক জগতের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে খোদায়ী সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ইহকালে আল্লাহর সাথে বান্দার দীদার বা সাক্ষাত লাভ এবং মিলে থাকার অর্থ এটাই। বেহেশতে আল্লাহতা'আলা বান্দাদেরকে সাক্ষাত যখন দেবেন, তখন আল্লাহতা'আলার সাথে বান্দার প্রকৃত সাক্ষাত হবে। ইহকালের গন্ডিতে থেকে আল্লাহর আকার-আকৃতি নিয়ে আলোচনা করা নিষেধ। এখানে আল্লাহর ইবাদতের স্থান, আল্লাহকে দেখার স্থান বেহেশতে।

১০. ফুরফুরার মরহুম পীর হযরত মাওঃ আবুল আনসার মুহাম্মদ আব্দুল কাহহার সিদ্দিকী আল কুরাইশী (রহ.) এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন এভাবে: দুনিয়ার জীবনে মানুষ আল্লাহতা'আলাকে দেখতে পাবে না। এখানে মানুষ খাঁটি নিয়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত মুতাবিক আল্লাহতা'আলার ইবাদত করবে, হাশরে আল্লাহকে পাবে, বেহেশতে আল্লাহকে দেখবে।

আল্লাহপাক ছাড়া অন্য কারো গায়েবী বা অলৌকিক শক্তি বা ক্ষমতা সম্পর্কে আকীদা

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর অতিপ্রাকৃতিক জগতের উপর কর্তৃত্ব আছে এবং অতিপ্রাকৃতিক অ-বস্তুগত কিংবা অলৌকিকভাবে কাউকে সাহায্য করতে বা বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে বলে বিশ্বাস করাও সুস্পষ্ট শিরকের পর্যায়ভুক্ত। তাই যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং অলৌকিকভাবেই কোন ঘটনা সংঘটিত করতে, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য, রোজগারহীনকে রোজগার, সন্তানহীনকে সন্তান দিতে পারে, তাহলে সে হবে মুশরিক। কেননা সে এমন একটি শক্তি এমন এক জনের আছে বলে বিশ্বাস করছে যা মূলত-ই তার নেই, থাকতে পারে না, যে শক্তি থাকতে পারে কেবল আল্লাহর এবং তা একান্তভাবে তাঁরই রয়েছে।

২. কোন পিপাসার্ত ব্যক্তি যদি কারো নিকট পানি চায়, তবে তা স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী এই কাজ হবে, তাতে অলৌকিকতা অতিপ্রাকৃতিক শক্তি বিশ্বাসের কোন ব্যাপার নেই। কিন্তু কোন মৃত নবী, পীর, গাওস, ওলীর কবরের নিকট গিয়ে অনাবৃষ্টিকালে যদি বৃষ্টিপাত চাওয়া হয়, তাহলে এইরূপ চাওয়ার মূলে এই বিশ্বাস নিহিত থাকে যে, যার কাছে বৃষ্টি চাওয়া হয়েছে সে অলৌকিকভাবে বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষমতার অধিকারী। আর এটাই শিরক। কেননা এইরূপ শক্তি যারই আছে বলে বিশ্বাস করা হবে, তাকে-ই 'ইলাহ' বানানো হবে। অথচ কুরআনের

ঘোষণানুযায়ী অলৌকিকভাবে কারো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই আছে, অন্য কারো নেই।

৩. নবী-রাসূলগণের মুযিজা প্রকাশের পর্যায়েও আল্লাহতা'আলা এ কথাই ঘোষণা করেছেন নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে :

وَ مَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

এবং কোন রাসূলেরই কোন মুযিজা বা নিদর্শন দেখানোর ক্ষমতা বা অধিকার নেই আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত। (সূরা মু'মিন : ৭৮)

অতএব প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নিজস্ব ক্ষমতা ও ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা বা অধিকার আছে-একথা বিশ্বাস করা সুস্পষ্টরূপে শিরক।

উপকরণ বা কার্যকারণের সহায়তা গ্রহণ সম্পর্কে আকীদা

উপকরণ বা কার্যকারণের এই জগত আল্লাহতা'আলারই সৃষ্টি। এখানে তিনি মানুষকে উপকরণ বা কার্যকারণের বাধ্যবাধকতার মধ্যে জীবনযাপনকারী জীব হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন। অতএব মানুষ এ জগতে বেঁচে থাকার জন্য উপকরণ বা কার্যকারণের-বস্তুগত দ্রব্য সামগ্রীর আনুকুল্য ও সহায়তা গ্রহণে স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য। অতএব নিছক উপকরণ বা কার্যকারণের সহায়তা গ্রহণ নিশ্চয়ই শিরক হবে না। তবে সেই সাথে যদি এই বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে, উপকরণ বা কার্যকারণ সমূহেই নিজস্ব স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শক্তি রয়েছে কোন কাজ ঘটানোর, তাতে আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুমতির কোন অপেক্ষা নেই, তাহলে তা অবশ্যই শিরক হবে। যেমন ঘরে আগুন লেগেছে। স্বাভাবিক নিয়মেই আগুনে ঘর জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। এই জ্বালানোর শক্তি আগুনের নিজস্ব এবং আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই তা জ্বালাবে-এইরূপ ধারণা পোষণ শিরক। অনুরূপভাবে সে আগুন নেভানোর জন্য অবিলম্বে পানি ঢালতে হবে। পানি আগুন নিভিয়ে ফেলবে। কিন্তু যদি মনে করা হয় যে, পানির আগুন নিভানোর শক্তি একান্তই নিজস্ব, তা আগুন নেভাবেই-আল্লাহর অনুমতি না হলেও, তবে তা-ও শিরক হবে।

এখানে তাওহীদী বিশ্বাস হলো, আগুন জ্বালায় আল্লাহর দেয়া দাহিকা শক্তির বলে ও তাঁর অনুমতিক্রমে এবং পানি আগুন নিভায় আল্লাহর দেয়া নির্বাপণ শক্তির বলে ও তার অনুমতিক্রমে। আল্লাহর দেয়া শক্তি ছাড়া আগুন বা পানি-কারোরই কোন শক্তি নেই, কারোরই কিছু করার নেই। সমগ্র প্রাকৃতিক আইন, বস্তু, দ্রব্য-

সম্ভার, ঔষধপত্র সব কিছুর ক্ষেত্রেই শিরক ও তাওহীদী আকীদার মধ্যে এই মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

আল্লাহপাক ছাড়া অন্য কাউকে আ'লিমুল গায়েব মনে করা বিষয়ক আকীদা

১. গায়েব (غَيْبٌ)-এর পরিচয় : 'গায়েব'-এর আভিধানিক অর্থ হল কোনো জিনিস গোপন থাকা। যে জিনিস আমাদের থেকে গোপন রয়েছে তাকেও 'গায়েব' বলা হয়। আর শরীয়তের পরিভাষায় 'গায়েব' বলা হয় প্রত্যেক ঐ জিনিসকে যা বান্দার থেকে গোপন থাকে। ইবনে কাছীর (রহ.) সুদ্দী ও মুররা হামাদানীর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, "গায়েব হল ঐ জিনিস, যা বান্দা থেকে গোপন রয়েছে। যেমনঃ জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থাসমূহ এবং কুরআনে বর্ণিত বিষয়াবলী।" (তাফসীরে ইবনে কাছীর) তাফসীরে মাদারেকে বলা হয়েছে : ঐ জিনিসকে গায়েব বলা হয়, যার উপর কোনো প্রমাণ বিদ্যমান নেই এবং কোনো মাখলুক যে বিষয়ে অবগত নয়।

২. নবী-রাসূলগণ গায়েব জানতেন না : আলিমুল গায়েব একমাত্র আল্লাহপাক। তিনি ছাড়া কোন মাখলুকের গায়েব সম্পর্কিত জাতি ইলম বা মূল জ্ঞান নেই। আল্লাহপাক গায়বের মূল কর্মকাণ্ড ও হাক্বীকত আসমান ও জমিনের কোন মাখলুককে বলে দেননি, এমনকি নবী-রাসূলগণকেও না। তাই রোজ কিয়ামতে সকল নবী-রাসূলকে এই স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ۗ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ۗ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

যে দিন আল্লাহতা'আলা রাসূলগণকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমাদের (দাওয়াতের) কি জবাব দেয়া হয়েছে? তখন তারা বলবে: আমরা কিছুই জানি না, হে আল্লাহ! আপনিই সকল গোপন ও নিগূঢ় তত্ত্ব জানেন। (সূরা মায়েদা: ১০৯)

৩. জিন ও ফেরেশতারা গায়েব জানে না : কোন জিন বা ফেরেশতার পক্ষে গায়বের খবরাদি জানা সম্ভব নয়। আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যারাই রয়েছে তারা কেউই 'গায়েব' জানে না, সব কিছু জানেন একমাত্র আল্লাহ। (সূরা নাম্‌ল : ৬৫)

অতএব ফেরেশতা, জিন বা মানুষ কেউই 'গায়েব' জানতে পারে না। হযরত সুলায়মানের খেদমতে নিয়োজিত জিনদের সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা জানিয়ে দিলেন:

اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ

ওরা যদি গায়েব জানতই, তাহলে তারা সেই অপমানকর আযাবে দীর্ঘদিন বন্দী হয়ে থাকত না। (সূরা সাবা: ১৪ নং আয়াত)

৪. জিনদের মাধ্যমে গায়বের খবর জানা ও অলৌকিক কাজ করা : যখন আল্লাহতা'আলার ফিরিশতাগণ আকাশে প্রতিপালক আল্লাহতা'আলার কাছ থেকে দুনিয়াতে কখন কি হবে জানতে পারেন এবং একে অপরকে এই সংবাদ বলে থাকেন তখন শয়তান অতি গোপনে সে সমস্ত সংবাদ শুনে ভণ্ড পীর-ফকিরদের জানিয়ে দেয়। এই সুযোগে ভণ্ড ফকিররা সে সমস্ত সংবাদ মানুষদের বলে এবং পরে যখন মানুষের কাছে সত্য প্রমাণিত হয়, তখন তারা ঐ সমস্ত ফকিরদের সম্পূর্ণভাবেই বিশ্বাস করে নেয়।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَ جَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ

আর সেটাকে শয়তান মারার যন্ত্র হিসেবে বানিয়েছি। আর তাদের জন্য আমি জ্বলন্ত আগুনের সাজা তৈরি করেছি। (সূরা মুলক: ৫)

অর্থাৎ তারকাগুলি শয়তানকে মারার যন্ত্র হিসেবে আল্লাহতা'আলা বানিয়েছেন। কারণ যখন ফেরেশতাগণ আকাশের উপর দুনিয়াতে কখন কি হবে সেই নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন তখন শয়তান চুপে চুপে সে সমস্ত খবর শুনতে থাকে। যখনই ফেরেশতাগণ শয়তানের উপস্থিতি জানতে পারেন তখনই তাদের উপর তারকা নিক্ষেপ করেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– ইবনে আব্বাস (রা:) বলেছেন যে, তাঁরা এক রাতে রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বসেছিলেন। হঠাৎ একটি তারকা পড়ে গেল এবং আগুনের মতো জ্বলে উঠল। তা দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, এমনভাবে যখন তারকা পড়ে তখন তোমরা কি বল? উত্তরে তারা বললেন, আমরা বলে থাকি, আজ রাতে একজন নেক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা মৃত্যুবরণ করেছেন। অত:পর তিনি বললেন, আকাশের তারকা কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে বিক্ষিপ্ত হয় না। বরং আল্লাহ যখন কোন কাজ করেন তখন আরশ বহনকারী ফিরিশতাগণ আল্লাহর তসবীহ পাঠ করেন। সাথে সাথে নিচের অন্যান্য আকাশবাসীরাও আল্লাহর তসবীহ পাঠ করেন। এমনকি শেষ আকাশের ফিরিশতাগণও তাঁর তসবীহ পাঠ করেন। অত:পর আরশ বহণকারী ফিরিশতাগণকে তাদের নিকটস্থ ফিরিশতাগণ জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাদের প্রভু

কী বলেছেন? তখন তারা তাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়। এমনিভাবে আকাশবাসীরা একে অন্যের কাছে জানতে পারে। এমনকি এ সংবাদ শেষ আকাশবাসীদের নিকট পৌঁছে। অত:পর জিন জাতি অতি গোপনে তা শুনে এবং ঐ সমস্ড় মানুষদের (পীর ফকীরদের) কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। সুতরাং যে সংবাদটুকু তারা জিনদের কাছে সংগ্রহ করে তা সত্য, কিন্তু তারা তার সাথে মিথ্যা বলে এবং অধিক বাড়িয়ে বলে। (মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

৫. গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তাদের কথা বিশ্বাস করা : আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বললেন, কিছুই নয়, (অর্থাৎ তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, মিথ্যা)। লোকজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কোন কোন সময় এমন কথা বলে যা সত্য হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ কথাটি আল্লাহর তরফ থেকে পাওয়া। জিন তা তড়িৎ গতিতে শুনে নেয় এবং তার বন্ধু গণকের কানে তুলে দেয়, অত:পর গণক ঐ কথাটির সাথে শত শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রকাশ করে। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন : যারা গণক অথবা ভবিষ্যদ্বক্তাদের নিকট গিয়ে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআনকে অস্বীকার করল। (আহমদ)

আল্লাহতা'আলা বলেন :

وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ

এই অজ্ঞ লোকগুলি জিনকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছে অথচ ঐগুলোকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আনআম: ১০০)

৬. কোন জীবিত বা মৃত পীর ওলী গায়েব জানেন না : গায়েব জানা সম্পর্কিত অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীলসমূহের ভিত্তিতে বলা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন গায়েব জানতেন না, তখন কোন জীবিত বা মৃত পীর-ওলী-দরবেশের পক্ষে গায়েব জানার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। যদি কেউ তা মনে করে, তবে তা হবে আকীদার ক্ষেত্রে এক মহা শিরক, কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণাবলীর সম্পূর্ণ খেলাপ এবং সুন্নতী আকীদার বিপরীত এক সুস্পষ্ট বিদয়াত।

৭. পাশা, তীর, টিয়াপাখী ইত্যাদির সাহায্যে ভাগ্য জানতে চাওয়া বিষয়ে আকীদা : ইসলাম পাশার সাহায্যে ভাগ্য জানতে চাওয়াকে সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। 'পাশা' বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে কতগুলো তীর। জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা এগুলোর সাহায্যে ভাগ্য জানবার জন্যে চেষ্টা করত, সেজন্যে সেগুলোকে ব্যবহার করত। তার একটার উপর লেখা থাকত: 'আমাকে আমার আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন'। দ্বিতীয়টির উপর লেখা থাকত, 'আমাকে আমার আল্লাহ নিষেধ করেছেন'। তৃতীয়টি থাকত সম্পূর্ণ খালি। তার উপর কিছুই লেখা থাকত না। তারা যখন বিদেশ যাত্রার ইচ্ছা করত কিংবা বিয়ে ইত্যাদি কাজের ইচ্ছা করত, তখন তারা মুর্তির ঘরে উপস্থিত হত। আর তাতেই রক্ষিত থাকত এই তীরসমূহ। তাদের ভাগ্যে কি লেখা আছে তা তারা জানতে চাইত। যদি প্রথম তীরটি-যাতে 'আদেশ করেছেন' লেখা হয়েছে– বের হত, তাহলে তারা অগ্রসর হত। আর যদি নিষেধ লেখা তীরটি বের হত, তাহলে তারা প্রস্ড়াবিত কাজ থেকে বিরত থাকত। আর খালি তীরটি বের হলে তারা বারবার তীর বের করত যেন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়।

আমাদের সমাজে জাহিলিয়াতের ঠিক এ ধরনটি প্রচলিত না থাকলেও এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বেশ কিছু কাজ প্রচলিত রয়েছে। যেমন 'রমন' কড়ি, কিতাব খুলে ফাল নেয়া, তাসের পাতা বা পেয়ারা পড়া, টিয়া পাখীর মাধ্যমে ভাগ্য জানতে চাওয়া ইত্যাদি এ পর্যায়ে যা কিছু করা হয়, ইসলামে তা সবই সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি যেসব খাদ্য হারাম করেছেন, তার উল্লেখের পর বলেছেন:

وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ؕ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ

তোমরা তীরসমূহ দ্বারা ভাগ্য জানতে চাইবে, তা হারাম, তা আল্লাহর আইন লংঘনমূলক কাজ। (সূরা মায়েদা: ৩)

আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

যে লোক গণকদারী করল কিংবা তীর দ্বারা ভাগ্য জানতে চেষ্টা করল অথবা খারাপ 'ফাল' লওয়ার দরুন বিদেশ সফর থেকে ফিরে গেল, সে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করতে পারবে না কখনও। (বুখারী ও মুসলিম)

৮. ফালনামা, খাবনামা, তালেনামা সম্পর্কে আকীদা : ফালনামা, খাবনামা, তালেনামা ইত্যাদির মাধ্যমে ভাগ্য জানতে চাওয়া বা ভবিষ্যতের কোন বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে চেষ্টা করা সম্পূর্ণ হারাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : পাখীর বুলী থেকে ফাল

গ্রহণ করা, এবং পাখীর উড়ে যাওয়া হতে ফাল গ্রহণ করা, এবং কঙ্কর নিক্ষেপ ও দাগ কেটে অবস্থা নিরূপণ করা হচ্ছে শয়তানী কাজ।" (আবু দাউদঃ ইবনে মাজাহ) অপর একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "ফাল বের করা শিরক।' তারপর সে সাহাবী আরও বলেছেন যে, সাহাবীদের মাঝে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি এ কাজকে খারাপ না জানতেন। বরং সকলেরই উচিত আল্লাহর উপর ভরসা করা।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

৯. কুরআন শরীফ থেকে ফাল নেয়া সম্পর্কে আকীদা : কুরআন শরীফের সাহায্যে বিভিন্ন নিয়মে শুভ অশুভ নির্ণয় করার কথা অনেক বই পুস্ড়কে লেখা থাকে। যেমন-এগার বার দুরূদ শরীফ, সাত বার সূরা ফাতেহা ও তিন বার আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করত দিনের প্রথম ভাগ হলে কুরআন শরীফের প্রথমাংশ, দ্বিপ্রহর হলে মধ্যমাংশ এবং শেষভাগ হলে শেষাংশ খুলে ঐ পৃষ্ঠার প্রথম আয়াতের মর্ম অনুপাতে শুভ ফলাফল নির্ণয় করা হয়। মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের মতে এটা নাজায়েজ আর নির্ণিত ফলাফলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাও সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ।

১০. জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে আকীদা : জ্যোতির্বিদ্যা হল সৌরজগতের বিভিন্ন অবস্থা পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা। যেমন প্রবল ঝড়-তুফান এবং বৃষ্টি আসার পূর্বাভাস দেয়া, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়সমূহ। যেগুলো সম্বন্ধে ওদের ধারণা এই যে, তারকারাজির কক্ষপথে ঘূর্ণন এবং তারকাদের মিলিত হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের দ্বারা পৃথিবীতে সংঘটিত ঐ ঘটনাবলীর মূল কারণ সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায়। আর তারা বলে থাকে যে, অমুক নক্ষত্রের অমুক স্থানে অবস্থানের সময়ে যে ব্যক্তি বিবাহ করবে তার অমুক অমুক জিনিস অর্জিত হবে। যে ব্যক্তি অমুক নক্ষত্রের অমুক ক্ষণে সফরে থাকবে সে অমুক জিনিস লাভ করবে। আর অমুক ক্ষণে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে সে এই ধরনের ভাগ্যবান কিংবা এই ধরনের ভাগ্যহীন হবে। যেমন বর্তমান বিভিন্ন নিম্নশ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় ঐ ধরনের অর্থহীন-আজগুবী খবরাখবর পরিবেশন করা হয় আর এগুলোর আশে-পাশে বিক্ষিপ্ত তারকারাজি, সরল রেখা, বক্র রেখা ইত্যাদি ধরনের আঁকা-বাঁকা রেখা অংকিত থাকে। কিছু সংখ্যক মূর্খ ও নিম্ন শ্রেণীর ঈমানদার ব্যক্তিও বিভিন্ন সময় জ্যোতিষদের নিকট গমন করে থাকে এবং তাদেরকে স্বীয় ভবিষ্যত সম্পর্কে এবং ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে, বিবাহশাদী ইত্যাদি সম্পর্কেও প্রশ্ন করে থাকে। ফলে তারা নিজেদের ঈমান হারিয়ে ফেলছে।

আর গ্রহনক্ষত্রগুলো আল্লাহতাআলা কর্তৃক সৃষ্ট, আল্লাহর অধীনস্ড়-অনুগত বস্তু। দুনিয়ার কার্যাবলীর উপর এদের কোন ক্রিয়া নেই। এবং এগুলো কোন প্রকার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কিংবা কারো জীবন বা মৃত্যু ইত্যাদির বার্তা বহন করে না, বরং আসমানী বাণী ছিনতাইকারী শয়তানগুলোই ঐ সমস্ড় বিভ্রান্ড়িকর কাজগুলো করে থাকে। অর্থাৎ সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত বানোয়াট খবরসমূহ মানুষের কাছে প্রকাশ ও প্রচার করে থাকে।

১১. হস্ড়রেখা গণনা সম্পর্কে আকীদা : পামিস্ট্রি (চধষসরংঃৎু) বা হস্ড় রেখা বিচার বিদ্যার মাধ্যমে যে হাতের রেখা ইত্যাদি দেখে ভাগ্যের বিষয় ও ভূত-ভবিষ্যতের শুভ-অশুভ সম্পর্কে বিশ্লেষণ দেয়া হয়, ইসলামে এরূপ বিষয়ে বিশ্বাস রাখা কুফরী। (ইমদাদুল ফাতওয়া, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৫৮-৫৯)

১২. যাদুবিদ্যা সম্পর্কে আকীদা : হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– তোমরা ধ্বংসকারী সাতটি জিনিস হতে বেঁচে থাক। সাহাবায়ে কেরাম (রা:) আরজ করলেন–ঐ সাতটি বস্তু কি? প্রত্যুত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরকী করা এবং যাদু বিদ্যা...। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

গণকদারদের কাছে যাওয়া এবং গায়েবী ও রহস্যাবৃত বিষয়াদি জানতে চেষ্টা করাকে যেমন ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে, তেমনি যাদু বা যাদুকরদের কাছে কোন রোগের চিকিৎসার্থে বা কোন সমস্যার সমাধানের জন্যে আশ্রয় গ্রহণকেও সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজ থেকে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কতার কথা ঘোষণা করেছেন। বলেছেন, যে লোক গণকদারী করল বা যার জন্যে গণকদারী করা হল, যে ফাল গ্রহণ করল কিংবা যার জন্যে ফাল গ্রহণ করা হল কিংবা যে যাদুগিরি করল বা যার জন্যে যাদুগিরি করা হল, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) বলেছেন : যে লোক কোন গণকদার বা যাদুকর কিংবা গায়েবী কথা বলার লোকের কাছে গেল, তাকে জিজ্ঞেস করল এবং সে যা বলল সে সত্য বলে বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি অবতীর্ণ দ্বীন-ইসলামকে অস্বীকৃতি জানাল, তা অবিশ্বাস করল।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, মদ্যপায়ী, যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী ও রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারী কখনই জান্নাতে যাবে না। (ইবনে হিব্বান)

এসব হাদীসের আলোকে জানা গেল যে, কেবল যাদুকরের কাজই হারাম নয়, যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী এবং গণকদার বলে তাকে যে বিশ্বাস করে, তাও সম্পূর্ণ হারাম।

১৩. চেহারা দেখেই অতীত-বর্তমান ভবিষ্যতের কথা বলে দেয়া সম্পর্কে আকীদা : পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে আজকাল প্রচার করা হচ্ছে– অমুক সাধক, অমুক তদবিরকারক, অমুক হুজুর রোগীর চেহারা দেখেই তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কথা বলে দেন এবং সব ধরনের সমস্যার সমাধান করে দেন। এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ পর্যন্ড় করা হয়।

এভাবে চেহারা দেখে অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের কথা অর্থাৎ গায়বের কথা বলে দেয়ার দাবি করা, এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করা, রোগী ও সাক্ষাতপ্রার্থীদের জন্যে তাদের কথা বিশ্বাস করা শিরকের পর্যায়ভুক্ত।

হযরত হাফসা (রা:) এর নিকট হতে মুসলিম (রহ:) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি কোন ভবিষ্যত বক্তার নিকট গমন করে কিছু জিজ্ঞাসা করে, চল্লিশ দিন পর্যন্ড় তার ইবাদত কবুল হয় না। (মেশকাত বাবুল কাহানত)

১৪. রাশিচক্র সম্পর্কে আকীদা : রাশিচক্র বিশারদরা সারাটি বছরকে ১২টি রাশিতে ভাগ করেছে। যেমন-তুলা রাশি, মিথুন রাশি, কুম্ভ রাশি, বৃশ্চিক রাশি ইত্যাদি। জন্ম তারিখ অনুযায়ী একেক জনকে একেক রাশির জাতক হিসেবে গণ্য করা হয়। কোন রাশির জন্যে এ বছরটি বা অমুক দিনটি কেমন যাবে এ ব্যাপারে পূর্ব থেকেই ভবিষ্যদ্বানী করা হয়। ফলে মানুষ রাশিচক্র দেখে কোন কাজের শুভ-অশুভ পরিণতি সম্পর্কে অবগত হয়ে যে কোন কাজ করতে পারে।

রাশিচক্র দেখে এভাবে মানুষের ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে ধারণা করা, শুভ-অশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করা গায়েবী ইলমের দাবি করার সমতুল্য এবং এভাবে রাশিচক্রে বিশ্বাস স্থাপন করা শিরকের পর্যায়ভুক্ত।

১৫. চাল পড়া, আয়না পড়া, কুরআন ঘোরানো, তুলা রাশির মাধ্যমে চোর ধরা সম্পর্কে আকীদা : আজকাল আমাদের দেশে চোর ধরার জন্য ফকীরদের অনেক নতুন নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন-উপস্থিত সবাইকে চাল পড়া খাওয়ানো হলে যে রক্ত বমি করে তাকেই চোর বলে সাব্যস্ড় করা হয়। কখনোবা আয়না পড়ে তাতে যার ছবি উঠে তাকেই চোর হিসেবে সনাক্ত করা হয়। অনেক সময় বদনার উপর কুরআন রেখে দু'আ পড়া হয়, যার নামে কুরআন ঘুরতে শুর" করে তাকেই চোর হিসেবে পাকড়াও করা হয়। অনেক জায়গায় তুলা রাশির জাতককে দিয়ে চোর সনাক্ত করা হয়। এভাবে চোর সনাক্ত করা জায়েজ নয়। কদাচিৎ দু'একটি চোর এ পদ্ধতিতে ধরা পরলেও পড়তে

পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরপরাধ লোকগুলোই চোর বলে সাব্যস্ড় হয়। এসব পদ্ধতিতে পরোক্ষভাবে গায়েবী ইলমের দাবি করা হয়, বদনার উপর কুরআন রাখায় কুরআনের অবমাননা করা হয়, রাশিচক্রে বিশ্বাস করা হয়। সুতরাং এসব পদ্ধতি স্পষ্ট হারাম।

...তৎকালে আরবে এমন কিছু প্রতারকও ছিল যারা চুরির ক্ষেত্রে অদৃশ্যভাবে পাত্তা লাগানোর দাবি করতো। আরবে তাদেরকে বলা হত আররাফ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কেউ কোন চুরির মালের খোঁজ করার জন্য আররাফদের কাছে যাবে তার চল্লিশ দিনের নামাজ কবুল হবে না। [(সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, শিবলী নুমানী (রহ:)]

১৬. ভবিষ্যদ্বানী করা সম্পর্কে আকীদা : জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে, ক্রিষ্টাল বল থিয়রীর সাহায্যে, কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন হিসাব নিকাশ করে আগামী দিনের বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করা এবং এসব ভবিষ্যদ্বানী বিশ্বাস করা উভয়টাই জায়েজ নয়। অমুক প্রেসিডেন্ট অমুক সালে মারা যাবে, অমুক-অমুক দেশের মধ্যে যুদ্ধ হবে, অমুক সালে ইমাম মেহেদী আসবেন, এত বছরের মধ্যে কিয়ামত হবে ...... এভাবে ভবিষ্যতের কোন বিষয় সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে ভবিষ্যদ্বানী করা গায়েবী ইলমের দাবি করার সমতুল্য এবং স্পষ্ট হারাম।

১৭. আবহাওয়া ও পরিবেশ সংক্রান্ড় পূর্বাভাস সম্পর্কে আকীদা : আবহাওয়া ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা উন্নত যন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন লক্ষণ, মহাকাশ থেকে তোলা ছবি, গণনা ও পরিসংখ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে বায়ু প্রবাহ, ঝড়বৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ড়, চন্দ্রগ্রহণ, জোয়ার ভাটা ইত্যাদি সম্পর্কে দিনক্ষণসহ পূর্বাভাস দেন। কখনও কখনও এসব পূর্বাভাস সত্যে পরিণত হয়, আবার কখনওবা ভুল বলে প্রমাণিত হয়।

সাধারণ মানুষ এসব বিষয়কে 'ইলমে গায়েব' বলে ধারণা করে। কিন্তু মনে রাখা দরকার-উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানুষ যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে তা' প্রকৃতপক্ষে 'গায়েব' নয়, যদিও ব্যাপকভাবে প্রকাশ না পাওয়ার দর"ন অনেকেই এগুলোকে 'গায়েব' বলে ভুল করে।

এসব বিষয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায়, কিন্তু জনসাধারণ এসব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। এরপর উপকরণ যখন শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন সবার দৃষ্টিতেই তা ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। মোটকথা, চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখেই এসব বিষয়ের অস্ড়িত্বের খবর দেয়া হয়। লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়ার পর আর সেগুলো অদৃশ্য থাকে না, বরং প্রত্যক্ষ বিষয়ে পরিণত হয়।

তবে সুক্ষ্ম হওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

উপর্যুক্ত উপায়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা অনুমানের অতিরিক্ত কিছু নয়। ইলম বলা হয় নিশ্চিত জ্ঞানকে, তা এগুলোর কোনটির মাধ্যমেই অর্জিত হয় না। তাই এসব খবর ভ্রান্ড় হওয়ার ঘটনাও অনেক।

গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা সম্পর্কে আকীদা

১. সিজদা কেবলমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য : তাজীম ও সম্মানের চরমরূপ হল ইবাদত। আর সিজদা হল মাবুদের প্রতি পরম ভক্তি ও সম্মানের সাথে বান্দার চরম বিনয় প্রকাশ। যেমন–

আল্লাহ বলেন:

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

'এবং তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে এবং ইহা উহাদিগের বিনয় বৃদ্ধি করে।' (আল ইসরা ১০৯)

তাই এ সিজদা কেবলমাত্র রাব্বুল আ'লামীনেরই প্রাপ্য। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ

'হে মুমীনগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর।' (সূরা হাজ্জ, ৭৭)

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا

'অতএব আল্লাহকে সিজদা কর এবং তাঁহার ইবাদত কর।' (সূরা নাজম, ৬২)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ

'আর যখন তাদের বলা হয় সিজদাবনত হও রাহমান-এর প্রতি।' (সূরা ফুরকান, ৬০)

وَاسْجُدِىْ وَ ارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

'সিজদা কর এবং যাঁহারা রুকূ করে তাঁহাদের সহিত রুকু কর।' (সূরা আল ইমরান, ৪৩)

وَ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

'আর যত সিজদা আছে সবগুলিই আল্লাহর হক। সুতরাং আল্লাহর সাথে আর কারো ইবাদত করো না।' (সূরা জিন, ১৮)

২. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা : সিজদা দুই প্রকার (১) ইবাদত সূচক সিজদা ও (২) সম্মান সূচক সিজদা। ইবাদত হিসেবে সিজদা করার মানে হচ্ছে কাউকে ইলাহ বা মা'বুদ মনে করে সিজদা করা। ইবাদতের উদ্দেশ্যে

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে, কোন পীর, ওলী, কবর, মাজার যাই হোক না কেন, সিজদা করা কুফর ও শিরক। এরূপ সিজদা কোন শরীয়ত এবং কোন ধর্মেই জায়েজ নেই, অতীতেও ছিল না। অবশ্য সম্মান সূচক সিজদা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে বৈধ ছিল। কিন্তু এরূপ সিজদাও শরীয়তে মুহাম্মদীতে হারাম করে দেয়া হয়েছে। আমাদের শরীয়তে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্যে ইবাদত সূচক বা সম্মান সূচক কোন সিজদাই জায়েজ নেই।

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

'তোমরা সূর্যকেও সিজদা করোনা আর চন্দ্রকেও নয়, বরং একমাত্র আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তারই ইবাদত করো।" (হা-মীম সিজদা, ৩৭)

৩. নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও সিজদা করা হারাম: হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে সিজদাকে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত করে একে কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য বলে অভিহিত করেছেন। সে কারণে তিনি এই সিজদাকে স্বয়ং নিজের জন্যেও হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযি:) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মুহাজিরগণের এক মাজমায় উপস্থিত ছিলেন। এ সময় এক উট এসে (আল্লাহর হুকুমে অলৌকিক ভাবে) তাঁকে সিজদা করে। এ অবস্থা দেখে সাহাবীগণ তাঁকে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে জন্তু-জানোয়ার এবং বৃক্ষলতা যেখানে সিজদা করছে, সেখানে আমরা তো আপনাকে সিজদা করার হকদার বেশী। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তোমাদের ভাইয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো। আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। কিন্তু মানুষের শোভা পায় না যে, সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করে। (আহমদ, মিশকাত)

কায়েস বিন সায়াদ (রা:) বলেন: আমি হীরা (কুফার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল) নগরে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম-তারা তাদের মোড়লকে সিজদা করে। আমি ভাবলাম-নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদার অধিক উপযোগী। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট

এলাম এবং বললাম, হুজুর আমি হীরায় গিয়ে দেখলাম, তারা তাদের মোড়লকে সিজদা করে। আমি মনে করি, আপনিই সিজদা পাওয়ার অধিক উপযোগী। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, যদি (আমার মৃত্যুর পর) আমার কবরের কাছে যাও তবে কি তুমি সেটাকে সিজদা করবে? আমি বললাম, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তাহলে তোমরা (আমার জীবিত কালেও) এটা করো না। মনে রেখো-যদি আমি কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে নারীদেরকে নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করতে, কেননা আল্লাহতা'আলা স্বামীদেরকে নারীদের উপর আধিপত্য দিয়েছেন। (আবু দাউদ)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সিজদা কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য। এ ক্ষেত্রে তার কেউ শরীকদার নেই; কোন পীর, ওলী, মাজার, কবরতো নয়ই, এমনকি দোজাহানের সর্দার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নন।

৪. বায়তুল্লাহকেও সিজদা করা কুফরী : সিজদা যেহেতু কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য এবং তিনি ছাড়া আর কারো জন্যে বৈধ নয়, সেহেতু কেউ যদি কেবল বায়তুল্লাহ শরীফকে সিজদা করে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

প্রসিদ্ধ দুররে মোখতার গ্রন্থে উল্লেখ আছে: "এমনকি যদি কেউ কেবল বায়তুল্লাহকে সিজদা করে, তবেও সে কাফির হবে।"

আল্লামা শামী (রহ:) ফতোওয়া শামীতে এ কথার ব্যাখ্যায় বলেছেন: "অর্থাৎ সিজদাকারীর উদ্দেশ্য যদি আল্লাহতা'আলা হন আর কাবা শরীফের দিকে তার মুখ থাকে, তবে ঠিক আছে। কিন্তু সে যদি কেবল কাবা শরীফকে সিজদা করে, তবে কাফির হয়ে যাবে।" (ফতোওয়ায়ে শামী, খন্ড-১ সালাত অধ্যায়)

৫. কবর সিজদা : ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামগণের মতে যেখানে বায়তুল্লাহ শরীফকেও সিজদা করা কুফরী এবং হাদীস মতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর শরীফকে, এমনকি তাঁর সত্তাকেও সিজদা করা নিষিদ্ধ, সেখানে অন্য কারো কবরকে সিজদা করার প্রশ্নই আসে না। এ জন্যে বুজুর্গ ব্যক্তিগণের কবরে সিজদা দেওয়া হারাম এবং কুফরী।

হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত হাদীস-তিনি বলেন যে, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তিম সময় উপস্থিত হল তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় চাদর আপন চেহারা মোবারকের উপর দিতে থাকলেন। যখন চাদরটি ঘর্মাক্ত হয়ে যেত তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেহারা মোবারক থেকে চাদর উন্মোচন করে দিতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ অবস্থায় বলতে লাগলেন– 'ইয়াহুদী এং খ্রীষ্টানদের উপর আল্লাহতায়ালার অভিশম্পাত অবতীর্ণ হোক কেননা তারা তাদের নবীগণের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কৃতকর্মের উপর ভয় প্রদর্শন করতে থাকলেন।

অত:পর হযরত আয়েশা (রা:) বলেন যে– যদি কবরের ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভয় প্রদর্শন না করতেন তাহলে হুজুরের কবর মোবারককে প্রকাশ্যভাবেই রাখা হত। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু এই ভয়ই করেছিলেন যে, মানুষ তাঁর কবরকে সিজদার স্থান হিসেবে গ্রহণ করবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন যে, তোমরা শুনে রাখ যে, তোমাদের পূর্ববর্তী লোক সকল তাদের নবীগণের কবরগুলিকে মসজিদ বানিয়েছে অর্থাৎ সিজদার স্থান হিসেবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং তোমরা সতর্ক হও; তোমরা কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করোনা। আমি খুবই গুরুত্ব সহকারে তোমাদেরকে উক্ত কাজ থেকে নিষেধ করছি।

৬. সামান্য মাথা ঝুঁকানোরও অনুমতি নেই : ইসলামী শরীয়ত গায়রুল্লাহ'র জন্যে রুকু ও সিজদা তো বহু পরের কথা, কারো সামনে সামান্য মাথা ঝুকানোর অনুমতিও দেয় না। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ফিকাহ শাস্ত্রবিদগন একে আগুন পূজারীদের খাছিয়ত বলে অভিহিত করেছেন। ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে: "বাদশাহ কিংবা অন্য কারো জন্যে ঝুকা মাকরূহ। কেননা, এটি আগুন পূজারীদের সাথে মিল রাখে।" (দুররে মুখতার)

'জাওয়াহিরুল আখিরাত' গ্রন্থেও বর্ণিত আছে যে, বাদশাহ প্রভৃতির জন্যে ঝুঁকা মাকরূহ। কারণ এটি আগুন পূজারীদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। আর 'মারতাশী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মোলাকাত বা করমর্দন কালে ঝুঁকাও মাকরূহ এবং এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।" (ফতোয়ায়ে আলমগীরি, খন্ড-৪ মাকরূহ অধ্যায়)

আল মুহীত গ্রন্থে লিখা আছে যে, বাদশাহ প্রভৃতির জন্যে ঝুঁকা মাকরূহ। (ফাতাওয়ায়ে শামী, খন্ড-৫ পৃঃ ২৫৫)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এসব ক্ষেত্রে মাকরূহ বলতে মাকরূহ তাহরীমি বুঝাচ্ছে যা হারামের কাছাকাছি। শুধু তাই নয়, 'শামী' কিতাবের হিজবর ও ইবাহাত অধ্যায়ে একদল উলামায়ে কেরামের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে–

وَ التَّوَاضُعُ عِنْدَ الْعَظْمَاءِ وَ الْحُكَمَاءِ شِرْكٌ

মর্যাদাবান বুজুর্গ লোক ও হাকীম-হুকামাদের সামনে মাথা হেট করে

তাদেরকে সম্মান দেখালে শিরক হবে।

সহৃদয় পাঠকবৃন্দ, চিন্ত্মা করার ব্যাপার যে, ইসলামী শরীয়ত কোন জিন্দা মানুষের সামনে যেখানে ঝুঁকতেও নিষেধ করে, সেখানে মৃত লোকের কবরে সিজদা বা সেদিকে ঝুঁকার জন্যে অনুমতি দেয় কিরূপে?

৭. সালামে ঝুঁকাও হারাম : শরীয়তে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষের সামনে মানুষের মাথা নত করাকে এতই শক্তভাবে বারণ করেছে যে, সালাম দেয়ার সময় যদি অধিক ঝুঁকে পড়ে, তবে তাও হারাম। আল্লামা শামী (রহ:) লিখেছেন : 'আল জাহেদী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সালাম দেওয়া কালে রম্নকুর কাছাকাছি ঝুঁকে পড়া (গায়রম্নল্লাহর উদ্দেশ্যে) সিজদার মতই হারাম'। (ফাতাওয়ায়ে শামী-কিতাবুল খতর)

৮. কদমবুসি সম্পর্কে আকীদা : হিন্দুয়ানী কুসংস্কারের অনুসরণে মাথা হেট করে বা ঝুঁকিয়ে কদমবুসি করা হারাম। আর মাথা না ঝুঁকালেও তা বিদ'আত হবে। ভারতের হিন্দুরা মানুষকে সিজদা, গড় বা প্রণাম করতে অভ্যস্ত ছিল। ইসলামের পরে ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও পীর, মুরুব্বি বা রাজা-বাদশাহকে সিজদা করা, তাদের পায়ে মুখ দিয়ে চুমু খাওয়া বা পায়ে হাত দিয়ে হাতে চুমু খাওয়া বা তাদের সামনে মাটিতে চুমু খাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। এই রীতি নিঃসন্দেহে ইসলাম বিরোধী। আর সবচেয়ে দুঃখজনক হল একে হাদীস বলে চালানো। জমিন-বুসিতো দূরের কথা, কদম-বুসির রীতিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল না। তাঁদের সুন্নাত ছিল সালাম প্রদান, মুসাফাহা করা (হাত মিলানো)। দু'একটি ক্ষেত্রে হাতে বা কপালে চুমু খেয়েছেন বা কোলাকুলি করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ২৩ বছরের নবুয়তী জিন্দেগীতে লক্ষ মানুষের অগণিতবার আগমনের ঘটনার মধ্যে মাত্র ৪/৫টি যয়ীফ সনদে বর্ণিত ঘটনায় তাঁর পায়ে চুমু খাওয়ার বিষয়টি এসেছে। এসব ঘটনায় কোন সুপরিচিত সাহাবী তাঁর পদচুম্বন করেন নি, করেছেন নতুন ইসলাম গ্রহণ করতে আসা বেদুঈন বা ইহুদি, যারা দরবারে থাকেনি বা দরবারের আদব জানতো না। হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, ফাতেমা, বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন ও তাঁদের মত প্রথম কাতারের শত শত সাহাবী প্রত্যেকে ২৩ বছরে হাজার বার তাঁর দরবারে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু কেউ কখনও একবারও তাঁর কদমে চুমু খাননি, বা সেখানে হাত রেখে সেই হাতে চুমু খাননি, তাঁর সামনে মাটিতে চুমু খাওয়াতো অনেক দূরের কথা।

কারো সামনে মূর্তিবৎ হাতজোড় করে

দাঁড়ানো সম্পর্কে আকীদা

১. আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক চায় যে, মানুষ তার সম্মানে দাঁড়িয়েযাক সে যেন তার ঠিকানা আগুনে করে নেয়। (আহমদ, সহীহ)

যে এ বিষয়ে আনন্দিত হয় যে, মানুষ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে ঠিক করে রাখে। (মিশকাত) আনাস (রা:) বলেছেন : সাহাবীদের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন ব্যক্তি বেশী প্রিয় ছিলেন না, তথাপি তারা তাঁকে দেখলে দাঁড়াতেন না। কারণ, তারা জানতেন যে, তিনি এটা পছন্দ করেন না। (তিরমিযী,সহীহ)

২. সাহাবায়ে কিরাম (রা:) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। এতদসত্ত্বেও, যখন তাঁকে তাদের সামনে আসতে দেখতেন, তখন তারা দাঁড়াতেন না। কারণ, ঐ দাঁড়ানোকে তিনি খুব অপছন্দ করতেন।

৩. পীর, উস্ত্মাদ, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, শিক্ষক প্রমুখের আগমন উপলক্ষে সম্মানার্থে দাঁড়ানো আজ একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে। অনেকে ভাবে, যদি আমরা না দাঁড়াই তাহলে আগমনকারী মনে ব্যথা পাবেন। তাদের এই বলে বুঝানো দরকার যে, দাঁড়ানটাই সুন্নতের বিপরীত; সালাম করা ও হাত মিলানোই সুন্নত।

৪. যে ধরনের দাঁড়ান শরীয়ত সম্মত এবং পছন্দনীয় : অনেক সহীহ্ হাদীসে আছে এবং সাহাবীদের আমল দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, আগমনকারীর অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়ান জায়েজ। আসুন আমরা ঐ হাদীস সমূহ বুঝতে চেষ্টা করি এবং 'আমল করারও চেষ্টা করি।

৪.১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আদরের মেয়ে ফাতিমার (রা:) জন্য দাঁড়াতেন যখন তিনি তার পিতার খিদমতে আসতেন এবং যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে যেতেন তখন তিনিও উঠে দাঁড়াতেন। এটা জায়েজ এবং দরকারী; অতিথির সাথে সাক্ষাত ও তার সম্মানের জন্য। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে আল্লাহ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস করে, সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে। (বুখারী ও মুসলিম)

৪.২. অন্য হাদীসে আছে : 'তোমাদের সর্দারের জন্য দাঁড়াও'। (বুখারী ও মুসলিম) অন্য রিওয়ায়াতে আছে, 'এবং তাকে নামাও'।

এই হাদীস বর্ণনার কারণ হলঃ সাদ (রা:) আহত ছিলেন। তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদের ব্যাপারে বিচার করার জন্য

বলেছিলেন। তিনি গাধার উপর ছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের বললেন: তোমরা তোমাদের সর্দারের জন্য উঠ এবং তাকে নামাও। ফলে, তারা দাঁড়ালেন এবং তাকে নামালেন। এটা প্রয়োজন ছিল আনসারদের সর্দার সা'দকে (রা:) সাহায্য করার জন্য, কেননা তিনি ছিলেন আহত। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিন্তু উঠেননি এবং অন্য সাহাবীরাও দাঁড়াননি।

৪.৩. সাহাবী কা'ব ইবনে মালেক (রা:) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, যখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন সাহাবীরা বসা ছিলেন। তখন তাকে তার তাওবা কবুল হওয়া সম্পর্কে তাড়াতাড়ি সুসংবাদ দিতে একমাত্র তালহা (রা:) উঠে গেলেন। তবুক যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে এটা ঘটেছিল। এটা জায়েজ। কারণ, এতে বিমর্ষ ব্যক্তিকে খুশী করার চেষ্টা ছিল এবং তার তাওবা যে কবুল হচ্ছে তার সুসংবাদ জানাবার জন্য।

৫. হাত জোড় করে মুর্তিবৎ বসে থাকা : আলেম পীর ওলীর সম্মানে দু'হাত জোড় করে নামাজের আত্তাহিয়্যাতুর ছুরতে মূর্তিবৎ বসে থাকা উচিত নয়। বরং হাত ছেড়ে দিয়ে মজলিসের আদব বজায় রেখে স্বাভাবিকভাবে বসা দরকার।

কবর ও মাজার সম্পর্কে আকীদা

১. নবীজীর আশঙ্কা ও দু'আ : আল্লামা আলূছী (রহ:) তৎকৃত তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে লিখেছেন- তৎকালীন ইহুদী-নাছারাগণ, তাদের নবী ও ওলীগণের কবরগুলোকে সিজদা করত ও কবরবাসীদের নিকট সাহায্য চাইত। এসব দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুঃশ্চিন্তা হয়েছিল, মুসলমানরা তাঁর কবর সিজদা করে নাকি! তাই তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেন– 'হে আল্লাহ! আমার কবরকে পূজার মূর্তি বানাবেন না। সেসব লোকের ওপর আল্লাহতা'আলার গযব বড়ই কঠোর হয়েছিল, যারা তাদের নবী ও অলীগণের কবরগুলোকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছিল।'

২. নবীজী উঁচু কবরগুলোকে ভেঙ্গে সমান করে দেন : কবরবাসী নবী ও অলীগণের কবরগুলোকে সিজদা করা ও তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার মত শিরক ও কুফরী-কার্যকলাপ চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব কবরগুলোকে ভেঙ্গে সমান করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ সম্পর্কে সহীহ মুসলিম ও সুনানে তিরমিযী কিতাবে বেশ কয়েকটি

হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আলী (রা:) তাঁর খিলাফত আমলে সিজদা ও প্রার্থনা তথা শিরকের আড্ডায় পরিণত কবরগুলোকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য পাঠানো অভিযানের নেতৃত্ব দিয়ে আবুল হায়্যাজ আসাদীকে বলেছিলেন– আমি তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছি, যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন। শোন, যে কোন উঁচু কবর পাবে, তাকে জমিনের সমান করে দেবে। আর যত মূর্তি পাবে ভেঙ্গে দেবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবী হযরত জাবির (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ يَّجْصِصَ الْقَبْرَ وَ اَنْ يَّقْعُدَ عَلَيْهِ وَ اَنْ يَبْنٰى عَلَيْهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর পাকা করতে, কবরের ওপর বসতে ও কবরের ওপর ছাদ করতে নিষেধ করে গেছেন।

সহীহ মুসলিম শরীফেই হযরত ছুমামা ইবনে শুফাঈ (রা:) হতে বর্ণিত হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে; তিনি বলেন যে, আমরা হযরত ফুজালা ইবনে উবাইদ (রা:) এর সাথে রোম সাম্রাজ্যের রোডস নামক স্থানে অবস্থানরত ছিলাম। তথায় আমাদের এক সাথি ইন্তেকাল করার পর হযরত ফুজালা (রা:) আমাদের সাথির কবরকে সমতল করে দেয়ার জন্য আদেশ করলেন। অত:পর হযরত ফুজালা (রা:) বর্ণনা করেন যে, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তিনি কবরকে সমতল করে দেয়ার জন্য হুকুম করেছেন।

৩. কবরের উপর প্রাসাদ ও মাজার নির্মাণ : কবরের উপর প্রাসাদ ও মাজার নির্মাণের বিরুদ্ধে ইসলামে এত অধিক সাক্ষ্য-প্রমাণ বর্তমান রয়েছে যে, আমাদের সতর্ক করার জন্য তা যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা বুজুর্গ লোকদের কবরের ওপর মসজিদ ও মাজার নির্মাণ করতে লাগল। মাজার নির্মাণে তারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হল। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, এখন কাল্পনিক মাজার নির্মিত হচ্ছে। এমন কত মাজার রয়েছে যা গাছ পাথর ও জীব-জন্তুর লাশের ওপর নির্মাণ করা হয়েছে।

কবর থাক আর না থাক কোন রকমে মাটি উঁচু করে, লালসালু কাপড় বিছিয়ে, সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে, আগরবাতি-মোমবাতি জ্বালিয়ে একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে 'অমুক শাহ তমুক শাহ' একটা আলীশান নাম হাঁকিয়ে বসতে পারলেই হল-চারদিক থেকে লোকজন আসা শুরু হয়ে যায়। বিপদ থেকে

উদ্ধার, রোগমুক্তি, মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য মানুষ মাজারে নযর-নিয়ায, মানত-হাদীয়ার টাকা দিতে থাকে, মাজারকে উদ্দেশ্য করে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে। দেখতে দেখতে পাকা গম্বুজওয়ালা বিশাল মাজার তৈরি হয়। মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি পায়। লোক সমাগম বাড়তে থাকে। এভাবে মাজারটি শিরকের আড্ডাখানা আর পূজার মন্দিরে পরিণত হয়।

৪. কবর মাজার কেন্দ্রিক শিরক-কুফর : আজ আল্লাহর ওলীগণের পাকা ছাদ করা আলীশান কবরগুলোকে কেন্দ্র করে যেসব কুফরী ও শিরকী কার্যকলাপ চলছে, সরলপ্রাণ মুসলমানেরা আল্লাহপাককে ছেড়ে যেভাবে গায়রুল্লাহর দিকে ঝুঁকছে, গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে, গায়রুল্লাহর নামে নযর-মানত করে, সিজদা করে যেভাবে ঈমানহারা হচ্ছে তা দেখলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে, কেন নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর পাকা করতে ও কবরের ওপর ছাদ করতে নিষেধ করেছিলেন; আর কেনইবা পূর্ববর্তী ওলীগণের করবগুলোকে ভেঙ্গে সমান করে দেয়ার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

আউলিয়া কেরামের কবরের উপর যেসব মাজার নির্মিত হয়েছে সে ব্যাপারে তাদের কোনই হাত নেই। এসব করেছে পরবর্তীকালের লোকেরা। তাদের অনেকে হয়তো ইসলামের শানশওকত প্রদর্শন, ছায়ায় বসে জিয়ারত করার সুবিধা ইত্যাদি বহুবিধ নেক নিয়তে এমন করে থাকবেন। কিন্তু তারা হয়তো ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারেন নি যে, মাজার নির্মাণের ফলে এগুলো এক একটি পূজা মণ্ডপে পরিণত হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মাজার নির্মাণ সংক্রান্ত কোন হাদীস যদি বর্ণিত নাও হত, তথাপি মাজারগুলোতে যেসব ঈমান বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড চলছে তাই মাজার নির্মাণ নিষিদ্ধ হবার জন্য যথেষ্ট। যে কাজ করলে শিরকের প্রচলন বাড়বে সে কাজ করা একজন মুসলমানের জন্যে কখনো উচিত নয়।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস-হযরত খাজা মাঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ), বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এবং অন্যান্য হাক্কানী ওলীরা যদি জেন্দা হয়ে দেখতেন যে, তাদের মাজারে হাজারো শিরকী কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তবে তখনই নিজ হাতে এসব মাজার গুড়িয়ে দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতেন। আজীবন তাওহীদের পতাকাকে বুলন্দকারী এসব ওলীরা তাওহীদ বিরোধী এসব মাজারকেন্দ্রীক শিরক কখনই সমর্থন করতেন না।

৫. কবর বা মাজারকে স্পর্শ করা, মাসেহ করা বা চুমু খাওয়া উচিত নয় : কোন পীরের কবর বা মাজারের ইট বা পাথরকে ভক্তিসহকারে নেক আশা পূরণের নিয়তে চুম্বন করা জায়েজ নয়। আজ সারাদেশের সকল মাজারেই এই নাজায়েজ কাজটি হরদম চলছে। অনেক জায়গায় আবার মাজারের গায়ে বা গেলাফে হাত ছোঁয়ায়ে সেই হাত মুখে, কপালে, মাথায় মোছা হয়, অনেক স্থানে মাজারের বা

কবরের মাটি বরকতের নিয়তে নিয়ে তাবীজে ভরে গলায় বাঁধে, অনেকে গায়ে মালিশ করে। এগুলো সবই নাজায়েজ, হারাম।

কবরের ফিৎনা থেকে মানুষকে বাঁচানোর লক্ষ্যে তাজীম ও ভক্তিসহকারে কবরকে বা কবরের দেওয়ালকে স্পর্শ করতেও নিষেধ করা হয়েছে।

ফতোয়া আলমগীরিতে উল্লেখ আছেঃ "কবরে হাত লাগাবে না এবং চুমুও খাবে না। কেননা এটি খ্রিস্টানদের রীতি! আল্লামা মুনাদি (রহঃ) 'শরহে জামে উস সগীর' গ্রন্থে লিখেছেন: কবরকে স্পর্শ করবে না এবং চুমু খাবে না। কারণ, এটি খ্রীষ্টানদের অভ্যাস। 'মুজমিরাত' কিতাবে লেখা আছেঃ 'আর তুমি কবরকে চুমু খাবে না। কেননা এটি খ্রিস্টানদের রীতি।' 'ফতোওয়া তাতার খানিয়ায়' উল্লেখ আছেঃ "কবরে চুমু দেবে না। কেননা এটি খ্রিস্টানদের অভ্যাস।' (ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, খন্ড-৪, জিয়ারতে কবর অধ্যায়)

সুবিখ্যাত 'আল হিদায়া' কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল বিনায়াহ' কিতাবে উল্লেখ আছে: "খোরাসানের অভিজ্ঞ ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের অভিমত হল, কবরকে মাসেহ করা, চুমু খাওয়া এবং স্পর্শ করা যাবে না। কেননা এটি খ্রীষ্টানদের অভ্যাস।" (আদ্দুররুল ফরীদ, পৃ. ১২৩)

● **শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী লিখেছেন :** "কবর জিয়ারতের আদব হল, মাইয়্যেতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সালাম দিবে। কিন্তু কবরকে স্পর্শ করবে না, চুমুও খাবে না, কবরের দিকে ঝুঁকবেও না এবং মাটির উপর কপাল ঘষবে না। কেননা এটি খ্রীষ্টানদের রীতি।" (আশিআতুল্লমুআত খণ্ড-১, পৃঃ৪৪)

● **হযরত আব্দুল কাদের জ্বিলানী (রহঃ) বলেছেন :** "যদি কেউ কোন কবর জিয়ারত করে, তবে কবরের উপর হাত রাখবে না এবং কবরকে চুমু খাবে না। কেননা এটি ইহুদীদের অভ্যাস।" (গুনিয়াতুত তালেবীন, খণ্ড-১, পৃঃ ৪৪)

● **হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) লিখেছেন :** "এবং কবরকে মাসেহ করবে না, চুমুও খাবে না, এমনকি স্পর্শও করবে না। কারণ, এগুলো হল খ্রিস্টানদের অভ্যাস।" (ইহ ইয়াউল উলুম, জিয়ারতে কবর অধ্যায়)

হাদীস শাস্ত্রের মহান ইমাম এবং শ্রদ্ধেয় বুজুর্গানে কেরামের উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে একথা স্পষ্ট হয় যে, কবরকে চুমু খাওয়া, এমনকি ভক্তির সাথে মাসেহ ও স্পর্শ করারও কোন অবকাশ ইসলাম ধর্মে নেই; বরং এগুলো হল ইহুদী খ্রীষ্টানদের অভ্যাস ও রীতি-নীতি।

৬. রাওজাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেয়ালে মসেহ করা, চুমু খাওয়া উচিত নয় : কোন বুজুর্গ, ওলী বা নবীর কবরগুলোতে কিভাবে উপরোক্ত কুসংস্কার জায়েজ হতে পারে, যেখানে স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রাওজা মুবারকের জন্যেও এগুলো নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ও ইমামগণের কতিপয় অভিমত পেশ করা হল :

• **ইমামুল হাদীস হযরত মোল্লা আলী আল কারী (রহঃ) লিখেছেন :** "কবর জিয়ারতকালে না কবরে, না তাবুতে আর না দেওয়ালে হাত লাগাবে। যেখানে এ সমস্ড় কাজ স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজা শরীফের জন্য নিষিদ্ধ, সেখানে অপরাপর লোকদের জন্যে তা কিভাবে জায়েজ হতে পারে? অনুরূপ, কবরে চুমু খাবে না। কেননা এটি হাত লাগানোর চাইতেও মারাত্মক। বস্তুত চুমু খাওয়াটা কাবা শরীফের হাজরে আসওয়াদ এবং নবী, আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গের হাতের সাথেই খাছ।" (শরহে আইনির এলম অধ্যায়)

• **ফতোওয়া আলমগীরিতে উল্লেখ আছে :** "জিয়ারতকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজা শরীফে তাঁর পবিত্র শিথানের কাছে এসে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং রওজা শরীফের ৩/৪ হাত দূরে অবস্থান করবে, এর চেয়ে কাছে আসবে না। আর দেওয়ালে হাত রাখবে না। এতে তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা বেশি প্রকাশ পায়।" (কিতাবুল মানাছিক)

• **সুবিখ্যাত 'ওয়াফাউল ওয়াফা' গ্রন্থকার জিয়ারতের আদব সম্পর্কে লিখেছেন :** "জিয়ারতের আদব হল দেওয়াল স্পর্শ করা, চুমু খাওয়া, তাওয়াফ করা এবং সেদিকে নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকা। আল্লামা নববী (রহ:) বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রাওজা মুবারকের তাওয়াফ করা জায়েজ নয় এবং রাওজা শরীফের দেওয়ালের সাথে পেট বা পিঠ রাখা মাকরূহ। আরও বলা আছে যে, কবর শরীফের দেওয়াল ভক্তি ভরে স্পর্শ করা, চুমু খাওয়া মাকরূহ। বরং আদব হল একটু দূরে থাকা, যেমন তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম কিছু দূরে থাকতেন। এটিই ওলামায়ে কেরামের বিশুদ্ধ মত। পক্ষান্ড়রে হাতে দেওয়াল স্পর্শ করা ইত্যাদির মধ্যে বরকত আছে মনে করা মূর্খতা। বস্তুত শরীয়তের আনুগত্য এবং ইমাম আলেমগণের অনুসরণের মধ্যেই বরকত নিহিত। বর্ণিত আছে যে, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা:) এক ব্যক্তিকে রাওজা মুবারকের উপর হাত রাখতে দেখলেন। তিনি তাকে নিষেধ করলেন। অত:পর বললেন,হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে এ কাজকে ভাল মনে করা হত না। এছাড়া ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদও এই আমলকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন।"

৭. রওজা শরীফ, মাজার বা কবর ইত্যাদির ছবি বরকতের জন্যে রাখা, চুমু খাওয়া, তাজীম করা : বিপদ আপদ বালা মুছিবত থেকে বাঁচার

জন্যে ঘরবাড়িতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকতের জন্যে দোকান, অফিস, হোটেল, রেস্ড়োরাঁয় বিভিন্ন পীরওলীদের মাজারের ছবি, কাবা বা রওজাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছবি টাঙ্গিয়ে রাখতে দেখা যায়। এসব ছবির সামনে আদবের সাথে দাঁড়ানো হয়, চুমু খাওয়া হয়, এমনকি অনেকে এগুলো স্পর্শ করে হাত গায়ে-মাথায় কপালে বুলিয়ে দেয়। এসব কাজ সম্পূর্ণরূপে নাজায়েজ। আর বরকত, বিপদমুক্তি, ব্যবসায় উন্নতি এসব নিয়তে যে কোন ধরনের ছবি রাখা, চাই তা' কাবা শরীফ বা নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রাওজা শরীফের ছবিই হোক না কেন, জায়েজ নয়। তবে ঐসব নিয়ত ছাড়া কেউ যদি শুধু মাত্র ঘরের সৌন্দর্য বর্ধন বা ইসলামী ঐতিহ্যের নমুনা স্মারক হিসেবে কাবা শরীফ বা রাওজা শরীফের ছবি রাখতে চায়, তবে শরীয়তে তার অনুমোদন রয়েছে।

৮. হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেওয়া প্রসঙ্গে : কাবা শরীফের পূর্ব কোণে হাজারে আসওয়াদ অবস্থিত। এই পাথর বহু মূল্যবান বরকতময়। এটি একটি বেহেশতী পাথর। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ঐ পাথরটিকে চুমু দিয়েছেন। এতে চুমু দেওয়ার ফজীলত অনেক বেশি।

মূলত এই পাথরকে চুমু দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করা। এই চুমু খাওয়া সুন্নত। ইসলামের বড় কোন খুঁটি নয়। তাই যারা হাজরে আসওয়াদের চুমুকে মূর্তি পূজার সাথে তুলনা করে তারা বিরাট ভুল করে। কেননা, মূর্তি পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেবতার সন্তুষ্টি অর্জন করার মাধ্যমে বিশেষ কোন লক্ষ্য হাসিল করা। দেবতার পূজায় সিজদাসহ আরো বহু অযৌক্তিক আচরণ প্রদর্শন করতে হয়। হাজরে আসওয়াদ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানরা এর পূজা করে না এবং এর কাছ থেকে দুনিয়ায় উপকার অপকার পাওয়ারও আশা করে না। মূর্তি পূজার মূল্য লক্ষ্য তাই। মুসলমানরা পাথরটিকে উপাস্য মনে করে এর পূজা করে না। পরকালের কিছু কল্যাণ লাভের জন্য নবীর অনুসরণে মুসলমানরা এতে চুমু খায়।

হযরত উমর (রা:) হাজরে আসওয়াদকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন: "আমি জানি তুমি একখানা পাথর, তোমার উপকার ও ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা নেই। যদি আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমার গায়ে চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনও তোমাকে চুমু দিতাম না।"

হযরত উমরের উপরোক্ত মন্ড়ব্যের মাধ্যমেই একথা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে এটিই হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানের অনুভূতির বহি:প্রকাশ। হাজরে আসওয়াদের সম্মান এক জিনিস আর এর পূজা ভিন্ন জিনিস।

আল্ফাকেহী উল্লেখ করেছেন যে, হযরত উমরের প্রখ্যাত বক্তব্যের মত হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:)ও বলেছিলেন: 'আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর। তুমি কারো উপকার ও অপকার করতে পার না। আমি যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমাকে চুমু দিতে না দেখতাম, তাহলে আমিও তোমাকে চুমু দিতাম না।'

৯. মাজারে ফুল অর্পণ, গিলাফ চড়ানো ও বাতি জ্বালানো : মাজারে ফুল দেয়া, গিলাফ চড়ানো ও বাতি জ্বালানো নাজায়েজ। একদল লোক মাজারে ফুল অর্পণ, গিলাফ চড়ানো ও বাতি জ্বালানোকে জায়েজ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের যুক্তিগুলো সম্পূর্ণ ভ্রান্ড় এবং কুরআন-হাদীসের পরিপন্থী।

সারা দেশের মাজারগুলোতে প্রতি বছর যে পরিমাণ ফুল দেয়া হয়, মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালানো হয় আর যত কারুকার্য খচিত গিলাফ চড়ানো হয়, তার মূল্য কম করে হলেও শত কোটি টাকা হবে। যে লোকটা মরে গেছে, তার কবরে বা মাজারে ফুল দিয়ে কি লাভ হবে, সে কি ফুলের ঘ্রাণ নিবে? তার কি শীত লাগছে যে, কাপড় গায়ে দিতে হবে? সে কি কবর থেকে উঠে এসে কোন কাজ করবে যে তার জন্য বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হবে। এগুলো সবই ফালতু অপচয়। এসবকাজে পয়সা খরচ না করে যদি ঐ মাজারে শায়িত লোকটির নামে একটা লিল্লাহ ফান্ড গঠন করে তা থেকে এতিমখানা তৈরি, গরিব মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করা, মুসাফিরখানা স্থাপন ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা হয়, তবে এক সাথে দুটি উপকার হবে। প্রথমত: গরিব-দুঃখী, এতিম-বিধবাদের সাহায্য সহযোগিতাসহ দ্বীনের কিছু খেদমত হবে। দ্বিতীয়ত: ঐ মাজারে শায়িত বুজুর্গও এসবের ছওয়াব পেতে থাকবেন। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব মাজারে ফুল দেয়া, গিলাফ চড়ানো, বাতি জ্বালানো ইত্যাদি বদ রোছমগুলো তুলে দেয়া অপরিহার্য।

১০. কবরে আযান দেয়া : মুসলমানের লাশ কবরে দাফন করার পর আযান দেয়াকে কিছু সংখ্যক লোক জায়েজ ও মহাপুন্যময় বলে প্রচার করছে। কিন্তু তাদের এ আকীদা বাতিল। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের হক্কানী আলেমদের মতে কবরে আযান দেয়া নাজায়েজ।

১১. কবরে পীরের শাজরা, জামা,পাগড়ী বা অন্য বস্তু রাখা : অনেকের ধারণা-নিজের আমল যাই হোক না কেন, কুরআন-হাদীস মত চলুক আর না চলুক-মৃত্যুর পর কবরে যদি পীরের শাজরা, জামা, পাগড়ী, টুপি বা অন্য কোন পবিত্র বস্তু তার মৃতদেহের সাথে রাখা হয়, তবে সে নাজাত পেয়ে যাবে। এরূপ ধারণা ঠিক নয়। কবর এমন একটি জায়গা যেখানে কারো সাথে কোন খাতির

করা হয় না। স্বয়ং হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা মা ফাতেমা (রা:) কে বলেছিলেন, 'ফাতেমা! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কন্যা বলে তুমি নাজাতের আশা করো না। যদি মুক্তি পেতে চাও, তাহলে আমল কর।' চিন্ড়া করে দেখুন, যেখানে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নয়নের মণি কন্যাকেই খাতির করা হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে পীরের মুরীদ হয়ে আমল না করে বসে থাকলে আর পীরের জামা, শাজরা নিয়ে কবরে গেলে কিভাবে নাজাত পাওয়া যাবে?

১২. কবর ধোয়া পানি : অনেক জায়গায় পীরের কবর বা মাজারকে মাঝে মাঝে মহা ধুমধামের সাথে গোসল করানো হয়। কবর ধোয়া পানি লোকেরা শিশিতে ভরে নিয়ে যায় এবং নেক মকছুদ পূরনের নিয়তে পান করে। এভাবে কবরকে গোসল করানো ও সেই পানি পান করা নাজায়েজ।

১৩. কবরকে সামনে রেখে নামাজ : অনেককে দেখা যায়– কবরকে বা মাজারকে সামনে রেখে নামাজ পড়ে এবং এভাবে পড়াকে অত্যন্ড় ফজীলতপূর্ণ মনে করে। এভাবে নামাজ পড়া জায়েজ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা কখনো কবরের উপর বসো না এবং এর দিকে মুখ করে সালাত আদায় কর না। (মুসলিম শরীফ)

১৪. কবর তাওয়াফ : অনেকে ওলী আল্লাহগণের কবরের চারদিকে ঘোরাকে অর্থাৎ তাওয়াফ করাকে পূণ্যময় কাজ বলে মনে করে। কিন্তু এরূপ তাওয়াফ জায়েজ নয়। তাওয়াফ শুধুমাত্র কাবা শরীফের জন্য খাছ। কাবা শরীফ ছাড়া অন্য কোন মসজিদ বা পূণ্যময় স্থানকে তাওয়াফ করা জায়েজ নয়। কারণ, তাওয়াফ হচ্ছে ইবাদত, যা কাবার চারপার্শ্ব ছাড়া অন্যত্র করা জায়েজ নেই। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন : وَ لْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ

অর্থাৎ, তারা যেন বেশি বেশি আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করে। (সূরা হাজ্জ: ২৯)

আম্বিয়া বা আউলিয়া কেরামের কবরের চতুস্পার্শ্বে তাওয়াফ করা হারাম। হযরত মোল্লা আলী কারী (রহ:) 'মানাছেকে হজ্জে' লিখেছেন–'জান্নাতুল বাকীর চতুস্পার্শ্বে তাওয়াফ করা নিষেধ। কারণ তাওয়াফ একমাত্র কাবা শরীফের জন্যই নির্দিষ্ট।'

১৫. কবরে মশারী : অনেক মাজারে দেখা যায়–কবরের উপর মশারী টানিয়ে রেখেছে। কবরস্থ ব্যক্তিকে 'মশার আক্রমন থেকে রক্ষা করার'(?) জন্যেই মনে হয় এ ব্যবস্থা! কবরের উপর এরূপ মশারী টানিয়ে রাখা জায়েজ নয়।

১৬. কবর বা মাজারের গেলাফের তাজীম : বিভিন্ন পীর, ওলী, বুজুর্গানে দ্বীনের মাজারে বা কবরের উপর আজকাল গেলাফ চড়ানো হয়। নির্দিষ্ট সময় পর পর এই গেলাফ পরিবর্তন করে আবার নতুন গেলাফ পরানো হয়। পুরনো গেলাফ অতি যত্নসহকারে সংরক্ষণ করা হয়। অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষ এসব গেলাফে চুমু খায়, গেলাফ ধরে ফরিয়াদ করে, হাত দিয়ে মাসেহ করে, লাইন ধরে তাওয়াফ ও জিয়ারত করে, আদবের সাথে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাবীজে ভরে গলায় বাঁধে। অনেকেতো আবার একধাপ এগিয়ে গেলাফের কাছেই দু'আ চেয়ে বসে। মাজারের গেলাফ নিয়ে এসব কর্মকান্ড সম্পূর্ণ নাজায়েজ, হারাম, কোন কোনটাতো শিরকের পর্যায়ভুক্ত। একেতো গেলাফ নিছক একটা কাপড় ছাড়া আর কিছুই নয়, অধিকন্তু মাজারে এরূপ গেলাফ চড়ানো সম্পূর্ণ বিদআত, অপচয় ও অর্থহীন। যে কোন কাপড় কোন অবস্থাতেই এত বরকতময় হতে পারে না যে, তাকে ছুঁতে হবে, চুমু দিতে হবে। এমনকি সেই কাপড় যদি কাবা শরীফের গেলাফও হয় তবু তার প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শন করা যাবে না। ফিকাহবিদগণ তো কাবা শরীফের গেলাফ দ্বারা পোশাক প্রস্তুত করাও জায়েজ রেখেছেন, অবশ্য এই শর্তে যে, তাতে কালেমায়ে তাইয়্যেবা, কুরআনের আয়াত অথবা আল্লাহপাকের পবিত্র নাম লিখিত না থাকা চাই।

১৭. মাজারে টাকা দেয়া : অনেককে দেখা যায়-মাজারে গেলে মাজারের গিলাফের উপরে টাকা দেয়। কেন ভাই, আপনি মাজারে টাকা দেবেন কেন? ও ব্যাচারাতো মরে গেছে, উনি কি ঐ টাকা খেতে পারবেন নাকি? মাজারে যাওয়ার সময় বাতাসা, মোমবাতি, মোরগ, মুরগী, কলসী ইত্যাদি নিয়ে যাবেন কেন? ইসলামী শরীয়তে এসব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

১৮. ওলী না হাইজ্যাকার : কোন বিপদে পড়লেই অনেকে মাজারে গিয়ে টাকা দেয়। অনেক ভদ্রলোক রাস্তায় মাজার দেখলেই গাড়ি থামিয়ে সালাম ঠুকে, তারপর মাজারে কিছু টাকা দিয়ে মাজারের ধুলো গায়ে মেখে পুনরায় গাড়িতে ওঠে। ভাবখানা এমন যে, এ পথ দিয়ে যাবার সময় মাজার লক্ষ্য করে সালাম না ঠুকলে আর টাকা না দিলে মাজারে শায়িত ওলী আল্লাহ মনে হয় তার গাড়িটাই উল্টিয়ে দেবেন! তাই ভয়ে ভয়ে আগেই সালাম ঠুকে টাকাটা শোধ করে দেয়। এটাতো হাইজ্যাকারের কাজ, পীর সাহেবের কাজতো এমন হতে পারে না।

১৯. শয়তানের এমবেসী : 'এমবেসী' বা দূতাবাস একটা দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, নিজের দেশের ভাবমূর্তিকে বিদেশে যথাযথভাবে তুলে ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে। নিজ দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বিদেশের

জমিনে সম্মানের সাথে পরিচিত করে তোলার কাজে দিবানিশি ব্যস্ত থাকে। শয়তানও তার কুটকৌশল তথা অসৎ তৎপরতা চালিয়ে নিজের আদর্শকে প্রচার করার জন্য আজ 'এমবেসী' প্রতিষ্ঠা করেছে। ভন্ড পীরের মাজারগুলো সব 'শয়তানের এমবেসী' হিসেবে কাজ করছে। এসব মাজারকে কেন্দ্র করে শয়তান তার ঈমান বিধ্বংসী মতবাদ প্রচার করছে। অতএব সাবধান!

২০. কবর জিয়ারত : কবর জিয়ারত বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমানিত ও সুন্নত। তবে শুধু কবর জিয়ারতের জন্য 'শরঈ সফর'কে বিজ্ঞ আলেমগণের অনেকেই বিদ'আত বলেছেন।

২১. ওরশ সম্পর্কে আকীদা : অনেক মাজারে ও পীরের দরবারে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, পীরের জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ নির্দিষ্ট করে ওরশ হয়ে থাকে। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে বিজলী বাতি, গেট, চকমকি কাগজ ইত্যাদি দিয়ে প্যান্ডেল, স্টেজ সাজানো হয়। বেপর্দা অবস্থায় নারীপুরুষ একত্রে বসে জিকির করে, কাওয়ালী ছামা শোনে। এসব ওরশে জামাতে নামাজও হয় না। ভন্ড পীর ফকীররা এসব ওরশে ওয়াজ নছীহতের নামে শরীয়ত বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস প্রচার করে। শাহী তাবারোক রান্না করা হয়। ওরশকে তারা মূলত একটা আনন্দোৎসব ও টাকা উপার্জনের পন্থা হিসেবে ব্যবহার করে। এসব ওরশ নিঃসন্দেহে নাজায়েজ ও হারাম।

২২. খাজা বাবার ডেগ : একদল লোক, বিশেষত যুবকেরা রজবমাস এলেই পথে, ঘাটে, বাজারে যেখানেই সুযোগ পায় সেখানেই একটা ডেগ বা হাড়ি বসায়। লালসালু কাপড় বিছিয়ে,বাঁশ দিয়ে ছাউনি দিয়ে, বিজলী বাতি জ্বালিয়ে, চকমকি কাগজ এবং বিভিন্ন ধরনের রং লাগিয়ে ঘর সাজিয়ে তার মধ্যে স্থাপন করে ডেগ। তারা একে বলে 'খাজা বাবার ডেগ'। তারপর এক রকম জোর জবরদস্তি করেই ওরশের নামে পথচারীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে। এসব কাজ স্পষ্ট হারাম।

প্রাণীর ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তি, ভাস্কর্য সম্পর্কে আকীদা

কোন দেশ বা অঞ্চলের নেতা বা সর্দার ও তথাকথিত সম্মানিত ব্যক্তিদের কীর্তি ও কার্যকলাপের আলোচনা অব্যাহত ও চলমান রাখার উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তিবর্গের মূর্তি, প্রতিকৃতি বা ভাস্কর্য পাথরের দ্বারা নির্মাণ করে মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে স্থাপন করে দেয়া হয়। তাদের ছবি অফিসে, আদালতে, ঘরে, রাস্তাঘাটে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। সময় সময় এগুলোকে আবার মাল্যভূষিত করা হয় বা এগুলোর পদমূলে পুষ্প অর্পণ করা হয়। এভাবে কোন নেতা, লিডার বা

স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিবর্গের ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদি তৈরি করা, মাঠে-ঘাটে, অফিস-আদালতে এগুলো স্থাপন করা, এগুলোকে সম্মান করা, এগুলোর উদ্দেশ্যে পুস্পস্ড়বক অর্পণ করা প্রভৃতি সবই নাজায়েজ ও হারাম।

সমাধি, স্মৃতিস্ড়ম্ভ, স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার সম্পর্কে আকীদা

স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিবর্গের স্বাভাবিক মৃত্যুর পর বা কোন বিশেষ ঘটনায় আত্মবিসর্জন দেয়ার পর অর্থাৎ নিহত বা শহীদ হবার পর তাঁদের স্মরণে তাঁদের স্মৃতিকে চিরজাগর ক রাখার জন্যে, তাদের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য সমাধিক্ষেত্র, স্মৃতিস্ড়ম্ভ, স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। দেশের স্বাধীনতার স্মরণে স্বাধীনতা স্ড়ম্ভ, বিজয়ের স্মরণে বিজয় স্ড়ম্ভ স্থাপন করা হয়। স্মরণীয় দিন উপলক্ষে এসব স্মৃতিস্ড়ম্ভ, স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার, শহীদ স্কোয়ারে খালি পায়ে হেঁটে যাওয়া হয়, পুস্পস্ড়বক অর্পণ করা হয়। মৃত স্মরণীয় ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য এসব স্ড়ম্ভ, সৌধ আর মিনারের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থেকে নীরবতা পালন করা হয়। কোন বিদেশী রাষ্ট্রীয় মেহমান সরকারি সফরে এলেই তাঁকে সর্বপ্রথম এসব স্ড়ম্ভে গিয়ে সম্মান জানাতে হয়, পুস্পস্ড়বক অর্পণ করতে হয়। এসব স্মৃতিসৌধে মেহমানদের সাথে সেনাবাহিনীর সদস্যরাও স্যালুট দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর সাথে সাথে জাতীয় সঙ্গীতও বাজতে থাকে।

সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের স্মরণে এসব স্মৃতিস্ড়ম্ভ নির্মাণ, এগুলোকে এভাবে সম্মান জানানো, পুষ্পশোভিত করা, এগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি সবই নাজায়েজ এবং বিজাতীয় রীতি। এভাবে সম্মান দেখালে তাদের কোনই উপকার হবে না। যদি তাঁদের জন্যে কিছু করতেই হয় তবে মসজিদ মাদ্রাসা স্থাপন করা যেতে পারে যে সবের সওয়াব তাঁরা কবরে শুয়ে শুয়ে পাবেন। এতেই তাঁরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন এবং এভাবেই সত্যিকার অর্থে তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

অগ্নিপূজা এবং শিখা চিরন্ড়ন, শিখা অনির্বাণ প্রসঙ্গে আকীদা

অগ্নি বা আগুনের প্রচ দাহিকা শক্তি এবং ভয়াবহ ধ্বংস ক্ষমতা দেখে প্রাচীনকাল হতেই এক শ্রেণীর মানুষ আগুনের পূজা করে আসছে। আগুন তাদের কাছে মহাসম্মানিত 'অগ্নিদেবতা'। হাজার হাজার বছর ধরে পারস্যের অধিবাসীরা আগুনের পূজা করেছে। সদাসর্বদা আগুন প্রজ্বলিত করে রাখা তাদের ধর্মের একটি

অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে বিবেচিত হত। 'চিরন্ড়ন অগ্নিশিখা' স্থাপন করে শত শত বছর ধরে বংশ পরম্পরায় শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে যে কোনো মূল্যে তারা তা প্রজ্বলিত রেখেছিল।

পারস্যের অগ্নিপূজক সম্প্রদায় হাজার বছরের লালিত চেতনায় যে শিখা অনির্বাণকে যুগ যুগ ধরে বংশগত ধারায় সদা প্রজ্বলিত রেখেছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুজিয়া স্বরূপ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মলগ্নে মহান আল্লাহ বিশ্ববাসীকে হতবাক করে সেই অনির্বাণ শিখাকে কুদরতীভাবে নিমিষেই দপ করে নিভিয়ে দিলেন। এ অলৌকিক ঘটনাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম এসেছে যাবতীয় শিখা চিরন্তনের কুসংস্কারকে উৎখাত করার জন্য।

'অগ্নিশিখা' অগ্নি পূজকের উপাস্য দেবতা। তারা ভক্তি প্রণাম ও নানা কর্মকা ের দ্বারা আগুনের পূজা করে থাকে। এ অগ্নিপূজা সম্পূর্ণ শিরক ও খোদাদ্রোহী কাজ। 'শিখা চিরন্ড়ন' ও 'শিখা অনির্বাণের' নামে অগ্নি মশালকে সারা দেশে ঘুরিয়ে যে ভক্তি-শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে এবং এগুলোর প্রজ্বলনকে অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ ধরনের বেদীর উপরে এগুলো স্থাপন করে বিজাতীয় যে অপসংস্কৃতি চালু করা হয়েছে, এটা নিঃসন্দেহে শিরক, কুফর ও শরীয়ত বিবর্জিত কাজ বলে উলামা মাশায়িখ ও মুফতীয়ানে কিরাম ফাতওয়া দিয়েছেন।

দেশের স্বাধীনতার স্মারকরূপে এবং মহান স্বাধীনতার জন্য যারা শহীদ হয়েছেন তাদের মাগফিরাতের নিমিত্ত যদি মসজিদ, হিফজ খানা, মাদ্রাসা স্থাপন করে "অব্যাহত কুরআন তিলাওয়াত"–এর ধারা প্রতিষ্ঠা করা হতো, তাদের স্মরণে লঙ্গরখানা, জনসেবা ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হতো, তবে তা দেশ ও জনগণের জন্য মহাকল্যাণ বয়ে আনত নিঃসন্দেহে এবং তা তাদেরকে চিরস্মরণীয় বরণীয় করে রাখতো।

মঙ্গল প্রদীপ ও মঙ্গল শোভাযাত্রা সম্পর্কে আকীদা

আজকাল হিন্দুদের অনুকরণে কোন অনুষ্ঠানের শুর তে বা কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে হিন্দুদের রথ যাত্রার অনুকরণে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র আয়োজন করা হয়। এসব বিজাতীয় আনুষ্ঠানিকতা নিঃসন্দেহে হারাম।

গায়রুল্লাহর কাছে দু'আ, প্রার্থনা করা সম্পর্কে আকীদা

১. দু'আ বা প্রার্থনা করা ইবাদত : রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اَلدُّعَآءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِى اسْتَجِبْ لَكُمْ الخ

"দু'আ সেটিই তো ইবাদত।" অত:পর তিনি পাঠ করেন কুরআন মাজীদের আয়াত যার অর্থ: "তোমাদের প্রভু বলছেন, তোমরা আমার নিকট দু'আ কর, তোমাদের দু'আ আমি কবুল করব। নিঃসন্দেহে যারা আমার ইবাদতে অহঙ্কার করে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।" (মিশকাত শরীফ)

লক্ষ্য করুন, এখানে মহান আল্লাহ কবুলিয়াতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরক্ষণে সেই দু'আকে ইবাদতরূপে সাব্যস্ত করেছেন এবং অহংকারীদের কঠোর হুশিয়ারী দান করেছেন। হাদীস গ্রন্থ তিরমিজী শরীফে বর্ণিত আছে :

اَلدُّعَآءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

"দু'আ হল ইবাদতের মগজ বা সারবস্তু।"

২. দু'আ কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য : দু'আ বা প্রার্থনা করা হয় দুই অনুভূতির ভিত্তিতে।

প্রথম, প্রার্থনাকারী নিজেকে দুঃখ দুর্দশা মোচনে সম্পূর্ণ অপারগ ও অক্ষম মনে করে। তার মনে বদ্ধমূল হয় যে, দুনিয়াবী আসবাব-উপকরণ দ্বারা এ মুসিবত দূর করা সম্ভব নয়। অতএব সে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে আহ্বান করে এবং তাঁর দরবারে ফরিয়াদি হয়।

দ্বিতীয়, সে এজন্যেই আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদি হয় যে, তার দৃঢ় বিশ্বাস হল আল্লাহ অলৌকিক শক্তির অধিকারী, অপরিসীম শক্তিমত্তার মালিক। তিনি সর্বত্র সর্বদা যে কোন ফরিয়াদির অবস্থা সম্পর্কে অবগত। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। যে কোন বস্তুর আহ্বান যে কোন স্থান থেকে তিনিই শুনেন এবং সে আহ্বানে সাড়া দান করেন। তিনি ব্যতীত যত উঁচুস্তরের সত্ত্বাই হোক না কেন, কেউ এসব গুণের অধিকারী নয়। এমনকি আল্লাহর খাছ বান্দা নবী-রাসূলগণও তাঁর দরবারে প্রার্থনাকারী এবং সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। সবাই বিপদাপদে তাঁর নিকট ফরিয়াদ করেছেন এবং একমাত্র তিনিই তাদের ফরিয়াদে সাড়া দিয়েছেন। অতএব দু'আ প্রার্থনা যে কেবল তাঁরই প্রাপ্য, তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এ সম্পর্কে প্রথমে কুরআন মাজীদের আয়াত লক্ষ্য করুন।

৩. কুরআনে আল্লাহ কেবল তাঁরই নিকট সাহায্য চাওয়ার কথাই শিক্ষা

দিয়েছেন : কুরআন মাজীদে আল্লাহতা'আলা কেবল তাঁরই নিকট সাহায্য চাওয়ার কথাই শিক্ষা দিয়েছেন নানাভাবে। সূরায়ে ফাতিহা যা মূলত একটি দু'আরই সূরা, তাতে বন্দেগী যেমন কেবলমাত্র এক আল্লাহরই করার কথা বলা হয়েছে, তেমনি সাহায্যও একমাত্র আল্লাহরই কাছে চাইতে শেখান হয়েছেন। বলা হয়েছে : اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ হে আল্লাহ, আমরা কেবল তোমারই বন্দেগী করি, কেবল তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

এ আয়াতে যেমন বন্দেগী, দাসত্ব ও আইন পালনকে কেবলমাত্র আল্লাহর সাথে খাস করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তেমনি যাবতীয় বিষয়ে ও ব্যাপারে সব রকমের সাহায্য প্রার্থনাও কেবল আল্লাহর নিকট করা যেতে পারে কিংবা করা উচিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। উপরন্তু ইমাম রাযীর ভাষায় (اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ) শব্দের মানে হচ্ছে (لَااَسْتَعِيْنُ بِغَيْرِكَ) 'হে আল্লাহ, তোমাকে ছাড়া আর কারো নিকটই আমি কোন প্রকারের সাহায্য চাই না। কেননা তুমি ছাড়া যার কাছেই সাহায্য চাইব, তার পক্ষে আমার কোনরূপ সাহায্য করা আদৌ সম্ভব নয়– তোমার সাহায্য ছাড়া। তাহলে তোমার সাহায্য ছাড়া অপর কারো পক্ষেই আমার কোনরূপ সাহায্য করা যখন আদৌ সম্ভব নয়, তখন আমি তোমাকে ছাড়া অপর কারো নিকট সাহায্য চাইবই বা কেন? মাঝখানের এই মধ্যস্থতা মেনে নেয়ার এবং তোমাকে বাদ দিয়ে তার নিকট ধর্ণা দেয়ার কিইবা দরকার থাকতে পারে?'

এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারী মুমিন সকাল-বিকাল, দুপুর-সন্ধ্যা যখনই নামাজে দাঁড়ায়, নামাজের প্রতি রাকাতে পাঠ করে, বরং পাঠ করতে হয়, "ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন।" এমনকি যখন বিতর নামাজ আদায় করে, তখন বিতরের দু'আ কুনুতে প্রথমেই বলে–"আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা" 'হে আল্লাহ, আমরা তোমারই সাহায্য কামনা করি।' সুতরাং বুঝতে বাকী নেই যে, দু'আ কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য। আর যখন দু'আ হল ইবাদত, বরং শ্রেষ্ঠ ইবাদত, ইবাদতের মগজ ও প্রাণ, তখন গায়রুল্লাহর নিকট দু'আ করার কোন প্রশ্নই আসে না এবং তাতে কোন অবকাশও থাকে না।

৪. আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন- প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেবেন :

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: তোমরা আমাকে ডাকবে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। (সূরা মুমীন আয়াত ৬০)

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَ لْيُؤْمِنُوْبِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

হে রাসূল, আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার ব্যাপারে প্রশ্ন করে (তবে আমার কথা বলে দিন), আমি খুবই নিকটবর্তী। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করবে, আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় সাড়া দেব। সুতরাং তাদের কর্তব্য হলো, তারা যেন আমার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং আমার হুকুম-আহকাম মেনে চলে। এতে তারা সত্যপথের পথিক হবে। (সূরা বাকারা, ১৮৬)

৫. সাহায্য কেবল আল্লাহর নিকটেই চাইতে হবে : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী এ পর্যায়ে আমাদের যে পথ-নির্দেশ করে তাও তো এই যে, সাহায্য কেবল আল্লাহর নিকটই চাইতে হবে। অন্য কারো নিকট নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন:

وَ اِذَا سَأَ لْتَ فَاسْئَلِ اللهِ وَ اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ

তুমি যদি কোন কিছু প্রার্থনা করতে চাও তো আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, আর যদি তুমি কোন সাহায্য চাও-ই, তাহলে সাহায্য চাইবে আল্লাহর নিকট। (তিরমিযী)

৬. এমনকি জুতার ফিতা এবং লবণও আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে :

তিরমিজী আনাস (রা:) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–প্রত্যেকেরই যে কোন প্রকার অভাবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা উচিত, এমন কি জুতার ফিতা পর্যন্ড় ছিঁড়ে গেলেও এবং এমনকি লবণও তাঁরই কাছে চাইবে। (মেশকাত-বাবোদ্দাওয়াৎ)

অর্থাৎ দুনিয়ার বাদশাগণ যেমন প্রধান প্রধান কাজগুলো নিজে দেখে থাকেন; এবং ছোট ছোট কাজগুলো চাকর বাকরদের হাতে ছেড়ে দিয়ে থাকেন; সুতরাং ঐ সব ছোট কাজের বেলায় প্রজাগণকে চাকরদের মুখাপেক্ষী হতে হয়। কিন্তু আল্লাহতা'আলার কার্যকলাপ এ রকম নয়। তিনি এমন সর্বশক্তিমান যে এক ইঙ্গিতে, নিমিষের মধ্যে কোটি কোটি ছোট বড় কাজ সুসম্পন্ন করতে পারেন। তাঁর রাজ্যে ছোট-বড় কোন কিছুই অন্য কারও করার অধিকার নেই। সুতরাং সব রকম অভাবে তাঁরই কাছে প্রার্থনা করা উচিত। (তাকভিয়াতুল ঈমান, আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ:))

৭. আল্লাহপাক ছাড়া অন্য কারো নিকট দু'আ বা প্রার্থনা করা শিরক: মুসলিম সমাজে আল্লাহকে এক ও অনন্য বলে সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় বটে,

কিন্তু কার্যত দেখা যায়, আল্লাহর উলুহিয়াতের তাওহীদের প্রতি যদিও বিশ্বাস রয়েছে; কিন্তু তাঁর র‍ূবুবিয়াতের তাওহীদ স্বীকার করা হচ্ছে না। মুখে স্বীকার করা হলেও কার্যত অস্বীকারই করা হচ্ছে। বরং এক্ষেত্রে অন্য শক্তিকে শরীক করা হচ্ছে। রব্ব হিসেবে মেনে নেয়া হচ্ছে আরো অনেক শক্তিকে; মুখে নয়-বাস্ড়ব কাজের ক্ষেত্রে। আর এ-ই হচ্ছে শিরক। শব্দগত আকীদা হিসেবে যদিও আল্লাহকে-ই রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, সৃষ্টিকর্তা, প্রভাবশালী, কর্তৃত্বসম্পন্ন, বিশ্ব ব্যবস্থাপক এবং রব্ব বলে স্বীকার করা হয়, কিন্তু এ শ্রেণীর লোকেরাই পীর ওলী বুজুর্গ লোকদের নিকট প্রার্থনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে। তাদেরই ভয় করে চলে, তাদেরই নিকট থেকে কোন কিছু পেতে আশা পোষণ করে। বিপদে পড়লে তাদের নিকট নিস্কৃতি চায়, উন্নতি তাদের নিকট থেকেই চায় লাভ করতে। মনে করে–এরা অলৌকিকভাবে মানুষের দু'আ শুনতে ও কবুল করতে পারে, সাহায্য করতে পারে, ফয়েজ দিতে পারে। ভাল-মন্দ করাতে ও ঘটাতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তাদের সন্ড়েষ কামনা করে। আর তাদের সন্ড়েষ বিধানের জন্যেই তাদের উদ্দেশ্যে মানত মানে, জন্তু জবাই করে, মরার পর তাঁদের কবরের উপর সিজদায় মাথা লুটিয়ে দেয়, নিজেদের ধন-সম্পদের একটা অংশ তাদের জন্যে ব্যয় করা কর্তব্য মনে করে।

ইসলামের তাওহীদী আকীদার দৃষ্টিতে আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট আর কাউকে সম্বোধন করে দু'আ করা সুস্পষ্ট শিরক। ইসলামে তা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ। কুরআন মাজীদে এ পর্যায়ের অসংখ্য আয়াত তার অকাট্য প্রমাণ। কুরআনের কোন কোন আয়াতে মুশরিকদের লক্ষ্য করে, কোন কোন আয়াতে সাধারণভাবে এবং অনেক আয়াতে তাওহীদবাদী মুসলিমদের লক্ষ্য করেই এ নিষেধ বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পেশ করা হচ্ছে। একটি আয়াতে বলা হয়েছে:

وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَـهُ اِلٰـى يَوْمِ الْقِيٰمَـةِ
وَ هُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ

আল্লাহকে বাদ দিয়ে (বা আল্লাহ ছাড়াও) যারা এমন সবকে ডাকে- দু'আ করে, যারা তাদের জন্যে কিয়ামত পর্যন্ড়ও জবাব দিতে পারবে না আর তারা তাদের দু'আ সম্পর্কে কিছুই জানে না, এই শ্রেণীর লোকদের চাইতে অধিক গোমরাহ আর কে হতে পারে? (সূরা আহক্বাফ : ৫)

অপর এক আয়াতের ভাষা হল এই :

وَ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

সব মসজিদ-ই আল্লাহর। অতএব আল্লাহর সঙ্গে অপর কাউকেই ডাকবে না।

(সূরা জ্বিন : ১৮)

খোদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে :

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ

তুমি আল্লাহর সাথে অপর কোন ইলাহকে একত্রিত করে ডেকো না– একত্রিত কর না। যদি তা কর, তাহলে তুমি আযাবপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হবে।

(সূরা শুআ'রা : ২১৩)

وَ لَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ

আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকেই ডাকবে না, যা তোমার কোন উপকার করতে পারে না, তোমার কোন ক্ষতি সাধনও করতে পারে না। তুমি-ও যদি তাই কর, তাহলে তুমিও জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা ইউনুস : ১০৬)

৮. গায়র ল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারী হতে আল্লাহপাক অনুগ্রহের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন : তাকভিয়াতুল ঈমান গ্রন্থে ইসমাঈল শহীদ (রহ:) এভাবে লিখেছেন, "ইবনে মাজাহ আমর ইবনুল আ'ছ হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষের হৃদয়ের জন্য প্রত্যেক মর প্রান্ড়রের দিকেই পথ আছে। যে ব্যক্তি আপন হৃদয়কে প্রত্যেক পথের দিকেই ধাবিত করে, আল্লাহতা'আলা স্বচ্ছন্দে তাকে যে কোন মর প্রান্ড় রে ধ্বংস করে দিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হবে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হবেন। (মেশকাত, বাবোত্তাওয়াক্কোল-আচ্ছাবর)

মানুষের যখন কোন অভাব উপস্থিত হয় অথবা তারা যখন কোন কঠিন বিপদে পড়ে; তখন নানা দিকে নানা বিষয়ে তাদের মন দৌড়াতে থাকে। যেমন–অমুক পয়গাম্বরকে ডাকা হোক, অমুক পীরের নিকট প্রার্থনা করা হোক, অমুক দেবতার নামে নামত করা হোক অমুক মোল্লাজীর দ্বারা ফাল দেখান হোক, অমুক ঠাকুরগণের দ্বারা অদৃষ্ট গণে দেখা হোক ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এ প্রকার সকল খেয়ালের দিকেই ধাবিত হয়, আল্লাহতা'আলা তার দিক হতে অনুগ্রহের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন এবং তাকে প্রকৃত বান্দার শ্রেণী হতে বের করে দেন। ফলে তার আর সত্য পথ-প্রাপ্তির উপায় থাকে না এবং কেউ মুশরিক বা অংশীবাদী হয়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি এরূপ না করে আল্লাহর উপর নির্ভর করে দৃঢ়ভাবে তাঁরই আশ্রয় প্রার্থী হয়, আল্লাহতা'আলা তাকে স্বীয় প্রিয় বান্দাগণের অন্ড়র্ভূক্ত করে

মুক্তির সকল পথ তার সম্মুখে খুলে দেন এবং তার হৃদয়ে এমন শান্ড়ি এমন আরাম প্রদান করেন-আশারূপ মরিচীকার পশ্চাদ্ধাবিত, উদভ্রান্ড় লোকেরা তা কল্পনাও করতে পারে না। শেষকালে অদৃষ্ট লিখিত ফল সকলের পক্ষেই ফলে। তন্মধ্যে মজা এটুকু যে, আল্লাহপাকের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ শান্ড়িসুখের ভেতর দিয়ে আর উদভ্রান্ড় লোকেরা উৎকট বিড়ম্বনার ভেতর দিয়ে তা লাভ করে থাকে।" [তাকভিয়াতুল ঈমান, ইসমাঈল শহীদ (রহ:)]

গায়রুল্লাহ বা কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির নিকট গায়েবী সাহায্য চাওয়া সম্পর্কে আকীদা

১. বিপদে পড়লে গায়রুল্লাহকে ডাকা : অনেক লোককে দেখা যায় বিপদে-আপদে, রোগে শোকে আল্লাহপাককে বাদ দিয়ে পীর, ওলী, জিন, ফেরেশতাদের ডাকতে থাকে। 'ইয়া গাওসুল আজম বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী, ইয়া খাজা বাবা, ইয়া সুলতানুল আউলিয়া, হে পীর কেবলাজান, হে জিন... আমাকে রক্ষা কর ন, আমাকে বিপদ হতে বাঁচান, আমার মকছুদ পুরা কর ন, সন্ড়ান দিন ইত্যাদি।' কেউ কেউ বালা মুছিবতের সময় বুজুর্গ লোকদের উদ্দেশ্যে দু'আ করে, ফরিয়াদ জানায়। এভাবে গাইর ল্লাহকে ডাকা, আহ্বান করা এবং তাদের কাছে নিজের ফরিয়াদ ও আরজি পেশ করা, তা' কাছ থেকে হোক আর দূর থেকেই হোক, স্পষ্ট হারাম ও শিরক।

আল্লাহতা'আলা বলেন:

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ

সমস্ড় সত্য আহ্বান একমাত্র তাঁরই জন্য, বস্তুত: তাঁকে ছেড়ে অন্য যাদেরকেই তারা আহ্বান করে, তারা তাদের সে আহ্বানে কিছুমাত্রও সাড়া দিতে পারে না। (সূরা রা'দ-১৪)

আল্লাহতা'আলা তাঁর পবিত্র কুরআনে বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۹۴﴾ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَاۤ ۫ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَاۤ ۫ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَاۤ ۫ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا

তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডেকে থাক, তারা তোমাদের মতই বান্দা। সুতরাং তাদেরকে ডেকেই দেখ না, তাদের উচিত তোমাদেরকে সাড়া দেয়া, অবশ্য তোমরা যদি সত্যিবাদী হয়ে থাক। তাদের কি পা রয়েছে যা দিয়ে তারা হাঁটে? তাদের কি হাত রয়েছে যা দিয়ে তারা কিছু ধরে? তাদের কি চোখ

রয়েছে যা দিয়ে তারা দেখে? তাদের কি কান রয়েছে যা দিয়ে তারা শুনতে পায়? (সূরা আল-আরাফ: ১৯৪–১৯৫)

আল্লাহতা'আলা বলেন :

وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ ۞ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডেকে থাকে, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। মরা লাশ যারা জীবিত নয়, তারা এও জানে না যে কখন তাদেরকে তোলা হবে। (সূরা নাহল : ২০–২১)

২. তারা মাছির কাছ থেকেও কোনো কিছু উদ্ধার করতে পারেনা : আল্লাহতা'আলা বলেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَ اِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوْبُ

হে মানুষেরা! একটা উদাহরণ দেয়া হচ্ছে, তোমরা খুব ভাল করে শুন। তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাকছো তারা কখনো একটা মাছি পর্যন্ড় সৃষ্টি করতে পারবে না। যদি তারা সকলেই এর জন্য একত্রিত হয় এবং যদি কোন মাছি তাদের কোন কিছু চুরি করে, তাহলে তারা সকলে মিলে তার কাছ থেকে সেটা উদ্ধারও করতে পারবে না। যে (সাহায্য প্রার্থনা) চায় এবং যার কাছে চায় উভয়ে কতইনা দুর্বল! (সূরা হজ্জ ৭৩)

উক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে কোন নেককার জীবিত বা মৃত ওলী পীর কখনো কাউকে সাহায্য করার সামর্থ্য রাখেন না। বরং তারা এতই অপারগ যে, সৃষ্টির সামান্য মাছিও যদি তাদের খাদ্য নিয়ে যায় সেটা কখনো তাঁরা ফিরিয়ে আনতে পারেন না। যারা এতই দুর্বল তাদের কাছে কিভাবে সাহায্য প্রার্থনা করা যায়?

৩. তারা একটা খেজুর খোসারও মালিক নয় : আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন–

وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۞ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ

তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডেকে বেড়াচ্ছো–তারা একটা খেজুর খোসারও মালিক নয়। তোমরা যদি তাদেরকে ডাকতেই থাকো, তারা যে কিছুই শুনতে পারে না। (সূরা ফাতির : ১৩-১৪)

৪. তাদের অবস্থা মাকড়সা ও তার জালের ন্যায় : গায়রুল্লাহ বা কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির নিকট গায়েবী সাহায্য চেয়ে যারা তৃপ্তি লাভ করে ও নিজেদের নিরাপদ ভাবে, তাদের অবস্থা মাকড়সা ও উহার জালের ন্যায়।

আল্লাহ বলেছেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ؕ وَ اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ .

"যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা; যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরইতো দুর্বলতম, যদি তারা জানতো।" (সূরা আনকাবুত : ৪১)

৫. মৃত্যুর পর নবীজী মেয়েকে সাহায্য করতে পারবেন না : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আদরের কন্যা ফাতেমা (রা:) কে বলেছেন : হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তোমার যত টাকা দরকার চেয়ে নাও; কিন্তু আখেরাতে তোমাকে বাঁচানোর ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই।

যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং বলেছেন, আমি জীবিত থাকতে যত সম্পদ প্রয়োজন আমার কাছে চেয়ে নাও, কিন্তু মৃত্যুর পর আর তোমাকে আমি কোন রকম সাহায্য করতে পারব না। তাহলে যে সমস্ড় আওলিয়াগণের কাছে বা তাদের মাজারে গিয়ে নিজের ধন সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন রকমের মানত ও আরও কত কি করা হচ্ছে, এ সমস্ড় ওলীগণ কিভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারেন! সাহায্য একমাত্র মহান আল্লাহই করেন এবং প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে দাঁড়িয়ে আমরা সেটারই সাক্ষ্য দেই।

আল্লাহতা'আলা বলেন :

وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন ওলী ও কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা বাকারা : ১০৭)

৬. সম্পদ বৃদ্ধি করে দেয়ার ক্ষমতা শুধু আল্লাহরই : যদি পীর ফকিরদের কাছে প্রার্থনা করলেই সম্পদ পাওয়া যেত, তাহলে সমস্ড় গরীবই ধনী হয়ে যেত। কিন্তু তা হচ্ছে না এ জন্য যে, ধন সম্পদ বৃদ্ধি করিয়ে দেয়ার ক্ষমতা শুধু আল্লাহরই। এ ধন সম্পদ যদি আল্লাহর কাছে না চেয়ে কোন জীবিত বা মৃত

ব্যক্তির কাছে চাওয়া হয়, তাহলে ঐ মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহর সমতুল্য করা হলো, আর এটা সুস্পষ্ট শিরক।

৭. বিপদ যত কঠিনই হোক আল্লাহ ছাড়া কারো নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে না : কঠিন থেকে কঠিন বিপদেও আল্লাহ ছাড়া কারো নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে না। শুধু জীবিত মানুষের কাছে আর্থিক সাহায্য ও দু'আর সাহায্য নেয়া যাবে অথবা মুসলমান ভাই হিসাবে অন্যের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তার ভাইকে যেকোন প্রকারের সাহায্য করা যাবে। তবে সেটা ঐভাবেই হতে হবে যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যদি জীবিত ব্যক্তির কাছে তার বিপদে যে কোন সাহায্য নে'য়া জায়েজ হয়, তবে মৃতদের কাছে অথবা গায়েব থেকে কারও সাহায্যের আশা কেন করা যাবে না? যেমন কোন ব্যক্তি বিপদে দূর থেকে তার পীর সাহেবকে স্মরণ করে, আর বলে, হে পীর বাবা, আপনি আমার বিপদ দূর কর"ন। অথচ পীর সাহেব জানতেছেনও না যে, তার মুরীদ বিপদে তার কাছে সাহায্য চাচ্ছে। মৃত ব্যক্তি ও গায়েব থেকে কারও কাছে এই জন্যেই সাহায্যের আশা করা যাবে না যে, আমরা জীবিত ব্যক্তির কাছে দু'আ নেয়া ও মুসলমান ভাইকে সাহায্য করার মর্মে কুরআন ও হাদীস থেকে অনেক অনেক দলীল ও প্রমান পেয়ে থাকি। কিন্তু মৃত ব্যক্তি অথবা গায়েব থেকে কারো কাছে সাহায্য কামনা করার প্রমাণ তো নেই-ই, বরং সেটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

আল্লাহতা'আলা বলেন :

مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

'তাদের উপর আপদ বিপদ ও ভূমিকম্প আপতিত হয়েছে। তারা ভীষণ ভয়ে এমনভাবে ভীত হয়েছে যে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সহযোগী মোমেনগণ আর্তনাদ করে বলছেন, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে। (তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে) আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।' (সূরা বাকারা : ২১৪)

এই ভীষণ ভয়াবহ অবস্থায়ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণ কোন মৃত ব্যক্তি যেমন হযরত ইব্রাহিম (আ:) অথবা হযরত আদম (আ:)- এর কাছে সাহায্য কামনা করেন নাই, বা তাঁদের কাছে আল্লাহর নিকট ও বিপদের জন্যে সুপারিশ করার জন্যও বলেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল

নামধারী মুসলমানগণ সাংসারিক ছোট খাট বিপদে সামান্য কিছুর প্রয়োজনে দরগাহ ও মাজারের কবরস্থদের কাছে দৌড়ায়। কেউবা খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির কাছে, কেউবা তার নির্দিষ্ট করা কোন পীরের কাছে আকুল আবেদন জানায়। তাদের ধারণা মাজারে শায়িত আল্লাহতা'আলার ওলী মরেন নাই, তাই তারা তাদের বিপদে মৃত ওলীর সাহায্যের আশা করে, তাদের নিকট কাতর স্বরে নিজেদের বিপদ মুক্তির আবেদন জানায়। এবং যখনই তাদের কাছে সাহায্যের কিছুমাত্র আশা করে, তখনই সে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়।

৮. গায়র"ল্লাহর কাছে রোগ ও বিপদমুক্তি, রিযিক, সন্ড়ান, সম্পদ ইত্যাদি চাওয়া শিরক : আল্লাহতা'আলা বলেছেন–

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ

হে মানবগোষ্ঠী! তোমরা আল্লাহর নিকট অভাবী, আর আল্লাহ-ই হলেন ধনী, প্রশংসিত (অমুখাপেক্ষী; কিন্তু সৃষ্টিজগত তাঁর নিকট মুখাপেক্ষী)। (সূরা ফাতির : ২১৪)

অদৃশ্য জগতের সবকিছুই একসাথে দেখতে পান, জানতে পান ও শুনতে পান সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ। তাই সাহায্য একমাত্র আল্লাহর নিকটই চাইতে হয়।

কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হল :

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

কোন দুঃখ বা বিপদ যদি তোমাকে গ্রাস করে থাকে তবে তা (আল্লাহর মর্জিতেই হয়েছে মনে করতে হবে এবং তা) দূর করার কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। এমনিভাবে তুমি যদি কোন কল্যাণ লাভ করে থাক তবে তিনিই তো সর্বশক্তিমান। (সূরা আন'আম : ১৭)

অর্থাৎ এ কল্যাণ দান করার ক্ষমতাও তাঁরই রয়েছে এবং তাঁরই অনুগ্রহে তুমি এ কল্যাণ লাভ করেছ। তিনি ছাড়া এ কল্যাণ তোমাকে আর কেউই দিতে পারেনি। কেননা অন্য কারোরই কিছু করার ক্ষমতা নেই, সামর্থ্য নেই।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَ اِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ

الرَّحِيْمُ

আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি বা বিপদ দেন, তবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই দূর করতে পারে না। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ দান করতে ইচ্ছে করেন, তবে তার মেহেরবাণীকে রহিত করার মতও কেহ নেই। তবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়। (সূরা ইউনুস : ১০৭)

তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন এবং কার্যকর করেন। বান্দার কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধিত হয় একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায়। বান্দার রিযিকের প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা, আল্লাহর ইচ্ছায়-ই নির্ধারিত হয়।

এ বিষয়ে কুরআন মাজীদের উক্তি–

اَللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَ يَقْدِرُ

আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন, তার রিযিককে প্রশস্ত করে দেন, আবার কারো রিযিককে সংকীর্ণ করে দেন। (সূরা রা'দ : ২৬)

هُوَ الَّذِىْ يُحْيِىْ وَ يُمِيْتُ

তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দেন।

বান্দার মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, কল্যাণ-অকল্যাণ, সবকিছুই আল্লাহর ফায়সালার অধীন। এ বিশ্বাস যার থাকবে না, সে কাফির।

لَا مَلْجَا مِنَ اللهِ اِلَّا اِلَيْهِ

আল্লাহ-ই বান্দার একমাত্র আশ্রয়স্থল।

আল্লাহ বলেন : اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْءَ

'তুমি বলতে পার কি, অস্থির-অসহায় ব্যক্তির ডাকে যিনি সাড়া দেন এবং বিপদ দূর করেন তিনি কে?'(সূরা নামল : ৬২) অর্থাৎ, তিনি আল্লাহ ব্যতীত কেউ নয়। এসব করার ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত কারো নেই। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি বাহনে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিছনে ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন: হে ছেলে! তুমি আল্লাহর নীতি মেনে চলো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে রাখবেন। হে ছেলে! তুমি আল্লাহর বিধানের হিফাযত কর, তাহলে তুমি তাকে তোমার সামনেই পাবে। যখন তুমি কিছু (প্রয়োজনে) সাওয়াল করবে, তখন আল্লাহরই কাছে সাওয়াল করবে আর যখন সাহায্য চাইবে

আল্লাহরই কাছে চাইবে। কেয়ামত পর্যন্ত যা হবে আল্লাহতা'আলা তা লিখে রেখেছেন। সমস্ত মানুষ যদি তোমার এমন কোন মঙ্গল করতে চায় যা আল্লাহ তোমার ভাগ্যে লিখেননি, তবে কেউই তোমার কোন উপকার করতে পারবে না। আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, যা আল্লাহতা'আলা তোমার ভাগ্যে লিখেননি, তবে কেউই তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তুমি সততার সাথে আল্লাহকে খুশী করতে চাও, তাহলে তা সম্পাদন করে ফেল। আর সামর্থ্য না হলে ধৈর্য্য ধারণ কর। কেননা তোমার অপছন্দনীয় বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণে বড় রকমের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। মনে রাখবে- ধৈর্য্যের সাথেই সাহায্য, বিপদের সাথেই মুক্তি এবং কষ্টের সাথেই আরাম জড়িত।

হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহ:) উক্ত হাদীসটির মর্মে বলেন: প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমানের উচিত সে যেন উক্ত হাদীসকে অন্তরের আয়না এবং শরীরের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিধান বানিয়ে নেয় এবং যে কাজ কর্মে, চলাফেরা, উঠাবসায় এ হাদীসের উপর আমল করে, সে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি পায় এবং মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে সম্মান পায়। (ফতহুল গায়েব-৪২তম প্রবন্ধ)

৯. বিপদমুক্তি আল্লাহর হাতে : বিপদ কেবলমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে আর সে বিশ্বাসই যদি আমাদের থাকে, তাহলে সাহায্যও আল্লাহরই কাছে চাইব এবং বিপদে আল্লাহরই উপর ভরসা করে ধৈর্য্য ধারণ করে ঈমানকে ঠিক রাখব। আল্লাহতা'আলা বিপদে নিক্ষেপ করে কঠোর পরীক্ষার মাধ্যমে খাঁটি মুসলমানকে বাছাই করে নেন এবং যারা এ বিপদে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মাজারে ছুটাছুটি আরম্ভ করে তাদেরকেই আল্লাহতা'আলা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

আল্লাহতা'আলা বলেন :

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ

সকল বিপদই আল্লাহর অনুমতিতে এসে থাকে। (সূরা তাগাবুন : ১১)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বিপদ আল্লাহতা'আলাই দিয়ে থাকেন, কাজেই সে বিপদে অন্যের কাছে না গিয়ে ধৈর্য্য ধারণ করাই ঈমানের পরিচায়ক এবং ধৈর্য্যশীলদের জন্য আল্লাহতা'আলাই সাহায্যকারী হয়ে যান।

আল্লাহতা'আলা বলেন: وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ

একমাত্র আল্লাহরই নিকট থেকে সাহায্য এসে থাকে। (সূরা আল-ইমরান : ১২৬)

আল্লাহতা'আলা আরও বলেন : بَلِ اللهُ مَوْلٰىكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ

আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের ওলী এবং তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

(সূরা আল ইমরান : ১৫০)

উক্ত আয়াতগুলি থেকে সুস্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে, আল্লাহতা'আলা সর্বোত্তম সাহায্যকারী এবং আমাদের যে কোন বিপদ আপদে আকুল হৃদয়ে একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

১০. রিযিক ও দৌলত দানকারী একমাত্র আল্লাহপাক :

আল্লাহতা'আলা বলেন :

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

আল্লাহ ব্যতীত আর কোন স্রষ্টা আছে কি, যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করেন? (সূরা ফাতির : ৩)

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ شَيْئًا وَّ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

আল্লাহকে ছেড়ে তারা এমন বস্তুসমূহের আনুগত্য করে, যারা না তাদেরকে আসমান থেকে জীবিকা দিতে পারে, না জমিন থেকে এবং তাদের সে ক্ষমতাও নেই। (সূরা নাহল : ৭৩)

আল্লাহতা'আলা ব্যতীত আমাদেরকে রিযিক দেয়ার আর কেউই কিছুমাত্র ক্ষমতা রাখে না। শুধু আমরাই নই, বরং এ পৃথিবীর সমস্ড় প্রানীর রিযিকের দায়িত্বই আল্লাহতা'আলা নিয়েছেন।

আল্লাহতা'আলা বলেন :

وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

এ পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন প্রাণী নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহতা'আলা গ্রহণ করেননি। (সূরা হূদ : ৬)

আল্লাহতা'আলা বলেন:

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ۚ اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা কম করে দেন, এতে বিশ্বাসীদের জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে। (সূরা-রূম-৩৭)

وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

আল্লাহ তাকে এ পরিমাণ সম্পদ দিবেন যা সে ধারণাও করতে পারে না। (সূরা তালাক : ৩)

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ

অবশ্যই তোমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করে দেন, আবার যাকে ইচ্ছা কম করে দেন। (সূরা বণী ইসরাঈল : ৩০)

এছাড়া আরও অনেক আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, ধন সম্পদ কম ও বেশী করা একমাত্র আল্লাহরই ইচ্ছা। তাহলে আমরা কি করে ঐ আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের যে কোন অভাবে মাজারে বা পীরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে থাকি? কেউবা খাজা বাবার দরবারে, কেউবা আব্দুল কাদের জীলানী (রহ:) এর মাজারে, আবার কেউ কেউ শাহজালালের দরগায় গিয়ে ফরিয়াদ জানাই। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন এবং তাঁর সংগ্রামী সাহাবাগণের জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, তারা ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পেটের জ্বালা থামানোর জন্য তাদের পেটে পাথর পর্যন্ড় বেঁধে ছিলেন। ঐ ভয়াবহ অবস্থায়ও ঐ সমস্ড় সাহাবাগণ কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম-এর কাছেও এক মুঠো ভাতের আশা করেন নাই। তাই যখন তাদের পেটে পাথর বাঁধার অবস্থা জানানো হয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম এই বলেন নি যে, আমি রিযিকের ব্যবস্থা করছি, বরং তিনিও তখন তাঁর নিজের পেট দেখিয়েছিলেন যে, দেখো তোমরা একটি করে পাথর বেঁধেছ, আর আমি দুটি পাথর বেঁধেছি। যদি সেই মহা মানব নিজে তাঁর নিজের জন্যও এতবেশী অপারগ ছিলেন, তিনি অন্যকে আর কী সাহায্য করবেন? আর যদি তাই সত্য হয়, তাহলে কেন আমরা আমাদের ধন সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য পীর ফকিরদের কাছে ছুটোছুটি করি? কেন আমরা ঐ মহান আল্লাহর কাছে হাত লম্বা করি না?

আল্লাহতা'আলা তাঁর কাছেই র"যীর জন্য হাতকে লম্বা করতে বলেছেন, যা পবিত্র কালাম থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে–

وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابُ

(হে আল্লাহ) তুমি যাকে ইচ্ছা হিসাব ছাড়া দান করে থাক। (সূরা আলে ইমরান : ২৭)

১১. সন্ড়ান দানকারী একমাত্র আল্লাহ : সন্ড়ান দানকারী একমাত্র আল্লাহপাক। তিনি ছাড়া আর কেউই সন্ড়ান দিতে পারে না। এ ব্যাপারে তিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক। তিনি চাইলে বৃদ্ধা বন্ধ্যা মহিলারও বাচ্চা হতে পারে। আর তিনি ইচ্ছা না করলে দুনিয়ার সমস্ড় ওলী, পীর, গওস, কুতুবের দু'আ নিলে, পানিপড়া খেলে আর তাবীজ বাঁধলে একটা কানা খোড়া, ল্যাংড়া বাচ্চাও হবে না। দুনিয়ার সমস্ড় ডাক্তার যদি বলে দেয় এ মহিলার সন্ড়ান ধারণের কোন ক্ষমতাই নেই, তথাপি আল্লাহপাক তাঁকে সন্ড়ান দিতে পারেন। আর সকল দিক দিয়ে সুস্থ উর্বষী কোন দম্পতিকে আল্লাহপাক ইচ্ছে করলে সারাজীবন নিঃসন্ড়ান রাখতে পারেন। তিনিই বৃদ্ধ বয়সে হযরত যাকারিয়া (আ:) কে পিতা বানিয়েছেন, তিনিই

বিনা স্বামী সাহচর্যে কুমারী হযরত মরিয়মকে সন্ড়ান দান করেছেন। তিনি পারেন না এমন কিছুই নাই।

আল্লাহপাক কুরআন শরীফে ঘোষণা করেছেন–

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۝ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا ۚ وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

'আল্লাহর জন্যই নভোম—লের আধিপত্য, তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, তিনি যাহাকে ইচ্ছা শুধু কন্যা দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শুধু পুত্র দান করেন অথবা তাহাদিগকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।' (সূরা শূরা : ৪৯–৫০)

মানুষ সন্ড়ানের জন্য সেই মহান আল্লাহতা'আলাকে বাদ দিয়ে পীর ওলীদের কাছে গিয়ে আবেদন করে। বিশেষ করে যারা নিঃসন্ড়ান তারা দরগাহ, মাজার, খানকায় গিয়ে পীর ওলীদের কাছে সন্ড়ানের জন্যে প্রার্থনা করে। কিন্তু আল্লাহতা'আলা যাকে নিঃসন্ড়ান রাখা ভালো মনে করেন তাকে নিঃসন্ড়ানই রাখেন। তাই আল্লাহতা'আলার কাছে প্রার্থনা করার পরও কোন সন্ড়ান না হলে অথবা যাদের পুত্র নেই তারা যদি পুত্র সন্ড়ানের জন্য দু'আ করার পরও পুত্র সন্তান না হলে সেটা ঐ মহান আল্লাহরই ইচ্ছা। আল্লাহ্ তা'য়ালা যার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন সেটা রদবদল করার ক্ষমতা কারো নেই। তিনিই সর্বশক্তিমান। ঐ পীরওলীর কিছু মাত্র ক্ষমতা নেই সন্ড়ানের ব্যাপারে সাহায্য করার।

১২. নিজ ইচ্ছায় ছেলে মেয়ে জন্ম: কিছুদিন পূর্বে দৈনিক ইত্তেফাকে উপরোক্ত শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। বিজ্ঞাপনটির সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ–

"নিজের পছন্দমত ছেলে বা মেয়ের পিতামাতা হওয়া এখন কোন ব্যাপারই নয়। বিদেশী বিশেষজ্ঞের বহু বছরের গবেষণার ফসল আমাদের এ পদ্ধতি। ৯০% সফলতার গ্যারান্টি। গাইডবুক পাওয়া যাচ্ছে। আর চিন্ড়া নেই, আপনি ইচ্ছামত ছেলে বা মেয়ে জন্ম দিতে পারবেন। আজই যোগাযোগ কর—ন। ঠিকানা...।"

কোন মানুষ বা মাখলুকের পক্ষে, তিনি বিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিদ, পীর, ওলী বা নবীই হোক না কেন, নিজের ইচ্ছামত ছেলে বা মেয়ে জন্মদান করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। আল্লাহপাক ছাড়া অন্য কাউকে এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করা শিরক। গর্ভস্থ সন্ড়ান ছেলে না মেয়ে হবে তা' নির্ধারণ করেন একমাত্র মহান রাব্বুল

আলামীন আল্লাহপাক। এ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার করা, এসব বিষয় বিশ্বাস করা, তাদের কাছে গিয়ে পদ্ধতি জানতে চাওয়া ইত্যাদি সবই শিরক।

১৩. বিশ বছর পর অমুক হুজুরের দু'আয় সন্ড়ান লাভ : পত্র পত্রিকায় প্রায়ই ছবিসহ বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায় যার বিষয়বস্তু থাকে– 'বিশ/পঁচিশ বছর পর অমুক হুজুরের মাধ্যমে সন্ড়ান লাভ করেছি। সমস্ড় চিকিৎসকরা ব্যর্থ হয়ে যখন আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন, তখন ফকির বাবার কাছে গিয়ে ফরিয়াদ করায় উনি কিছু তাবীজ তুমার দিলেন, আমাদের জন্য দু'আ করলেন। তার সুপারিশে এত বছর পর আল্লাহপাক আমাদের সন্তান দিয়েছেন। যাদের সন্ড়ান হচ্ছে না তারাও হুজুরের সাথে যোগাযোগ করেন। আমাদের বিশ্বাস আপনারাও সন্ড়ান লাভ করবেন। হুজুরের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা...।' মূলত একশ্রেণীর পেশাদার নামধারী পীরফকির তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে এসব বিজ্ঞাপন প্রচার করে অসহায় নিঃসন্ড়ান দম্পত্তিদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। এরূপ বিজ্ঞাপন পড়ে এদের প্রতারণা বুঝতে না পেরে অজ্ঞ অশিক্ষিত সরলপ্রাণ মানুষেরা যে শুধু প্রতারিত হয়ে সর্বস্বান্ড় হয় তাই নয়, উপরন্তু ঐসব নামধারী পীরফকিরদেরই সন্ড়ান দাতা বলে বিশ্বাস করে নিজেদের ঈমান-আমল বরবাদ করে।

১৪. বাচ্চা কখন নেবেন? আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজে প্রায়ই এরূপ শুনতে পাওয়া যায়– 'বাচ্চা কবে নেবেন? বিয়ের পর পর বাচ্চা নিলে জীবনটা উপভোগ (উহলড়ু) করা যায় না, তাই কমপক্ষে বিয়ের ৪/৫ বছর পর বাচ্চা নেয়া উচিত। দ্বিতীয় বাচ্চা পাঁচ/সাত বছরের ব্যবধানে নেয়া উচিত। আমরা দু'টার বেশী বাচ্চা নেব না।' ...ইত্যাদি। এরূপ কথাবার্তা শুনলে মনে হয় যেন বাচ্চা নিজের ইচ্ছেমত বা খেয়ালখুশী মত আগে পরে যখন তখন নেয়া যায়, নিজের ইচ্ছেমত একটা/দুটা/তিনটা এরূপ সংখ্যাও নির্ধারণ করা যায়। এভাবে কথাবার্তা বলা জায়েজ নয়।

বাচ্চা বন্ধ করার জন্য যত ঔষধ ও সামগ্রীই আপনি ব্যবহার করেন না কেন– আল্লাহপাক ইচ্ছে করলে যে কোন অবস্থায়ই সন্ড়ান দিতে পারেন। আবার বিভিন্ন ঔষধ ও সামগ্রী ব্যবহার বন্ধ করে সন্ড়ান নেয়ার জন্য যত চেষ্টাই করেন না কেন, আল্লাহপাকের ইচ্ছে না হলে কোন বাচ্চাই আপনার হবে না।

১৫. ১০০% গ্যারান্টিতে রোগমুক্তি : আজকাল একদল তথাকথিত

চিকিৎসক পত্র-পত্রিকায়, পোস্টার-হ্যান্ডবিলে এভাবে প্রচার করেন যে, এখানে ১০০% গ্যারান্টিতে চিকিৎসা করা হয়; ডায়াবেটিস, হাঁপানিসহ সকল রোগ থেকে এক সপ্তাহ/এক মাসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করবেন; চ্যালেঞ্জ করছি, বিফলে মূল্য ফেরত ইত্যাদি।

এভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করা এবং চিকিৎসা ও ঔষধকে রোগ হতে মুক্তিদানকারী মনে করা, এজন্যে গ্যারান্টি দেয়া বা চ্যালেঞ্জ করা নাজায়েজ, হারাম ও শিরকের পর্যায়ভুক্ত। কেননা রোগমুক্তি আল্লাহর হাতে। চিকিৎসকের কাছে গিয়ে পরামর্শ নেয়া, ঔষধ খাওয়া এগুলো সুন্নত, কিন্তু আল্লাহর হুকুম ছাড়া রোগীকে রোগমুক্তি দানের কোন ক্ষমতা চিকিৎসক বা ঔষধের নেই। আল্লাহর হুকুম না হলে ঔষধের কোন কার্যকারিতাই থাকে না।

তাই রোগব্যাধি হলে যেমন চিকিৎসকের পরামর্শ মত ঔষধ খেতে হবে, সাথে সাথে রোগমুক্তির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনাও করতে হবে।

১৬. রূহানী শক্তিবলে মুসকিল আসান : এক শ্রেণীর লোক পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন প্রকার মনগড়া ও আজগুবী বিজ্ঞাপন দিয়ে সরল প্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে এবং তাদের ঈমান ও আমলকে বরবাদ করে দিচ্ছে। বড় বড় হেডিং দিয়ে তারা পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করে–

'অমুক হুজুর রূহানী শক্তির মাধ্যমে রোগ-শোক, বালা মুছীবত, বিপদ-আপদসহ সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন...'

'অমুক সাধক 'ইলমুল মারেফাতের' মাধ্যমে সকল বিপদ হতে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন...'

'আধ্যাত্মিক শক্তিবলে সকল সমস্যার সমাধান দেয়া হয়...'

'সর্পরাজের চ্যালেঞ্জঃ সর্ববিদ্যার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান...'

'রত্ন পাথরের মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান...'

'জিনের মাধ্যমে সকল মুসকিলের সমাধান...'

'মহাজাতকের চ্যালেঞ্জ...'

'সুফিয়া বেগমের চ্যালেঞ্জ...'

'স্বপ্নে পাওয়া তদবীরঃ স্বপ্নে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় পীর সাহেব (রহঃ), খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) বা অমুক বুজুর্গের কাছ থেকে তদবীর লাভ করেছি। তাঁরা এ তদবীর মুসলমানদের দিতে বলেছেন, এর মাধ্যমে সকল বালা মুছিবত দূর হয়। এক যুগের পরীক্ষিত। হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হয়েছে...'

'রূহানী শক্তিবলে মুসকিল আসান...'

'৫/৭ বছরের ছেলের ফুঁকে সব সমস্যার সমাধান হচ্ছে–' ইত্যাদি।

এসব বিজ্ঞাপন ও খবর পড়ে সমস্যায় জর্জরিত মানুষ সহজেই আকৃষ্ট হয় এবং সমস্যার সমাধানের জন্যে এদের কাছে ধর্না দেয়। বিপদগ্রস্ত মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে এরা কৌশলে তাদের অর্থকড়ি কেড়ে নিয়ে শুধু সর্বস্বান্তই করে না, ঈমানহারাও করে ছাড়ে।

অসহায় বিপদগ্রস্ত মানুষদের আকৃষ্ট করার জন্য কখনও কখনও এরা তাদের কিছু এজেন্টদের মাধ্যমে পত্রিকায় ছবি সহকারে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে প্রচার করে যে, 'অমুক হুজুরের দু'আ ও তদবিরে আমি ভাল হয়েছি, বিপদমুক্ত হয়েছি, হাঁপানী ও ডায়াবেটিস হতে মুক্ত হয়েছি ইত্যাদি।'

এসব ব্যবসাদার নামধারী হুজুর, পীর, ওলী, তদবিরকারক, সাধক, জ্যোতিষী, রত্ন বিশেষজ্ঞ, সর্পরাজ, মহাজাতকরা যাতে তাদের ঈমান বিধ্বংসী বানোয়াট, মিথ্যা প্রচার সর্বস্ব বুলি আউড়িয়ে অসহায় মুসলমানদের ঈমানকে বরবাদ করতে না পারে সেজন্য সকলকে সজাগ হতে হবে।

১৭. খাজা বাবার দু'আ, না আল্লাহর দয়া : একদল পীর পূজারী, মাজার পূজারী লোক কোন বিপদে বা সমস্যায় পড়লেই পীরের কাছে, মাজারে, বাগদাদে, আজমীরে চলে যায়–তাদের কাছে দু'আ চায়, বিপদমুক্তির জন্য ফরিয়াদ জানায়। এক্ষেত্রে হাজার হাজার টাকা খরচ করতেও তারা কার্পণ্য করে না। অথচ বাড়ীর পাশেই মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত সালাত পড়ে আল্লাহর কাছে সমস্যার সমাধান চেয়ে দু'আ করতে যদিও কোন পয়সা লাগে না, তথাপি তারা তা' করতে চায় না। আল্লাহর দয়া, তাঁর রহমতের কথা কস্মিনকালেও তাদের মুখ থেকে বের হয় না, কিন্তু 'খাজা বাবার দু'আ'র কথা ঘুড়িয়ে ফিরিয়ে মুখে লেগেই থাকে। 'খাজা বাবার দু'আয় ভাল আছি,' 'খাজা বাবার দু'আয় অসুখ ভাল হয়েছে' 'বাবার দু'আয় ছেলে হয়েছে' 'বাবার দু'আয় ব্যবসা ভালই চলছে' ইত্যাদি কথাগুলো শুনলে মনে হবে যেন খাজা বাবার দু'আয় তার সব। মুখে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) এর নাম আওড়ালেও তাঁর কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক জীবনাদর্শের কিছুই এসব পীর-মাজার পূজারীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বান্দার ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ সব আল্লাহপাকের ইচ্ছাধীন। মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহপাকের দয়ার অসীলায় বান্দার সকল সমস্যার সমাধান হয়, বান্দা বিপদমুক্ত হয়। এ ব্যাপারে খাজা বাবা বা অন্য কোন পীর বুজুর্গের কোন হাত নেই। সুতরাং একবারও সেই আল্লাহর রহমত ও দয়ার কথা স্মরণ না

করে এভাবে শুধু ‘খাজা বাবার দু’আ’র বুলি আওড়ানো জায়েজ নয়।

১৮.নিজের বা অপরের ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতা নবীজীরও ছিল না

: আল্লাহতা’আলা বলেন:

قُلْ اِنِّى لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا رَشَدًا ۝ قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّ لَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا

বলুন (হে রাসূল), আমি তোমাদের ভাল ও মন্দ করার কিছুমাত্র ক্ষমতা রাখিনা। বলুন- (হে রাসূল) আল্লাহর শক্তি থেকে আমাকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না এবং তাঁর আশ্রয় ছাড়া আমার কোন আশ্রয়ই নেই। (সূরা জিন : ২১-২২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে অনেকবারই বিপদে পড়েছিলেন, কিন্তু সে সমস্ড় বিপদের হাত থেকে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি। ওহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাঁত পর্যন্ড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, যিনি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানব, তিনি নিজেই নিজের বিপদকে কিছু মাত্র দূর করতে পারলেন না। তিনি বুঝতেও পারেন নাই তাঁকে এই যুদ্ধে আহত হতে হবে, কারণ তিনি রাসূল হওয়া সত্ত্বেও একজন মানুষই ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি নিজের জন্যই ভাল ও মন্দের কিছুমাত্র ক্ষমতা না রাখেন, তাহলে অন্যের জন্য তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর যদি তাই হয়, তা হলে পীর ওলী ফকির দরবেশ কি করে অন্যের ভাল ও মন্দে সাহায্য করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খায়বরে কোন এক মহিলা বিষ পান করিয়ে হত্যার চেষ্টা করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে না পেরে সে বিষ পান করে ফেলেন। এমনকি মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্তেও সে বিষের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তিনি নিজের বিপদ নিজে দূর করতে পারেননি এবং আল্লাহতা’আলা তাঁর পবিত্র কালামে তা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন:

قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ

বলুন: (হে রাসূল) আমি আমার নিজের ভাল ও মন্দ করার কিছু মাত্র ক্ষমতা রাখি না। তবে আল্লাহতা’আলা যা ইচ্ছা করেন। (সূরা আ’রাফ : ১৮৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তাঁর বেশ কয়েকজন সন্ড়ান এবং নাতী ইন্ড়েকাল করেন। কন্যাদের মধ্যে হযরত যয়নব (রা:), হযরত র“কাইয়া (রা:) ও হযরত উম্মে কুলসুম (রা:); দুই পুত্র হযরত

আবুল কাশেম (রা:) ও হযরত ইব্রাহীম (রা:), মতান্ড়রে আরো দুই পুত্র হযরত আবু তৈয়ব ও হযরত আবু তাহের; নাতীদের মধ্যে দুজন হযরত র“কাইয়া (রা:)-এর ছেলে আব্দুল্লাহ (রা:) ৬ বছর বয়সে এবং হযরত ফাতেমা (রা:)–এর ছেলে মহসিন (রা:) শৈশবে ইন্ড়েকাল করেন। [সীরাতে মুস্ড়ফা, মাও মুহাম্মাদ ইদ্রিস কান্দলভী (রহ:)] নিজের ছেলে, মেয়ে, নাতীদেরকেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি, আল্লাহর ইচ্ছার বির“দ্ধে তাদেরকে বাঁচাতে পারেননি।

এই সমস্ড় প্রমাণ পাওয়ার পরও যদি কেহ মনে করে পীর ওলী ফকির দরবেশগণ ভাল ও মন্দে আমাদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন এবং এরূপ ধারণা নিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করলে তাকে মুসলমান বলা যাবে না। কেননা এ রকম ধারণার মাধ্যমে বান্দার মধ্যে আল্লাহতা’আলার গুণ আছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

১৯. সাহায্য চাইতে হবে ইবাদতকে ওসিলা করে : আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে, ইবাদতকে ওসিলা করে। বিশেষ করে নামাজকে ওসিলা করে সাহায্য চাইতে হয়। আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নামাজ ও সবর অবলম্বনে সাহায্য চাইবে।

(সূরা বাকারাহ : ১৫৩)

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজকে ওসিলা করে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে–

اِذَا حَزَنَهُ امْرٌ فَفَزِعَ اِلَى الصَّلٰوةِ

যখন কোন জটিল বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে চিন্ড়িত করে তুলত তখন-ই তিনি নামাজে লিপ্ত হয়ে যেতেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) মসজিদে শুয়ে রয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবস্থা দৃষ্টে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরাইরা (রা:)! তোমার কি পেট ব্যথা হচ্ছে নাকি? উত্তরে বললেনঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি পেট ব্যথা অনুভব করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হে আবু হুরাইরা (রা:)! নামাজে দাঁড়াও। কেননা, নামাজের ভেতর চিকিৎসার উপকরণ নিহিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘরে গিয়ে জানতে পারতেন, ঘরে খাবার নেই, তখন ঘরের সবাইকে নামাজে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দিতেন।

২০. রত্ন ও পাথরের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে আকীদা : এক শ্রেণীর ফকীর দরবেশ ও রত্নবিশেষজ্ঞ বলে বেড়ায়-আংটিতে বিশেষ ধরণের রত্ন পাথর লাগিয়ে আঙ্গুলে পরলে অনেক বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকা যায়, জীবনে সফলতা আসে, রোগ ব্যাধি হয় না, ভাগ্যের পরিবর্তন হয় ইত্যাদি। তাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে অনেকেই আঙ্গুলে দুটো তিনটি চারটে বা আরো অধিক সংখ্যায় পাথরযুক্ত আংটি ব্যবহার করেন। এরূপ আংটি ব্যবহার করা জায়েজ নয়। আর মনি, মুক্তা, হীরা, চুন্নি, পান্না, আকীক ইত্যাদি পাথর ও রত্ন মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে, ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে বলে বিশ্বাস করা শিরক। (আপকি মাসায়েল আওর ইনকাহিল-৮/১) ভাগ্য সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাক, যদি বদলায় আল্লাহর ইচ্ছাতেই বদলাবে। কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই।

ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে– হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, সে পিত্তরসের রোগ থেকে বাঁচার জন্য একটা আংটি হাতে পড়ে রেখেছে। তিনি অসন্তোষের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, ওটা কি পরেছো? বলল, রোগ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উদ্দেশ্যে এটা পড়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওটা খুলে ফেল। কেননা ওটা তোমার হাতে পরা থাকলে তোমার বিপদ বাড়িয়েই দেবে... কমাবে না একটুও। আর এটা হাতে রাখা অবস্থায় যদি তুমি মরে যাও তাহলে তুমি কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। (আহমদ)

২১. মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে আকীদা : সিলভা বা অন্য কোন মেথডে মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো এবং সকল সমস্যার সমাধান লাভ করার মাধ্যমে জীবনে সফলতা অর্জন করার এক আধুনিক মতবাদ সাম্প্রতিককালে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং সেন্টার খুলে মন নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে। হতাশাগ্রস্ত মানুষ আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে জীবনে সফলকাম হওয়ার জন্য এসব মন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে ভর্তি হচ্ছে। ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানোর নিয়তে এসব মন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে যাওয়া মোটেই জায়েজ নয়। সমস্যার সমাধান এবং কাজের সফলতা দান করার মালিক একমাত্র আল্লাহ।

২২. গ্রহ-নক্ষত্রের তাছীর সম্পর্কে আকীদা : অনেকের ধারণা-মানুষের ভাল মন্দ, বিপদ-আপদ, উন্নতি-অবনতি ইত্যাদি গ্রহ- নক্ষত্রের তাছীরে হয়। কেউ বিপদে পড়লে বলে শনির প্রভাবে পড়েছে। কারো কোন আনন্দের খবর শুনলে

বলে– মঙ্গলের নজরে আছে। এভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের তাছীর বিশ্বাস করা শিরক। অংংৎড়ষড়মু-এর ধারণা অনুযায়ী গ্রহ-নক্ষত্রের গতি, স্থিতি ও সঞ্চারের প্রভাবে ভবিষ্যত শুভ অশুভ সংঘটিত হয়ে থাকে। নিউমারোলজি বা সংখ্যা জ্যোতিষের উপর নির্ভর করে এই শুভ-অশুভ নির্ণয় তথা ভাগ্য বিচার করা হয়। ইসলামী আকীদা অনুসারে গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে নিজস্ব কোন প্রভাব বা ক্ষমতা নেই। সুতরাং গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে ভাগ্য নির্ধারিত হয় বলে বিশ্বাস রাখা শিরক। (আপকি মাসায়েল আওর ইনকা হল ফতোওয়ায়ে মুলহীম)

এ সম্পর্কে একটি হাদীস আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) এর 'তাকভিয়াতুল ঈমান' কেতাব হতে তুলে দেয়া হল– বুখারী এবং মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করেছেন, জায়েদ ইবনে খালেদ (রা:) বলেছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হোদায়বিয়া নামক স্থানে আমাদেরকে ফজরের নামাজ পড়ালেন। রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছিল। নামাজান্তে তিনি উপস্থিত লোকগণের দিকে মুখ ফিরায়ে বললেন, 'তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহতা'য়ালা কি বলেছেন, তা কি তোমরা জান?'

তারা উত্তরে বলল: 'আল্লাহ এবং তার রাসূলই ভালরূপে জানেন।' তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন যে, আজ আমার কতক বান্দা মুমিন রূপে সজাগ হয়েছে এবং কতক বান্দা কাফির রূপে নিদ্রা ত্যাগ করেছে। যারা বলেছে যে, আল্লাহতাআলার দয়া ও করুণাতে আমরা আজ বৃষ্টি পেয়েছি তারা আমার উপর বিশ্বাস করল এবং গ্রহ নক্ষত্রের ফলাফলকে অস্বীকার করল, এরা মুমিন; এবং যারা বলেছে যে, অমুক গ্রহ নক্ষত্রের ফলে আমরা বৃষ্টি পেয়েছি, তারা আমাকে অস্বীকার করল ও গ্রহ নক্ষত্রকে বিশ্বাস করল। সুতরাং তারা কাফিরের মধ্যে পরিগণিত হবে।' (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ যারা দুনিয়ার ভালমন্দ সমুদয় কারবার আল্লাহর তরফ হতে হওয়া বিশ্বাস করে, আল্লাহতাআলা তাদেরকে নক্ষত্রপূজক কাফিরগণের শ্রেণী হতে বের করে নিজের খাছ বান্দার মধ্যে গণ্য করেন। আর যারা মনে করে যে, জগতের কার্যকলাপ গ্রহ নক্ষত্রের ফলাফলে ঘটে, আল্লাহতা'আলা তাদেরকে নক্ষত্র উপাসক কাফির বলে পরিগণিত করেন।

এই হাদীসের দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, বার, তিথি, সময়ের শুভাশুভ এবং জ্যোতির্বিদগণের কথা বিশ্বাস করা শেরেকীর মধ্যে গণ্য। কারণ গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি নিয়েই জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা করা হয়ে থাকে। আর নক্ষত্র-ফলাফল বিশ্বাসকারীকে আল্লাহতা'আলা নক্ষত্রপূজক কাফির বলেছেন। (তাকভিয়াতুল ঈমান, আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (রহ), অনুবাদক মৌলবী মুহাম্মাদ মনিরুজ্জামান, প্রকাশক - আরীফ পাবলিকেশনস, ১৯৯৭ ইংরেজি, পৃষ্ঠা ৬৮-৭০)

২৩. তারকা খসে পড়া সম্পর্কে আকীদা : একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় একটি তারকা ছিটকে পড়ল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, জাহেলিয়াতের যুগে তোমরা তারকাচ্যুতি সম্পর্কে কি বিশ্বাস পোষণ করতে? লোকজন আরজ করল, আমাদের বিশ্বাস ছিলো যদি কোন বড়লোক মারা যায় অথবা কোন বড়লোক পয়দা হয় তখন তারকা খসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ কারো মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া বা পয়দা হওয়ার জন্য তারকা খসে পড়ে না। (মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলঃ ১ম খঃ ৩১০ পৃঃ)

২৪. চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের প্রভাব সম্পর্কে আকীদা : অনেকের ধারণা-চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ মানুষের ভাল-মন্দ, জন্ম-মৃত্যু, বিপদ আপদের উপর প্রভাব বিস্ড়ার করে। এটা নিছক ভ্রান্ড় ধারণা।

ঘটনাক্রমে হিজরী নবম সালে একদিন সূর্য গ্রহন শুর হয় এবং সেদিনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহেবজাদা হযরত ইব্রাহীম (রা:) মৃত্যুবরণ করেন। পূর্ব ধারণা অনুসারে সাহাবীগণ মনে করলেন, এই মৃত্যু সূর্য গ্রহণ শুর হওয়ার কারণে হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (রা:) এর মৃত্যুর কারণ এটাই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন একথা জানতে পারলেন তখন সকল মুসলমানকে মসজিদে সমবেত হতে নির্দেশ দিলেন এবং একটি দীর্ঘ ভাষণদান করলেন, যাতে এই ধারণার মূলোৎপাটন করা হয়। তিনি বললেনঃ "চন্দ্র গ্রহণ অথবা সূর্য গ্রহণের সাথে কারো জন্ম অথবা মৃত্যুর কোনই সম্পর্ক নেই। চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর একটি নিদর্শন।" (সহীহ বুখারীঃ সালাতুল কুসুফ অধ্যায়)

২৫. কোন সমস্যায় জিন ডাকানো সম্পর্কে আকীদা : কোন কিছু হারিয়ে গেলে, চুরি হলে, কোন বিপদ বা সমস্যায় পড়লে, বিয়েশাদী, চাকরি-বাকরি না হলে, কোন কঠিন রোগে আক্রান্ড় হলে পীর ফকির তদবিরকারককে দিয়ে জিন ডাকানো হয়। জিন একজন নির্দিষ্ট লোকের উপর এসে ভর করে এবং তারই জবানে কথাবার্তা বলে। অনেক সময় পীর ফকিররা জিনের কাছ থেকে জেনে নিয়ে সমাধান পেশ করে। সরাসরি জিন ডাকা হলে উপস্থিত লোকজন তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা জিনকে জানাতে থাকে। জিনের কাছে হারানো বস্তুর সন্ধান চায়, চোরের নাম জানতে চায়, রোগের কারণ ও প্রতিকার জানতে চায়, বিপদ হতে মুক্তির জন্য ফরিয়াদ করে; বিয়েশাদী, চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা করে দিতে বলে। জিনের থেকে তাবীজ, পানি পড়া নেয়। কেউ আবার জিনের কাছে মিষ্টি খেতে চায়... ইত্যাদি। বিভিন্ন সমস্যায় এভাবে জিন ডাকানো উচিত নয়। আর জিনের কাছে এভাবে গায়েবী সাহায্য চাওয়া শিরক।

২৬. ভারী জিনিসপত্র ওঠাতে 'ইয়া আলী' বলা : কোন বেশি ওজনের মাল উঠালে অনেকে 'ইয়া আলী' বলে চিৎকার করে অর্থাৎ হযরত আলী (রা:) খুব শক্তিশালী ছিলেন, তাই তারা 'ইয়া আলী' শব্দ দ্বারা যেন শক্তির সাহায্য হযরত আলীর কাছেই কামনা করে। যারা এই ধরনের শব্দ বলে তারাও যে শিরকে লিপ্ত হয়ে গেল এতে কোনই সন্দেহ নেই। যদি 'ইয়া আলী' না বলে 'ইয়া আল্লাহ' বলে শক্তি ও সাহায্যের কামনা আল্লাহপাকের কাছে করে, তাহলে কতইনা সুন্দর হয়!

ঝাড়ফুঁক পানি পড়া সম্পর্কে আকীদা

বিপদে-আপদে, রোগে-শোকে, পরীক্ষায় পাশ, চাকুরীতে উন্নতি ইত্যাদি হাজারো সমস্যার জন্যে আমরা অহরহ পীর, ওলী, বুজুর্গ, আলেমদের কাছ থেকে ঝাড়ফুঁক ও পানি পড়া গ্রহণ করে থাকি। ঝাড়ফুঁকের ব্যাপারে ইসলামের হুকুমকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম প্রকার : জায়েজ ঝাড়ফুঁক

ঐ পর্যায়ের দু'আ কালাম যেগুলো শিরক মুক্ত হয়, যেমন কুরআন মাজীদের কোন আয়াত অথবা আল্লাহপাকের জাতিবাচক বা গুণবাচক নামসমূহ পাঠ করে অথবা নবীজীর শেখানো দু'আ পড়ে ঝাড়ফুঁক করা, এগুলো সম্পূর্ণ বৈধ। কেননা স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং ঝাড়ফুঁক করার জন্য হুকুমও দিয়েছেন। আর উহাকে অনুমোদনও করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন যাদু করা হয় তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশে সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়েছিলেন। কোন দু'আ পড়লে কোন রোগের উপকার হয়, কোন বিপদ-আপদ হতে মুক্তি পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আউফ ইবনে মালিক (রা:) বলেন যে, আমরা বর্বরতার যুগে অর্থাৎ জাহেলী জামানায় ঝাড়ফুঁক করতাম। একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম যে, হুজুর! আপনি আমাদের ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে কি মন্ড়ব্য করেন? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, তোমরা তোমাদের দু'আ কালাম গুলিকে আমার সম্মুখে পাঠ কর। দু'আ কালামগুলো যদি শিরক মুক্ত হয় তবে উহা প্রয়োগ করতে কোন অসুবিধা নেই। (মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস)

ঝাড়ফুঁক করার পদ্ধতি হল দু'আ পাঠ করার পর রোগীর শরীরে ফুঁক দেয়া অথবা পানির মধ্যে ফুঁক দেয়ার পর ঐ পানি রোগীকে সেবন করানো। হযরত সাহিব ইবনে ক্বাইছ (রা:) হতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, হুজুরে আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুত্বহান নামীয় স্থান থেকে কিছু মাটি নিয়ে সেগুলিকে একটি পাত্রের মধ্যে রাখেন। অত:পর সেগুলোর সাথে পানি মিশ্রণ করে ফুৎকার দেন এবং ফুৎকারকৃত পানি রোগাক্রান্ড় ব্যক্তির শরীরে প্রবাহিত করে দেন।

দ্বিতীয় প্রকার : শিরকযুক্ত ঝাড়ফুঁক

ঐ সমস্ত দু'আ কালাম পড়ে ঝাড়ফুঁক করা যেগুলো শিরকযুক্ত অর্থাৎ ঐ সমস্ত যেগুলোর মধ্যে গায়রুল্লাহর নামে বা গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয় কিংবা গায়রুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়, ফরিয়াদ করা হয়। যেমন–জিন সম্প্রদায়ের নামে, ফেরেশতাগণের নামে অথবা নবী আউলিয়াগণের নামে দু'আ কালাম পড়া।

যেহেতু এইগুলোর মধ্যে গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয় এ জন্য নিঃসন্দেহে এগুলো বড় বা উচ্চ পর্যায়ের শিরক। আর আরবী ভাষা কিংবা অর্থবোধক আরবী না হলে উক্ত দু'আ কালামে অজ্ঞাতসারে কুফরীযুক্ত বা শিরকযুক্ত বাক্যের অনুপ্রবেশের আশংকা থাকার কারণে এ পর্যায়ের দু'আ কালাম ব্যবহার করাকেও শরীয়তে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

অনেকে পীরের গোসল করা বা পা ধোয়া পানি, কুলি করা পানি ও পানের পিক, কবর ধোয়া পানি ইত্যাদি নেক আশা পূরণের নিয়তে পান করে। এটা জায়েজ নয়।

তাবীজ-কবজ ও সুতা বাঁধা সম্পর্কে আকীদা

১. তাবীজ-কবজ ও সুতা বাধা সুন্নাতসম্মত নয় : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ও তার সাহাবীগণ কখনও কাউকে তাবীজ-কবজ বা রশি/সুতা ব্যবহার করতে দিয়েছেন বলে কোনো সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। দেহে তাবীজ থাকার কারণে তিনি একজনের বাইআত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তিনি নিজ হাতে লোকটির তাবীজটি ছিড়ে ফেলেন, অত:পর তার বাইআত গ্রহণ করেন এবং বলেন : "যে তাবীজ ঝুলালো সে শিরক করলো।" (আহমাদ, আল মুসনাদ ৪/১৫৬) তিনি বলেছেন : "যদি কেউ দেহে (তাবীজ জাতীয়) কোনো কিছু লটকায় তবে তাকে উক্ত তাবীজের উপরেই ছেড়ে দেয়া হয়।" (আহমাদ, আল মুসনাদ, ৪/৩১০) সাহাবী হুযাইফা (রা:) একজন অসুস্থ মানুষকে দেখতে যান। তিনি লোকটির বাহুতে একটি রশি দেখতে পান। তিনি রশিটি কেটে দেন বা টেনে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন : "অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং তারা শিরকে লিপ্ত থাকে (সূরা ইউসুফ : ১০৬ আয়াত)।" (ইবনু

কাসীর, তাফসীর ২/৪৯৫)

বিভিন্ন জীবজন্তুর চামড়া, হাড্ডি, চর্বি, মাছের আইস, গাছের ডাল, মূল, বিচি, কড়া-বেড়ি, আংটি, তাগা, সুতা, লোহা, পেরেক, পীর, শয়তান বা জিনদের নাম, কুফরী কালাম, হিন্দুদের বিভিন্ন মন্ত্র ও শ্লোক, মাদুলী, বিভিন্ন যাদুকরী বাজীকরী বস্তুসমূহ ইত্যাদি হাজারো জিনিস আজকাল তাবীজ-কবজ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং মনে করা হচ্ছে– এগুলো বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে। এসব তাবীজ-কবজ ব্যবহার করা স্পষ্ট হারাম এবং শিরকের পর্যায়ভুক্ত। একদল কবর পূজারী মাজারের মাটি নেক আশা পূরণের নিয়তে গায়ে রাখে, মাদুলীতে ভরে গলায় বাঁধে। এটা স্পষ্ট হারাম। অনেকে আজমীর গেলে সেখান থেকে লাল-হলুদে মেশানো রং বেরং-এর দড়ি নিয়ে আসে এবং নেক আশা পূরণের নিয়তে গলায় বা হাতে বাঁধে। এটাতো হিন্দুদের পৈতা বাঁধার সাথে তুলনীয়।

২. জ্বরের জন্যে সুতা বাঁধা : হযরত হুযায়ফা (রা:) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, জ্বরের তীব্রতার কারণে তাবিজ স্বরূপ একটি সুতা হাতে বেঁধে রেখেছে। তখন তিনি তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন :

وَ مَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللهِ اِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُوْنَ

তারা অধিকাংশ লোকই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি, বরং তারা মুশরিক।

৩. অসুখে গলায় তাগা ঝুলানো : হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা:) ঘরের মধ্যে গিয়ে তার স্ত্রীর গলায় একটা তাগা ঝুলতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করায় স্ত্রী জবাবে বললেন : এটা অমুক অসুখের টোটকা চিকিৎসার জন্য গলায় বেঁধেছি। তিনি সেটি ধরে এতো শক্তভাবে টান দিলেন যে, তাগাটি ছিঁড়ে গেল। নতুবা তাঁর স্ত্রীই উপুড় হয়ে পড়ে গিয়ে আঘাত পেতেন। তিনি বললেন–

আবদুল্লাহ্র বংশের লোকেরা শিরক করা থেকে বিমুখ হয়ে গেছে, যে বিষয়ে আল্লাহ কোন দলিল নাযিল করেন নি। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি :

তাবীজ-তুমার, কবজ, তাওলা ইত্যাদি সব শিরক। লোকেরা জিজ্ঞেস করল : 'তাওলা' কাকে বলে? তিনি বললেন, তা এমন একটা তদবীর ও আমল যা মেয়ে লোকেরা স্বামীদের বেশি ভালবাসা পাওয়ার জন্যে ব্যবহার করে। সহজ কথায় 'তাওলা'ও এক প্রকার যাদু। (ইবনে হিব্বান, হাকেম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) তাঁর স্ত্রীকে জাহিলিয়াতের এসব মন্তর ও তাবীজ ব্যবহার করতে নিষেধ করার জবাবে স্ত্রী একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। বললেন : আমি একদিন বাইরে বের হলাম, তখন অমুক ব্যক্তি আমাকে দেখে ফেললো। আমার দুই চোখ থেকে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করল। পরে আমি মন্ত্র পড়লে চোখের পানি বন্ধ হয়ে গেল। মন্ত্র পড়া বন্ধ করলে আবার ফরফর বেগে

পানি পড়তে শুরু করে। ইবনে মাসউদ বললেন :

'ও হচ্ছে শয়তান। তুমি যখন ওকে মেনে নাও, তখন সে তোমাকে ছেড়ে দেয়। আর তুমি যখন তার অবাধ্যতা কর তখন সে তার অঙ্গুলী দিয়ে তোমার চোখে খোঁচা দেয়। কিন্তু তুমি যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করতেন তাই কর তাহলে তা তোমার জন্যে খুবই ভাল এবং সম্ভবত তুমি নিরাময়তাও লাভ করতে পারবে। তা হচ্ছে নিজের চোখে পানি দাও এবং বল– 'হে মানুষের প্রতিপালক! আমার এই অসুখ দূর করে দিন। আপনিই একমাত্র নিরাময়কারী। আপনার নিরাময় ছাড়া আর কোন নিরাময় হতে পারে না। আমাকে শেফা দান করুন, যেন কোন রোগ না হয়।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

৪. পিতলের মাদুলী : ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির বাহুতে পিতলের মাদুলি বা কবজ বাঁধা দেখতে পেলেন। বললেন : তোমার জন্যে আফসোস! তুমি ওটা কি বেঁধে রেখেছ? বলল : এটা দুর্বলতা দূর করার উদ্দেশ্যে বেঁধেছি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ওটা তোমার দুর্বলতা অধিক বৃদ্ধি করবে, ওটা ফেলে দাও। নতুবা ওটা বাধা অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে কস্মিনকালেও তুমি কল্যাণ পেতে পারবে না। (আহমদ, ইবনে হিব্বান)

৫. জিনের উপদ্রব হতে রক্ষার জন্যে খুর বা হাতিয়ার রাখা : তৎকালে আরবের লোকেরা দুগ্ধ পোষ্য বাচ্চাদের মাথার কাছে খুর অথবা হাতিয়ার রেখে দিত, যেন জিন তাদের উপর চড়াও হতে না পারে। একবার হযরত আয়েশা (রা:) এসব দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সকল কাজ না পছন্দ করতেন। (আদাবুল মোফরাদ : ১৮০ পৃঃ)

৬. বদনযর ও বাতাস লাগা সম্পর্কে আকীদা : হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নযর লাগার বিষয়টি সত্য। জান-মাল ইত্যাদির প্রতি বদনযর লেগে তার ক্ষতি সাধন হতে পারে। আপনজনের প্রতিও আপনজনের বদনযর লাগতে পারে, এমনকি সন্তানের প্রতি মাতা-পিতারও বদনযর লাগতে পারে। আর বাতাস লাগার অর্থ যদি হয় জিন ভূতের বাতাস অর্থাৎ, তাদের খারাপ বা খারাপ আছর লাগা, তাহলে এটাও সত্য; কেননা জিন ভূত মানুষের উপর আছর করতে সক্ষম।

কারও উপর কারও বদনযর লেগে গেলে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়লে বা পড়ে ফুঁক দিলে ইনশা-আল্লাহ খোদা চাহেতো ভাল হয়ে যাবে। বদনযর থেকে হেফাযতের জন্য কাল সুতা বাঁধা বা কালি কিংবা কাজলের টিপ লাগানো ভিত্তিহীন ও কুসংস্কার।

৭. কুনজর বা বদনজর থেকে বাঁচার জন্যে তাবীজ কবজ : জাহিলিয়াতের একটি রেওয়াজ ছিল, ভাল ভাল উটকে লোকদের নজরের দোষ থেকে বাঁচার জন্যে উটের গলায় কালাদাহ ঝুলিয়ে রাখত। হযরত আবু বুশাইর-কাইম ইবনে উবাইদ (রা:) বলেন, একবার বিদেশ যাত্রাকালে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রার পূর্বেই একজন লোক পাঠিয়ে দিলেন এ বলে :

لَا يَبْقِيَنَّ فِىْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍقَلَادَةَ مِنْ وُتْرٍ اَوْ قَلَادَةَ اِلَّا قُطِعَتْ

কোন উটের গলায় যেন কালাদাহ বাঁধা না থাকে। থাকলে যেন তা ছিঁড়ে ফেলা হয়।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় ক্ষেত খামারকে কুনজর থেকে রক্ষার জন্য কালিকরা হাড়ি বাঁধা উচিত নয়।

ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اَنَّ الرِّقٰى وَ التَّمَائِمُ وَ التَّوْلَةُ شِرْكٌ

তাবিজ তুমার ও নির্ভরতার জিনিসপত্রগুলো ব্যবহার স্পষ্ট শিরক।

এ হাদীসের শব্দ তিনটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। (تَمَائِمُ) হচ্ছে এমন জিনিস, যা শিশু সন্ড়ানের গলায় বা হাতে লোকদের কুনজর থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে বাঁধা হয়। আর (رِقٰى) হচ্ছে লোকদের কুনজর বা কোন রোগ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে বাঁধা হয়। আর (تَوْلَةُ) হচ্ছে এমন কিছু তদবির করা যার দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা বৃদ্ধি পায় বলে মনে করা হয়। এ সব কয়টি কাজই উপরোক্ত হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণানুযায়ী পরিষ্কার শিরক।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়- আমাদের দেশের মেয়েরা বাচ্চাদের কুনজর থেকে বাঁচানোর জন্যে যে কপালে কাজলের টিপ দেয় তা ঠিক নয়।

কুরআন-হাদীসের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় -নজর লাগার বিষয়টি সত্য। তবে কুনজর আল্লাহপাকের হুকুমে মানুষের উপর প্রভাব ফেলে।

শুভ-অশুভ, অযাত্রা-অমঙ্গল ও সুলক্ষণ-কুলক্ষণ গ্রহণ সম্পর্কে আকীদা

১. বিভিন্ন প্রচলিত ইসলামী গ্রন্থে এবং আমাদের সমাজের সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, অমুক দিন, বার, তিথি, সময় বা মাস

অশুভ, অযাত্রা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মনে করা হয়, বিভিন্ন কাজের অশুভ ফল রয়েছে এবং এ সকল কাজের কারণে মানুষ দরিদ্র হয় বা মানুষের ক্ষতি হয়। এই বিশ্বাস বা ধারণা শুধু ইসলাম বিরোধী কুসংস্কারই নয়; উপরন্তু এইরূপ বিশ্বাসের ফলে ঈমান নষ্ট হয় বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশুভ, অযাত্রা, অমঙ্গল ইত্যাদি বিশ্বাস করতে এবং যে কোনো বিষয়ে আগাম হতাশা এবং নৈরাশ্যবাদ অত্যন্ড় অপছন্দ করতেন। পক্ষান্ড়রে তিনি সকল কাজে সকল অবস্থাতে শুভ চিন্ড়া, মঙ্গল-ধারণা ও ভাল আশা করা পছন্দ করতেন। শুভ চিন্ড়া ও ভাল আশার অর্থ হলো আল্লাহর রহমতের আশা অব্যাহত রাখা। আর অশুভ ও অমঙ্গল চিন্ড়ার অর্থ হলো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ ، اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ ، اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ ،

"অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শিরক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা শিরক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শিরক।"

৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুলক্ষণ গ্রহণকে গণকদারী ও যাদুক্রিয়ার সাথে একই সূত্রে গেঁথেছেন। তিনি বলেছেন : যে লোক নিজে কুলক্ষণ গ্রহণ করবে বা যার জন্যে কুলক্ষণ গ্রহণ করা হবে বা গণনা করা হবে কিংবা যাদু করবে বা যার জন্যে যাদু করা হবে সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়। (তাবরানী)

৪. তিনি আরো বলেছেন : রমল, পাখীর উড়ানো কুলক্ষণ গ্রহণ ও পাথরকুচি নিক্ষেপ করে খারাপ লক্ষণ গ্রহণ-এ সবই কুসংস্কার বিশ্বাসের অন্ড়র্ভুক্ত।
(আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান)

৫. হাদীস শরীফে আছে– সা'দ ইবনে মালেকের নিকট থেকে আবু দাউদ (রহ:) এভাবে বর্ণনা করেছেন, জনাব রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, 'হামমা' কিছু নেই, রোগের সংক্রামকতা কিছু নেই, কুলক্ষণ বিশিষ্টও কিছু নেই।' (মিশকাত, বাবুল ফাল অ-ত্বায়রাহ)

৬. আরবের মুর্খদের মধ্যে এই কুসংস্কার প্রচলিত ছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি অপরের দ্বারা নিহত হয় আর তার প্রতিশোধ না নেয়া হয়, তা হলে ঐ নিহত ব্যক্তির মাথার খুলির ভেতর থেকে একটি পেচক বের হয়ে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়ায়। এই পেচকের নাম 'হামমা'। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

৭. এরূপ কারও কোন অসুখ হলেই যে তা অপরকে নিশ্চয়ই আক্রমণ করবে, এ ধারণাও ভ্রান্ড়। কোন বস্তুর কোন চিহ্ন বা সঙ্কেত দেখে বা শুনে তা কুলক্ষণ বলে বিশ্বাস করাও ভুল ধারণা মাত্র। মুসলমান হয়ে কখনই এরূপ বিশ্বাস পোষণ করা উচিত নয়। কারণ তা শেরেকী; সুতরাং ঈমানের পরিপন্থী।

৮. 'ইমাম বুখারী (রহ.) আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণনা করেছেন, জনাব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, 'ব্যধির সংক্রামকতা, নিহত ব্যক্তির মাথার খুলি হতে যচিকের উৎপত্তি হওয়া এবং 'সফর' কিছুই নয়।' (মিশকাত, বাবুল ফাল)

৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাও বলেছেন যে, "নতুন বৃষ্টিতে কিছুই নেই।" অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণের মাঝে কোনই বিশেষত্ব নেই। (আবু দাউদ: ইবনে মাজাহ) অনুরূপভাবে তিনি মরভূমির প্রতারণা সম্পর্কে বলেছেন: "এসব কিছুই না।" (আবু দাউদ)

১০. তৎকালে আরববাসীরা মনে করতো যদি কোন সাপ মারা হয় তাহলে এর জোড়া এসে মানুষকে হালাক করে দেয়। নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধারণা বাতিল বলে ঘোষণা করেন।

১১. কুলক্ষণ গ্রহণ কোন জ্ঞান-বুদ্ধির উপর ভিত্তিশীল নয়। এর সাথে বাস্ড়বতারও কোন সম্পর্ক নেই। এটা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, চিন্ড়াশক্তি ও মানসিক দুর্বলতার ফসল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন-মানসিকতার কারণেই মানুষের লক্ষণ– তা অশুভ হোক বা শুভ হোক তা' দ্বারা চালিত হতে প্রস্তুত হয়ে থাক। নতুবা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে, কোন নির্দিষ্ট স্থানকে কিংবা গ্রহ তারকার কোন কক্ষে প্রবেশ করাকে কুলক্ষণের প্রতীক মনে করার কি অর্থ থাকতে পারে? কোন পাখীর আওয়াজ শুনলেই যাত্রা অশুভ হয়ে যাবে কিংবা চোখের পাতার কম্পনে ভাল বা মন্দ নিহিত থাকবে অথবা কোন বিশেষ শব্দ শুনলেই সমস্ড় সংকল্প নড়বড়ে হয়ে যাবে, এমন কথার সাথে সুস্থ বিবেক বুদ্ধির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

১২. আসলে মানুষের ভিতরে স্বভাবগতভাবে নিহিত দুর্বলতার দরনই কোন কোন জিনিস থেকে 'লক্ষণ' গ্রহণ করে। অতএব বুদ্ধিমান সচেতন মানুষের কর্তব্য কোনরূপ দুর্বলতার কাছে মাথা নত না করা। একটি মরফু হাদীসে বলা হয়েছে।

তিনটি জিনিস এমন রয়েছে, যা থেকে খুব কম লোকই রক্ষা পেতে পারে। তা হচ্ছে কুধারণা, কুলক্ষণ গ্রহণ এবং হিংসা। অতএব তোমার মনে যদি কুধারণা জাগে, তাহলে তুমি তাতে প্রত্যয় নিও না, কুলক্ষণ যদি তোমার মনে দ্বিধার সৃষ্টি করে, তাহলে মাঝপথ থেকে ফিরে যেও না। আর যদি হিংসার উদ্রেগ হয়, তাহলে

তুমি তেমনটা চাইবে না। (তাবরানী)

রাসূলের শেখানো এই পদ্ধতির অনুসরণ করা হলে এ তিনটি মনের পটেই জেগে ওঠা ভিত্তিহীন চিন্তার কল্পনা ও শয়তানের ওয়াসওয়াসা ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। এবং বাস্তব কাজের উপর তার কোন প্রভাব প্রতিফলিত হবে না। এরূপ অবস্থায় আল্লাহতা'আলা এসব ক্ষমা করে দেবেন।

১৩. ইবনে মাসউদ (রা:) বলেছেন: আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে কুলক্ষণ সংক্রান্ত চিন্তার উদ্রেক হয় না। কিন্তু আল্লাহর উপর নির্ভরতা গ্রহণ করলে এ ধরণের ভাবধারা সবই নিঃশেষ হয়ে যায়। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

১৪. আল্লাহ যা কিছু নিষিদ্ধ করেছেন তাই অমঙ্গলের কারণ । বান্দার অমঙ্গল ও ক্ষতির কারণ বলেই তো আল্লাহ বান্দার জন্য তা নিষিদ্ধ করেছেন। এ সকল কর্মে লিপ্ত হলে মানুষ আল্লাহর রহমত ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয়। আল্লাহর নিষিদ্ধ হারাম দুই প্রকারের : (১) হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক্ক সম্পর্কিত হারাম ও (২) হক্কুল ইবাদ বা সৃষ্টির অধিকার সম্পর্কিত হারাম। দ্বিতীয় প্রকারের হারামের জন্য মানুষকে আখেরাতের শাস্তি ছাড়াও দুনিয়াতে পার্থিব ক্ষতির মাধ্যমে শাস্তি পেতে হবে বলে বিভিন্ন হাদীসের আলোকে জানা যায়। জুলুম করে কারো সম্পদ তার ইচ্ছার বাইরে চাঁদাবাজি, যৌতুক বা অন্য কোনো মাধ্যমে গ্রহণ করা, ওজন, পরিমাপ বা মাপে কম দেওয়া, পিতামাতা, স্ত্রী, প্রতিবেশী, দরিদ্র, অনাথ, আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কোনো মানুষের অধিকার নষ্ট করা, কাউকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা, আল্লাহর কোনো সৃষ্টির বা মানুষের ক্ষতি করা অর্থাৎ 'হক্কুল ইবাদ' নষ্ট করা পার্থিব অবনতির কারণ।

১৫. কিন্তু আল্লাহর কোনো সৃষ্টির মধ্যে, কোনো বার, তারিখ, তিথি, দিক ইত্যাদির মধ্যে অথবা কোনো মোবাহ কাজের মধ্যে কোনো অশুভ প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করা কঠিন অন্যায় ও ঈমান বিরোধী। আমাদের সমাজে এ জাতীয় অনেক কথা প্রচলিত আছে। এ গুলিকে সবসময় হাদীস বলে বলা হয় না। কিন্তু পাঠক সাধারণভাবে মনে করেন যে, এগুলি নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা। তা না হলে কিভাবে আমরা জানলাম যে, এতে মঙ্গল হয় এবং এতে অমঙ্গল হয়? এগুলি বিশ্বাস করা ঈমান বিরোধী। আর এগুলিকে আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী মনে করা অতিরিক্ত আরেকটি কঠিন অন্যায়।

১৬. শরীয়তের আকীদা বিরুদ্ধ কয়েকটি লক্ষণ ও কুলক্ষণের তালিকা:

(১) হাতের তালু চুলকালে অর্থ কড়ি আসবে মনে করা। (২) চোখ লাফালে বিপদ আসবে মনে করা। (৩) কুকুর কাঁদলে রোগ বা মহামারী আসবে মনে করা। (৪) এক চিরনিতে দু'জন চুল আঁচড়ালে উক্ত দু'জনের মধ্যে ঝগড়া লাগবে মনে করা। (৫) কোন বিশেষ পাখি ডাকলে মেহমান আসবে মনে করা। (৬) যাত্রা পথে পেছন থেকে কেউ ডাকলে যাত্রা অশুভ হবে মনে করা। (৭) যাত্রা পথে হোঁচট খেলে বা মেখর দেখলে, কালো বা খালি কলসি দেখলে, কাক বা অন্য কিছু ডাকলে, কিম্বা বিড়াল দেখলে কুলক্ষণ মনে করা। নেছাবুল এহতেসার কিতাবে আছে, কোন ব্যক্তি সফরের ইচ্ছায় ঘর হতে বের হলো, তারপর কাকের ডাক শুনে সফর বাদ দিলে বুজুর্গদের মতে সে ব্যক্তি কুফর করলো। (মোজালেসুল আবরার পৃঃ ২৪৮ মজ: ৩৯) (৮) যাত্রার মুহূর্তে কেউ তার সামনে হাঁচি দিলে কাজ হবে না– এরূপ বিশ্বাস করা। (৯) পেঁচা ডাকলে ঘর বাড়ি বিরান হয়ে যাবে মনে করা। (১০) জিহ্বায় বা ঠোঁটে কামড় লাগলে কেউ তাকে গালি দিচ্ছে বা স্মরণ করছে মনে করা। (১১) চড়ুই পাখিকে বালুতে গোসল করতে দেখলে বৃষ্টি হবে মনে করা। (১২) দোকান খোলার পর প্রথমেই বাকি দিলে সারা দিন বাকি বা ফাঁকি যাবে মনে করা। (১৩) কোন লোকের আলোচনা চলছে, ইত্যবসরে বা কিছুক্ষণ পরে সে এসে পড়লে এটাকে তার দীর্ঘজীবি হওয়ার লক্ষণ মনে করা। (১৪) কোন ঘরে মাকড়সার জাল বেশি হলে উক্ত ঘরের মালিক ঋণগ্রস্থ হয়ে যাবে মনে করা। (১৫) আসরের পর ঘরে ঝাড়ু দেয়াকে খারাপ মনে করা। (১৬) ঝাড়ু দ্বারা বিছান পরিষ্কার করলে ঘর উজার হয়ে যাবে মনে করা। (১৭) কোন বাড়িতে বাচ্চা মারা গেলে সে বাড়িতে গেলে নিজের বাচ্চাও মারা যাবে মনে করা। (১৮) ঝাড়ুর আঘাত লাগলে শরীর শুকিয়ে যাবে মনে করা। (১৯) কোন প্রাণী বা কোন প্রাণীর ডাককে শুভ বা অশুভ মনে করা। (২০) শিয়াল বা খাটাশের ডাক শুনে বাজারে দর কম বেশি হয় মনে করা। (২১) কোথাও যাওয়ার সময় ঐসব পশু ডান হতে বাম দিকে গেলে যাত্রা নাস্তি, আর বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে যাত্রা ভাল হবে বলে মনে করা। (২২) গভীর রাতে পেঁচা বা ভর দুপুরে কাক ডাকলে বিপদের আশংকা করা। (২৩) টিকটিকি ডাকলে 'ঠিক ঠিক' বলা অথবা 'সত্য সত্য' বলে মাটিতে টোকা দেয়া। (২৪) চিরুনী মাটিতে পড়লে বা বিড়ালের মুখ মোছা দেখলে অতিথি আসবে বলে মনে করা। (২৫) ঝাড়ু উল্টো করে রাখা ঠিক নয় বলে ধারণা করা। (২৬) সরাসরি চুলার থেকে খেলে বা ঘরের দরজায় বসে খেলে বরকত নষ্ট হবে বলে ধারণা করা। (২৭) জোড়া কলা খেলে জোড়া বাচ্চা হবে মনে করা। (২৮) ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখলে মনে শয়তানি

বুদ্ধির উদ্রেগ হয় বলে মনে করা। (২৯) ভাঙ্গা চিরুনী দ্বারা মাথা আঁচড়ালে বুদ্ধি লোপ পায় বলে ধারণা করা। (৩০) সন্ধ্যার আগে উঠান ও ঘর ঝাড়ু না দিলে সংসারে সব সময় দেনা লেগেই থাকে বলে বিশ্বাস করা। (৩১) ভাঙ্গা হাড়িতে রান্না করলে এবং ভাঙ্গা বাসনে খানা খেলে তাড়াতাড়ি সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে বলে ধারণা করা। (৩২) রাতের বেলা ঘর হতে বাইরে কুলি ফেললে কিংবা কোন উচ্ছিষ্ট বা এঁটো পানি নিক্ষেপ করলে ঘর ভিটা শূন্য হয়ে যায় বলে মনে করা। (৩৩) ঘরের বেড়ায় কিংবা দরজার সামনে পানের পিক ফেললে ঘরে অলক্ষী এসে বাসা বাঁধে বলে ধারণা করা। (৩৪) ঘরের বেড়া বা খুঁটিতে কিংবা কোন গাছে পান খাওয়ার চুন মুছলে ঘরে অশান্তি আসবে বলে বিশ্বাস করা। (৩৫) গোসল করে ভিজা কাপড় নিংড়ানো পানি পায়ে ফেললে অকালে স্ত্রী মারা যাবে বলে ধারণা করা। (৩৬) মাথার বালিশ পা দিয়ে সরালে বুদ্ধি বিগড়ে যায় বলে মনে করা। (৩৭) ভাঙ্গা ছাতা ব্যবহার করলে বিবেক লোপ পায়, গামছা বা গেঞ্জি সেলাই করে ব্যবহার করলে সম্মান নষ্ট হবে বলে ধারণা করা। (৩৮) সূর্যোদয়ের পূর্বে গৃহবধু গাত্রোত্থানপূর্বক ঘরবাড়ী ঝাড়ু দিয়ে ও বাসি হাড়ি বাসন পরিষ্কার করে ঘরে পানি ছিটিয়ে দিলে ঘরে ভাগ্য লক্ষীর আগমন ঘটে বলে বিশ্বাস করা। (৩৯) সন্ধ্যার সময় ঢেকিতে ধান ভাঙ্গলে গৃহের শান্তি চলে যায়, শিকায় ভাতের হাড়ি পাতিল ঝুঁলিয়ে রাখলে সংসারে ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকে বলে ধারণা করা। (৪০) পানির কলসী ঢেকে না রাখলে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মুহাব্বত চলে যায় বলে বিশ্বাস করা। (৪১) ঘর ঝাড়ু দিয়ে ঘরের দরজায় ময়লা ফেললে, ঘরের দরজায় কুলি ফেললে বরকত কমে যায় ও সংসারে বিশৃংখলা হয় বলে ধারণা করা। (৪২) ভোঁতা দা, কাস্তে ও যন্ত্রপাতি দ্বারা কাজ করলে সব সময় ঋণ লেগে থাকে বলে মনে করা। (৪৩) গরু হাঁচি দেয়ার সময় যাত্রা করলে নির্ঘাত মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা থাকে বলে বিশ্বাস করা। (৪৪) মাতাপিতা ঘুমন্ত ছেলে মেয়ের বিছানায় বসে খাদ্য খেলে সন্তানের অমঙ্গল হয় বলে মনে করা। (৪৫) গালে হাত দিয়ে বসলে অলক্ষী আসে বলে ধারণা করা। (৪৬) জামা কাপড় গায়ে পরা অবস্থায় সেলাই করলে টাকা খোয়া যাবে বলে মনে করা। (৪৭) বড় গ্রাসে খানা খেলে লক্ষী ভয় পেয়ে যায় বলে ধারণা করা। (৪৮) ঘরের চালা হতে খড় নিয়ে খেলাল করলে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করা। (৪৯) ঘুমন্ত ছেলে মেয়ে কোলে নিয়ে খানা খেলে অকালে সন্তান মারা যায় বলে ধারণা করা। (৫০) শনিবার ঝাটা বাঁধলে সংসারে অমঙ্গল ঘটে, কুলায় লাথি মারলে ক্ষেতের ফসল কমে যায়, রাতে হাত পায়ের আঙ্গুল ফুটালে দুর্ভাবনায় পড়তে হয় বলে বিশ্বাস করা। (৫১) মেয়েদের নাক ফুল

হারালে স্বামীর অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করা। (৫২) শনিবার, মঙ্গলবার, অমাবস্যা, পূর্নিমা, কোনো তিথি, স্থান বা সময়কে অমঙ্গল অযাত্রা বা অশুভ বলে বিশ্বাস করা জঘন্য মিথ্যা ও ঘোরতর ইসলাম বিরোধী বিশ্বাস। অমুক দিনে বাঁশ কাটা যাবে না, চুল কাটা যাবে না, অমুক দিনে অমুক কাজ করতে নেই ইত্যাদি সবই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কুসংস্কার। এগুলি বিশ্বাস করলে শিরকের গোনাহ হবে। (৫৩) চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, রংধনু, ধুমকেতু ইত্যাদি প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলি বিশেষ কোন ভাল বা খারাপ প্রভাব রেখে যায় বলে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও মিথ্যা কথা। অমুক চাঁদে গ্রহণ হলে অমুক হয়, বা অমুক সময়ে রংধনু দেখা দিলে অমুক ফল হয়, এই ধরনের কথাগুলি বানোয়াট। (৫৪) বুধবারকে বা মাসের শেষ বুধবারকে অমঙ্গল, অশুভ, অযাত্রা বা খারাপ বলে বিশ্বাস করা কঠিন অন্যায় ও মহাপাপ। বুধবারের নিন্দায় কয়েকটি বানোয়াট হাদীস প্রচলিত আছে। এগুলি সবই মিথ্যা। আল্লাহর সৃষ্ট দিন, মাস, তিথি সবই ভাল। এর মধ্যে কোন কোন দিন বা সময় বেশি ভাল। যেমন শুক্রবার, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেশি বরকতময়। তবে অমঙ্গল , অশুভ বা অযাত্রা বলে কিছু নেই।

বিভিন্ন প্রচলিত পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিম্নের কাজগুলি অশুভ, খারাপ ফলদায়ক বা দারিদ্র আনয়নকারী :

(৫৫) হাঁটতে হাঁটতে ও অযু ব্যতীত দরূদ শরীফ পাঠ করা। (৫৬) বিনা ওযুতে কুরআন কারীম কিংবা কুরআনের কোনো আয়াত পাঠ করা। এই কথা দুইটি একদিকে যেমন ইসলাম বিরোধী বানোয়াট কথা, অপরদিকে এই কথার মাধ্যমে মুমিনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত থেকে বিরত রাখা হয়। গোসল ফরয থাকলে কুরআন পাঠ করা যায় না। ওযু ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত জায়েজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ ওযু ছাড়াও মুখস্থ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। ওযু অবস্থায় যিকির, দু'আ, দরূদ, সালাম ইত্যাদি পাঠ করা ভাল। তবে আল্লাহর যিকির, দু'আ ও দরূদ সালাম পাঠের জন্য ওযু বা গোসল প্রয়োজনীয় নয়। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের সুন্নাত হলো, হাঁটতে চলতে বসে শুয়ে ওযুসহ ও ওযু ছাড়া সর্বাবস্থায় নিজের মুখ ও মনকে আল্লাহর যিকির ও দু'আ দরূদ পাঠে রত রাখা। (৫৭) বসে মাথায় পাগড়ি পরিধান করা। (৫৮) দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করা। (৫৯) কাপড়ের আস্তিন ও আঁচল দ্বারা মুখ পরিষ্কার করা। (৬০) ভাঙ্গা বাসনে বা গ্লাসে পানাহার করা। (৬১) রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খাওয়া। (৬২) খালি মাথায়

পায়খানায় যাওয়া। (৬৩) খালি মাথায় আহার করা। (৬৪) ফুঁক দিয়ে প্রদীপ নেভানো। (৬৫) ভাঙ্গা কলম ব্যবহার করা। (৬৬) দাঁত দ্বারা নখ কাটা। (৬৭) রাত্রিকালে ঘর ঝাড়ু দেওয়া। (৬৮) কাপড় দ্বারা ঘর ঝাড়ু দেওয়া। (৬৯) রাত্রে আয়নায় মুখ দেখা। (৭০) হাঁটতে হাঁটতে দাঁত খেলাল করা। (৭১) কাপড় দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা।

এইরূপ আরো অনেক কথা প্রচলিত রয়েছে। সবই বানোয়াট কথা। কোনো জায়েজ কাজের জন্য কোনোরূপ ক্ষতি বা কুপ্রভাব হতে পারে বলে বিশ্বাস করা কঠিন অন্যায়। আর এগুলি হাদীস বলে মনে করা কঠিনতর অন্যায়।

১৭. শুভ কাজ বা উন্নতির কারণ বিষয়ক : মহান আল্লাহ বান্দাকে যে সকল কাজের নির্দেশ দিয়েছেন সবই তার জন্য পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ, উন্নতি ও মঙ্গল বয়ে আনে। সকল প্রকার ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, মুস্ড় াহাব কাজ মানুষের জন্য আখিরাতের সাওয়াবের পাশাপাশি জাগতিক বরকত বয়ে আনে। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

وَ لَوْ أَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ

"যদি জনপদবাসীগণ ঈমান এবং তাকওয়া অর্জন করতো (আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করতো ও নির্দেশিত কাজ পালন করতো) তবে তাদের জন্য আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বরকত-কল্যাণসমূহও উন্মুক্ত করে দিতাম।"

(সূরা ৭: আ'রাফ: ৯৬)

এভাবে আমরা দেখছি যে, সকল ঈমান ও তাকওয়ার কর্মই বরকত আনয়ন করে। তবে সৃষ্টির সেবা ও মানব কল্যাণমূলক কাজে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি খুশি হন এবং এই ধরণের কাজের জন্য মানুষকে আখিরাতের সাওয়াব ছাড়াও পৃথিবীতে বিশেষ বরকত প্রদান করেন বলে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে অনেক বানোয়াট কথাও বলা হয়। যেমন বলা হয় যে, নিম্নের কাজগুলি করলে মানুষ ধনী ও সৌভাগ্যশালী হতে পারে: (১) আকীক পাথরের আংটি পরিধান করা। (২) বৃহস্পতিবারে নখ কাটা। (৩) সর্বদা জুতা বা খড়ম ব্যবহার করা। (৪) ঘরে সিরকা রাখা। (৫) হলুদ রঙের জুতা পরা। (৬) যে ব্যক্তি জমর ্দ পাথরের বা আকীক পাথরের আংটি পরবে বা সাথে রাখবে সে কখনো দরিদ্র হবে না। এবং সর্বদা প্রফুল্ল থাকবে। (৭) অনুরূপভাবে অমুক কাজে মানুষ স্বাস্থ্যবান ও সবল হয়, স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়, অমুক কাজে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় বা স্মরণশক্তি নষ্ট হয়। (৮) অমুক কাজে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে, অমুক কাজে দৃষ্টিশক্তি

কমে। (৯) অমুক কাজে বার্ধক্য আনে। (১০) অমুক কাজে শরীর মোটা হয়, অমুক কাজে শরীর দুর্বল হয় ইত্যাদি সকল কথাই বানোয়াট।

১৮. লক্ষ্মী অলক্ষ্মী : অনেকেই হিন্দুদের মত লক্ষ্মী বিশ্বাস করে, কোন ব্যক্তি বা তার কোন কাজের সাথে সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যের সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করে। বিয়ে বাড়ীতে দেবী লক্ষীর পায়ের আলপনা আঁকে যেন এই পায়ের ছাপে পা ফেলে ঘরে লক্ষী আসতে পারে। এসব শিরকী আকীদা।

১৯. বনি বা সাইট : দোকানদারদের মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি বিষয় হল 'বনি বা সাইট'। দিনের প্রথম বিক্রয়কে তারা এ নামে ডাকে। যেদিন প্রথমেই খুব ভাল বিক্রয় হয় অর্থাৎ বনি/সাইট ভাল হয় সেদিন ব্যবসা খুব লাভ হবে বলে তাদের ধারণা। আর সাইট খারাপ হলে সাড়া দিনের ব্যবসাও খারাপ যাবে বলে তারা বিশ্বাস করে। এমনকি এ কুসংস্কারের কারণে সাইটের পূর্বে নিকটআত্মীয় কেউ বাঁকী চাইলেও বাঁকী দিতে রাজী হয় না। এটা মনে করে যে, প্রথমেই বাঁকী দিলে সাড়া দিনের বেচাবিক্রি খারাপ হবে।

ব্যবসা বাণিজ্যের ভালমন্দ, বেচাকেনার কমবেশি এগুলো আল্লাহর হাতে। 'বনি' বা 'সাইটের' উপর ব্যবসার ভালমন্দ নির্ভর করে বলে বিশ্বাস করা কুফরী।

২০. হালখাতা : প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা 'হালখাতা' উৎসব পালন করেন। নতুন বছরের নতুন হিসাবের জন্য নতুন খাতা খোলা এটা কোন অন্যায় কাজ নয়। কিন্তু এই নতুন খাতা অর্থাৎ 'হালখাতা' খুলতে গিয়ে যে উৎসব মিষ্টি মুখ তা' পুরোপুরি হিন্দুয়ানী রীতির অনুকরণে করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অনেকে হিন্দুদের মত বিশ্বাস করে 'হালখাতা' উৎসব না করলে সারা বছর ব্যবসা মন্দা যাবে, বাকী পরার সম্ভাবনা থাকবে, আয় উন্নতি কমে যাবে ইত্যাদি।

মানুষের ব্যবসা বাণিজ্য আয় উন্নতি আল্লাহপাকের হাতে। এর সাথে 'হালখাতা'র কোন সম্পর্ক নেই। এটা নিছক একটি দেশাচার। ইসলাম একে সমর্থন করে না।

২১. কোন মাস বা সময়কে ভাল বা খারাপ জানা সম্পর্কে আকীদা : আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ সময় ও দিনক্ষণের ভালমন্দে বিশ্বাসী। মহররম, কার্তিক প্রভৃতি মাসে বিয়েশাদী করা উচিত নয়। রবিবারে ও বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটা যায় না, সোম ও বুধবার গোলা হতে ধান বের করা যায় না, শুক্র ও রবিবারে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলে ক্ষতি হবে, শনি ও মঙ্গলবার বিয়ে করা ও ঝাঁড় বাঁধা উচিত নয়, রাতের বেলা ঝাড়ু দিলে আয় উন্নতি হয় না। রাতে

আয়না দেখলে কঠিন বিমার হয়, রাতে নখকাটা ঠিক নয়, আষাঢ় মাসের সাড়ে সাত দিন হলে আমাবতী বলে মান্য করতে হয় ও চাষাবাদ করা যায় না, ভাদ্র ও পৌষ মাসে মেয়ে লোকের সাওয়ারী পাঠান যায় না; আশ্বিন মাস যাবার দিন মুটে বানিয়ে গরুকে খাওয়ান, নিজেরা খাওয়া ও সংক্রান্তি বলে মান্য করা, ফাল্গুন মাস যাবার দিন গরুর গা ধোয়া করা ও 'গো ফাল্গুন' বলে মান্য করা ইত্যাদি হাজারো কুসংস্কার ও বাতিল আকীদা বিশ্বাস আমাদের সমাজে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সময়ের শুভ-অশুভ নির্ণয় করা অর্থাৎ কোন সময় বা মাসকে ভাল বা খারাপ জানা জায়েজ নয়। কোন ব্যাপারেই সময়কে দোষারোপ করা উচিত নয়। সকল সময়ই উত্তম। সকল দিনই ভাল তবে সবচাইতে ভাল দিন, মর্যাদা সম্পন্ন দিন হল জুমু'আর দিন। সকল মাসই উত্তম তবে এর মধ্যে সর্বোত্তম হল রমজান মাস।

২২. কাল বা সময়ের প্রভাবে বিশ্বাস করা আইয়ামে জাহেলিয়াতের রীতি : আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা কাল বা সময়কে দুনিয়ার কায়-কারবারের মূল প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি হিসেবে মনে করত এবং তারা বলত: "আমাদেরকে কালচক্রই মৃত্যুমুখে পতিত করে।" (সূরা জাসিয়া) এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ অদ্যবধি আমাদের কবিদের জবানে "বক্রগামী-আকাশ" এবং "প্রতিকূল প্রকৃতি" এর অভিযোগ চলে আসছে। আরবের মুশরিকরাও একই ধরণের কথা বলত। যখনই অনভিপ্রেত কোন দুঃখ কষ্ট ভোগ করত এবং বিপাকের সম্মুখীন হত, তখনই যুগ বা কালের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ধরত এবং তাকে গালি গালাজ করত। (ফতহুল বারী: শরহে বুখারী, খ: ৮ পৃঃ ৪৪১ এবং বায়হাকী : পৃঃ ১১৬, এলাহাবাদ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করলেন যে, তোমরা এমন জঘন্য বিশ্বাস কখনো পোষণ করোনা। এবং তিনি একথাও বললেন যে "তোমরা জামানাকে গালি দিয়োনা, কেননা আল্লাহপাকই জামানার নিয়ন্ত্রক।" (সহীহ মুসলিম ও আলফাজুল আদব) অন্যত্র তিনি ঘোষনা করলেন, "আল্লাহপাক বলছেন বনী-আদম আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তারা জামানাকে গালি দিচ্ছে। জামানাতো মূলত আমিই। সকল কাজকর্ম আমারই হাতে নিবদ্ধ এবং আমিই দিবা এবং রাত্রির বিবর্তন ঘটাই।" (সহীহ বুখারী : তাফসীরে সূরা জ্বাসিয়া এবং কিতাবে রদ্দে আলাল জাহামিয়া, খ: পৃঃ ১১৬)

বস্তুত: জামানাকে যে সকল দুঃখ কষ্ট ও মুসিবতের স্রষ্টা হিসেবে মনে করে মানুষ গালি দেয়, মূলত এগুলোর সৃষ্টিকর্তা কেবলমাত্র আল্লাহ। এ জন্য এ সকল গালি গালাজ আল্লাহর উপরই বর্তায়।

২৩. রোগ সংক্রমণ সম্বন্ধে আকীদা : সাধারণত ছোঁয়াচে রোগ বা সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে যে ধারণা রয়েছে সে সম্বন্ধে ইসলামের আকীদা হল- কোন রোগের মধ্যে সংক্রমণের নিজস্ব ক্ষমতা নেই। তাই দেখা যায় তথাকথিত সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকের কাছে যাওয়ার পরও অনেকে আক্রান্ত হয় না, আবার অনেকে সেখানে না গিয়েও আক্রান্ত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে সহীহ আকীদা হল: রোগের মধ্যে সংক্রমণ বা অন্যের মধ্যে বিস্তৃত হওয়ার নিজস্ব ক্ষমতা নেই। কেউ অনুরূপ রোগীর সংস্পর্শে গেলে যদি তার আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা হয়, সে ক্ষেত্রেই সে আল্লাহর হুকুমে আক্রান্ত হবে, অন্যথায় নয়। কিম্বা এরূপ আকীদা রাখতে হবে যে, এসব রোগের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ্আআলা সংক্রমণের এই নিয়ম রেখে দিয়েছেন। তবে আল্লাহর ইচ্ছা হলে সংক্রমণ নাও ঘটতে পারে। অর্থাৎ সংক্রমণের এ ক্ষমতা রোগের নিজস্ব ক্ষমতা নয়, এর পশ্চাতে আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা এবং তাঁর ইচ্ছার দখল থাকে। তবে ইসলাম প্রচলিত এসব সংক্রামক রোগে আক্রান্ত লোকদের নিকট যেতে নিষেধ করেছে, বিশেষভাবে কুষ্ঠ রোগীর নিকট, এ কারণে যে, উক্ত রোগীর নিকট গেলে তার আক্রান্ত হওয়ার খোদায়ী ফয়সালা হওয়ার কারণে সে আক্রান্ত হলে তার ধারণা হতে পারে যে, উক্ত রোগীর সংস্পর্শে যাওয়ার কারনেই সে আক্রান্ত হয়েছে, এভাবে তার আকীদা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তা যেন হতে না পারে এজন্যেই ইসলাম এরূপ বিধান দিয়েছে। তবে কেউ মজবুত আকীদার অধিকারী হলে সে অনুরূপ রোগীর নিকট যেতে পারে। এমনিভাবে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত লোককেও সুস্থ এলাকার লোকদের নিকট যেতে নিষেধ করেছে যাতে অন্য কারও আকীদা নষ্টের কারণ না ঘটে।

নযর বা মানত সম্পর্কে আকীদা

১. নযর বা মানত : ইবনুল আরাবী মানত এর সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে লিখেছেন:

هُوَ اِلْتِزَامُ الْفِعْلُ بِالْقَوْلِ مِمَّا يَكُوْنُ طَاعَةَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْاَعْمَالِ الْقُرْبَةِ

(الحكام القران ج ا ص :٢٦٨)

কোন কাজ করার বাধ্যবাধকতা নিজের উপর নিজের কথার সাহায্যে চাপিয়ে নেয়া, যে কাজ হবে একান্তভাবে আল্লাহর ফরমাবরদারীমূলক এবং যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ হতে পারে।

নযর বা মানত ওয়াজিব হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। প্রথমত: যে কাজের মানত করা হবে, তা জায়েজ ও হালাল হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তা ওয়াজিব না থাকা চাই।

অতএব, যদি কেউ ফরয বা ওয়াজিব বিতরের নামাযের মানত করে, তবে তা

নযর বা মানত হবে না। কেননা এই ফরয ও ওয়াজিব আদায় করা তার উপর পূর্ব থেকেই ওয়াজিব হয়ে রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মতে এটাও শর্ত যে, মানতের মাধ্যমে যে কাজটিকে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেওয়া হয়, সেই জাতীয় কোন আমল শরীয়াতে ওয়াজিব থাকতে হবে। যেমন– সালাত, রোযা, সদকা, কুরবাণী প্রভৃতি।

২. গায়রুল্লাহর নামে মানত সম্পর্কে আকীদা : অনেকে এভাবে মানত মানেন- আল্লাহ যদি আমার অমুক আশা পূর্ণ করেন তবে আমি অমুক ফকিরের দরগায় শিরনি দিবো। যেখানে বলা হচ্ছে- আল্লাহ যদি আশা পূর্ণ করে, সেখানে শিরনিটাও আল্লাহর নামেই হওয়া উচিত ছিল। কবর পূজারীরা নিজেরাই স্বীকার করে নেয় যে, মানুষের আশা পূরণের মালিক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। কিন্তু দুঃখের বিষয় কথার দ্বিতীয়াংশে তারা এ কথার স্বীকৃতি দেয় না যে, ঐ আশা পূরণের জন্য শিরনিটাও আল্লাহর নামেই হতে হবে। আল্লাহতা'আলার অনুগ্রহ ভিক্ষার সাথে সাথে ফকির দরবেশের সহায়তা ও সাহায্য কামনা করা ইসলামের দৃষ্টিতে পরিষ্কার শিরক। আল্লাহতা'আলার নামেই শুধু মানত মানতে হবে যা নিম্নলিখিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে :

সাবেত ইবনু যাহহাক (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি বাওয়ানা নামক স্থানে একটি উট কুরবাণী করার মানত করলো। তারপর (সে মানত পূর্ণ করার পূর্বে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, সেখানে কি জাহেলী যুগের প্রতিমা সমূহের মধ্যে কোন প্রতিমা আছে যার পূজা করা হয়? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেখানে কি তাদের কোন উৎসব বা মেলা হয়? (যেমন বর্তমানে বাৎসরিক ওরশ আমাদের দেশে হয়)। তারা বললেন, না এরূপ কিছুই হয় না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তোমার মানত পূরা করো, কারণ সেই মানত পূরণ করা অবৈধ (জায়েজ নয়) যাতে অবাধ্যতা আছে এবং যা মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। (আবু দাউদ)

উক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোন ফকিরের দরগায় মানত করা, সেটা আল্লাহর নামে হলেও জায়েজ নয়।

জায়েজ মানত এভাবেই হতে পারে যেমন বলে, যদি আল্লাহতা'আলা আমার

অমুক আশা পূরণ করেন তবে আল্লাহর নামে অমুক নেক কাজটা করব, যেমন রোজা, নামাজ ইত্যাদি অথবা আল্লাহর নামেই কিছু দান করব।

যদি কেউ মানত করে এবং আশা পূরণ হয়, তাহলে তো সেটা পূরণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, আর যদি পূরণ না হয়, তাহলে মানত পূরণ করা ওয়াজিব নয়, তবে মানতকারী ইচ্ছা করলে তা পূরণ করতেও পারে।

৩. জানের বদলায় মাল : অনেকেই মানত করতে গিয়ে আরেকটি বড় পাপ করে ফেলে, যেমন বলে, জানের বদলায় মাল দিলাম। অথবা কোন ফকির দরবেশের দরগায় গিয়ে বলেঃ হে আল্লাহ, তুমি আমাদের ছেলের রোগ মুক্ত করে দিলে তার জানের বদলায় এই দরগায় মাল বা শিরনী দিবো বা জানের বদলায় জান দিবো অর্থাৎ পশু জবাই করে দিবো।

এ ধরনের কথার অর্থ এই হয়ে দাঁড়ায় যে, জানের মালিক তো আল্লাহ তা'য়ালা, কিন্তু মালের মালিক মানতকারী নিজেই। তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা শুধুমাত্র জানের মালিক এবং মালের পরিবর্তে অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করে দিচ্ছেন।

এ কথা থেকে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, মালের মালিক আল্লাহ নন, বরং সেই মানতকারী নিজেই এবং মালের মালিক আল্লাহকে মাল দিয়ে জানকে বাঁচিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু এ ধারণা বাতিল। আল্লাহতা'আলা জানেরও মালিক মালেরও মালিক। তাই যারা এ ধারণা নিয়ে মানত করে যে, আশা পূরণ হওয়ার বদলায় এটা করবে, তাদের মানত করা উচিত নয়। কারণ হাদীসের দৃষ্টিতে মানত না করাই ভাল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানত করাটা পছন্দও করতেন না, যা নিম্নলিখিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানত করতে নিষেধ করতে লাগলেন, বললেনঃ এটা কোন কিছু হওয়াকে ফিরাতে পারে না। (অর্থাৎ মানত না করলেও ওর ভাগ্য ভাল থাকলে মানত ছাড়াই পাবে) অবশ্য মানত কৃপণের কিছু মাল খরচ করিয়ে দেয়। (মুসলিম, আবু দাউদ)

৪. মানত তাকদীরকে বদলাতে পারে না : মানুষ মানত করতে গিয়ে আরও একটা কুধারণা করে থাকে, তা হচ্ছে তাকদীরের উপর। তারা তাকদীরের উপর ঈমানকে নষ্ট করে, যেমন বলে, ওমুক মাজারে মানত করলে তাকদীর বদলে যাবে, বিপদও দূর হয়ে যাবে এবং মালদার হয়ে যাবে। যারা ঐ রকম ধারণা করলো, তারা তাকদীরকে বিশ্বাস করল না, কারণ তাকদীরে যা লিখা হয়ে গেছে সেটার পরিবর্তন মানত দ্বারা হতে পারে না, যা নিম্নলিখিত হাদীস থেকে প্রমাণিত

হয়:

আল্লাহ কারো তাকদীরে যা লিখে দেননি, তা মানত কাউকে দিতে পারে না। কিন্ড্র মানত আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর অনুরূপই হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে কৃপণ ব্যক্তি সেই জিনিস বের করে, যা সে অন্য কোনভাবে বের করত না। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: মানত মানব-সন্ড্রনকে কোন ফায়দাই দেয় না। দেয় শুধু তাই, যা তার তাকদীরে লিখিত হয়েছে। বরং মানত মানুষকে তার তাকদীরের দিকেই নিয়ে যায়। অত:পর কৃপণ ব্যক্তির হাত থেকে আল্লাহ কিছু খরচ করান। তার ফলে সে আমাকে (আল্লাহকে) এমন কিছু দেয়, যা এর পূর্বে সে কখন দেয়নি।

মহান আল্লাহতা'আলা যার তাকদীরে যা লিখেছেন, মানত তা পরিবর্তন করতে পারে না। আর কোন মুসলমান তাকদীরের উপর ঈমান না আনলে তাকে মুসলমানই বলা যাবে না।

গায়রুল্লাহর নামে পশুপালন বা পশু উৎসর্গ করা সম্পর্কে আকীদা

১. কুরআন শরীফে ইরশাদ হচ্ছে–

وَ قَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّ حَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَ اَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَ اَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

"এবং তারা নিজেদের ধারণা ও খেয়াল অনুসারে বলে যে, এ সব জীব ও শস্য সাধারণের ব্যবহার নিষেধ। আমরা যার জন্য ইচ্ছা করব, সে ছাড়া অন্য কেউ তা ভোগ করতে পারবে না। মিথ্যারূপে কতকগুলো জীবের পিঠে সওয়ার হওয়া নিষেধ সাব্যস্ড় করা হয় এবং কতকগুলো জীবের উপর আল্লাহর নাম বলা হয় না। তাদের এ মিথ্যা আচরণের জন্য নিশ্চয় তিনি শাস্তি দিবেন।"

(সূরা আনআম : ১৩৮)

২. এই আয়াতের মর্মার্থ এই যে, লোকেরা নিজেদের বাতিল খেয়ালের বশবর্তী হয়ে শস্যাদি, ফলমূল, জীবজন্তু ইত্যাদি বস্তু কারো নামে নির্দিষ্ট করে উহা সাধারণের অস্পৃশ্য, অভক্ষ্য ও অব্যবহার্য বলে ঠিক করে নেয় এবং বলে থাকে যে, অমুক অমুক বস্তু অমুক অমুক লোক খেতে, ছুতে বা ব্যবহার করতে পারবে

না। এরূপ কতগুলি জীব-জন্তুকে আল্লাহ ছাড়া কোন পীরওলী বা দেবতার নামে নির্দিষ্ট করে, তাদের সম্মানের জন্য তার পিঠে বোঝা দেয়া বা সওয়ার হতে নিষেধ করে, শস্যাদি খেতে থাকলে তাড়ায় না, ঢিল ও ছুরির আঘাত করে না। তারা মনে করে থাকে যে, এতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং এতে তাদের মনোবাঞ্চা পূরণ হবে। এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এইরূপ মিথ্যা ও শেরেকী ধারণা পোষণ করার জন্য নিশ্চয়ই শাস্ড়ি পেতে হবে।

৩. আল্লাহতা'আলা পুনরায় বলছেন :

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ ۢ بَحِيْرَةٍ وَّ لَا سَآئِبَةٍ وَّ لَا وَصِيْلَةٍ وَّ لَا حَامٍ ۙ وَّ لٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ

"আল্লাহতা'আলা (কোন জীবকে) 'বাহীরা' 'সায়েবা' 'ওয়াসীলা' অথবা 'হাম' করেন নাই। কিন্তু কাফির লোকেরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করিয়া থাকে এবং তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতে অক্ষম (জ্ঞানহীন)।" (সূরা মায়েদা : ১০৩)

৪. আল্লাহতা'আলা এই আয়াতে জানোয়ার সম্বন্ধে কাফিরদের চারটি নিয়ম পালনের কথা উল্লেখ করে উহার অসারতা ও অবৈধতা জানিয়ে দিয়েছেন।

বাহীরা : পশুর ঐ বাচ্চাকে বলা হয় যেগুলো কান ছিঁড়ে ফেলে দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়।

সায়েবা : ঐ জন্তুকে বলা হয় যা দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হয়।

ওয়াসীলা : কোন কোন লোক মানত করত যে, যদি বাচ্চা নর হয় তাহলে একে দেবতার নামে উৎসর্গ করব। আর যদি মাদী হয়, তাহলে নিজের কাছে রেখে দেব। কিন্তু নর এবং মাদী বাচ্চা একই সাথে যদি হত, তাহলে উভয়টিই রেখে দিত। এই বাচ্চাকে ওয়াসীলা বলা হয়।

হাম : সে উটনিকে বলা হয়, যার দশটি বাচ্চা বোঝা বহনের ও আরোহী বহনের যোগ্য হয়। আরবরা এই উটনীকে দেবতার নামে ছেড়ে দিতো।

এই বিষয়ে আল্লাহতাআলা বলেছেন, তিনি জানোয়ার সম্বন্ধে এরূপ নামকরণ বা শ্রেণীবিভাগ কিছুই করেন নাই। এ সমুদয় কাফিরগণের বাতিল খেয়াল, অজ্ঞতা ও মূর্খতার ফল।

এই আয়াতের দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, কোন জীব কারো নামে নির্দিষ্ট করে রাখা বা ছেড়ে দেয়া, কোন প্রকারে উহা চিহ্নিত করা অথবা সেগুলি সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার ধরা বাঁধা নিয়ম করা নিষিদ্ধ।

৫. আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে পোষা জীব জন্তু যে হারাম বস্তুর মধ্যে গণ্য

এতদসম্বন্ধে আল্লাহতা'আলা বলেছেন :

اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ

অর্থ : অথবা পাপের বস্তু, যা আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গিত হয়েছে (সেটাও হারাম)। (সূরা আনআ'ম : ১৪৫)

অর্থাৎ শূকর, রক্ত ও মৃত জীব যেমন নাপাক ও হারাম (অপবিত্র ও অবৈধ), আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গিত জীবও সেইরূপ অপবিত্র, অবৈধ ও হারাম।

৬. এই আয়াতের দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে জীব জন্তু নির্দিষ্ট করে রাখা নিষেধ, কেউ তা করলে একেবারেই অপবিত্র ও হারাম হয়ে যাবে।

এই আয়াতে কোন প্রাণী কেবল জবাই করবার সময় আল্লাহ ব্যতীত অপরের নাম নিলে যে হারাম হবে, তেমন কথা উল্লেখ নেই, বরং বলা হয়েছে জবাই করার পূর্বেও অন্য কারো নামে নির্ধারিত করলে তখন থেকেই এটা অপবিত্র এবং অবৈধ হয়ে যাবে। সুতরাং মুরগীই হোক, আর উটই হোক, যে কোন জানোয়ার কোন ওলী, পীর, পয়গম্বর, বাপ, দাদা অথবা দেও, পরীর নামে নির্দিষ্ট করা হলে তা নাপাক ও হারাম হয়ে যাবে। এবং এইরূপ করা শিরক এর পর্যায়ভুক্ত। [তাকভিয়াতুল ঈমান, আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ:)]

৭. গায়রুল্লাহর জন্যে একটি মাছি দেয়ার পরিণতি : হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– তারিক ইবনে শিহাব (রা:) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক ব্যক্তি একটি মাছির জন্য বেহেশতে প্রবেশ করেছে এবং অপর এক ব্যক্তি ঐ মাছির জন্যই দোযখে প্রবেশ করেছে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কিভাবে সম্ভব হলো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দু'ব্যক্তি কোন এক গোত্রের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল যাদের ছিল একটি মূর্তি। তাদের নিয়ম ছিল তাদের সেই মূর্তির জন্য কিছু সামান্য হলেও না দিয়ে কেউই সেটা অতিক্রম করতে পারবে না। তখন তারা ঐ দু'ব্যক্তির একজনকে বললো, কিছু দিয়ে যাও, সে বললো দেয়ার মত আমার কাছে কিছুই নেই। তারা তাকে বললো একটি মাছি হলেও দিয়ে যাও। তখন সে একটি মাছি দেয়াতে তার পথ ছেড়ে দিল। ফলে সে দোযখে দাখিল হল। আর তারা অপর লোকটিকে বললো, কিছু নযর নিয়াজ দিয়ে যাও। সে বললো, আমি তো আল্লাহ ব্যতীত অপর কাউকে নযর নিয়াজ প্রদান করি না। তখন তারা সেই লোকটিকে হত্যা করলো, ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।

(আহমাদ)

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঐ তুচ্ছ মাছিটাকে অন্যের নামে দেয়াতে তাকে জাহান্নামে যেতে হলো আর যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে মৃত ব্যক্তির নামে ঐ মাজারে গরু ছাগল ইত্যাদি শিরনি করার জন্যে দিয়ে যায় তাদের অবস্থাটা কত ভয়াবহ হবে তা সহজেই অনুমেয়।

গায়রুল্লাহর নামে জবেহ বা কুরবাণী করা সম্পর্কে আকীদা

১. জবাই করার সময় আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাম উচ্চারণ করা যাবে না। এ এক সর্ববাদী সম্মত কথা। তার কারণ হচ্ছে, জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা তাদের উপাস্যদের দেব-দেবীর মূর্তির নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জন্তু জবাই করত। জবাই করার সময় তারা সে সব দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করত অথবা নির্দিষ্ট স্থানে বলিদান করত। কুরআন মাজীদে এসব হারাম করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ

হে ঈমানদার লোকেরা! আমরা তোমাদেরকে যেসব পবিত্র জিনিস রিযিক স্বরূপ দিয়েছি তোমরা তা খাও ও আল্লাহর শোকর কর, যদি তোমরা বিশেষ ও একান্তভাবে তাঁরই বন্দেগী করতে প্রস্তুত হয়ে থাক। তিনি তো তোমাদের জন্যে শুধু মৃত বস্তু, রক্ত ও শূকরের গোশত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে বলি দেয়া জন্তু হারাম করে দিয়েছেন। (সূরা বাকারা, ১৭২-১৭৩)

২. আরো ইরশাদ হচ্ছে :

قُلْ لَّاۤ اَجِدُ فِيْمَاۤ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ

বল, আমার প্রতি যে অহী নাযিল হয়েছে তাতে তো কোন আহারকারীর প্রতি কোন জিনিস হারাম বলে চিহ্নিত হতে দেখি না, মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোশত অথবা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারোর উদ্দেশ্যে বলি দেয়া জন্তু ব্যতীত। (সূরা আনআম : ১৪৫)

৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ

তুমি সালাত পড়বে একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর জন্যই জবাই

করবে। (সূরা কাওসার : ২)

যখন কাফির মুশরিকরা নেক লোকদের পূজা করত, অর্থাৎ লাত, উযযা প্রভৃতির ইবাদত করত ও তাদের নামে জবাই করত তখনই তো এই আয়াত নাযিল হয়েছিল।

৪. এ ছাড়াও সালাত, রোযা ইত্যাদি যেমন ইবাদত, জবাই করাও তেমনই ইবাদত এবং ইবাদত বলেই মানুষ প্রতি বছর আল্লাহর নামেই কুরবানী করে। তাই আল্লাহতা'আলা বলেন:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَ نُسُكِىْ وَ مَحْيٰىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বলুন হে রাসূল! আমার সালাত, আমার পশু কুরবাণী, আমার জীবন, আমার মরণ, সমস্ড়ই বিশ্ব জগতের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহর জন্য।

(সূরা আনআম : ১৬২)

উক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বা অন্য কিছুর নামে পশু জবাই বা কুরবাণী করা জায়েজ নয়।

৫. বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে একদা কয়েকজন কুরাইশসহ সফরকালে মক্কার পশ্চিমে অবস্থিত বালদাহ নামক স্থানেও নিম্নভাগে যায়েদ ইবনে আমের ইবনে নুফাইলের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাৎ হয়। তারপর কুরাইশদের পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে দস্ড়রখানা বিছানো হলো (খানার ব্যবস্থা হলো)। তিনি তা খেতে অস্বীকার করলেন এবং যায়েদের সামনে ঠেলে দিলেন। কিন্তু তিনিও তা খেলেন না। অত:পর যায়েদ কুরাইশদেরকে বললেন, তোমাদের মূর্তির নামে তোমরা যা জবাই করো তা আমি কিছুতেই খাব না। আমি তো কেবলমাত্র তাই খেয়ে থাকি যা আল্লাহর নামে জবাই করা হয়।

৬. যায়েদ ইবনে আমর কুরাইশদের জবাই সম্পর্কে নিন্দা করতেন (যা তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নামে জবাই করত)। তিনি বলতেন, ছাগলকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এবং তিনিই তার জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তিনিই তার জন্য জমিন থেকে ঘাস উৎপন্ন করেন। এত কিছুর পরও তোমরা অন্যের নামে জবাই করো? (কেমন জ্ঞান তোমাদের?) (বুখারী)

৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কিংবা অন্য কিছুর নামে পশু জবাই করে আল্লাহ তাকে অভিশাপ (লা'নত)

দেন। (মুসলিম)

৮. কুরআন হাদীসের উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়েছে যে– আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে, সে পীর, ওলী, গাওস, কুতুব যেই হোক না কেন, এমনকি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও যদি হন তবুও তাঁর নামে জবাই করা জায়জ হবে না।

গায়রুল্লাহর নামে কসম বা শপথ করা সম্পর্কে আকীদা

১. কসম বা শপথ : সম্মানসূচক কোন শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে কোন বিষয়কে মজবুত করার নামই হল কসম। আর সমস্ড় সম্মানের উপযুক্ত ও যথাযোগ্য প্রাপক হলেন আল্লাহতায়ালা। তাই গায়রুল্লাহর নামে কসম বা শপথ করা জায়েজ নয়। আলেমগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন যে, কসম একমাত্র আল্লাহর নামে অথবা তার জাতিবাচক ও গুণবাচক নামসমূহের সহিত হতে হবে। আর আলেমগণ গায়রুল্লাহর নামে কসম করা অবৈধ হওয়ার উপরেও একমত হয়েছেন। (কিতাবুত তাওহীদ, হাশিয়াহ ইবনে কাছেম পৃঃ ৩০৩)

২. গায়রুল্লাহর নামে কসম : গায়রুল্লাহর নামে কসম খাওয়া শিরকী কাজ। হযরত ইবনে ওমর (রা:) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়।

"তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, ইবনে ওমর (রা:) বলেছেন যে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি, আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে কসম (শপথ) করে, সে নিশ্চয় শিরক করে থাকে।" (মেশকাত বাবুল আয়মান)

উল্লেখ্য যে উক্ত কুফরী বা শিরক দ্বারা নিম্ন পর্যায়ের কুফরী বা শিরক বুঝানো হয়েছে। কিন্তু কসমকৃত বস্তুটিকে যদি কসমকারী ব্যক্তি খুব সম্মানের উপযুক্ত তথা উহাকে ইবাদত করার যোগ্য মনে করে তখন এই অবস্থায় কসম খাওয়া উচ্চ পর্যায়ের শিরক হিসাবে গণ্য হবে। যেমন বর্তমান কালের কবর পূজারীদের অবস্থা। কেননা তারা কবরস্থ ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার চাইতে অধিক ভয় এবং সম্মান করে থাকে। এমনকি এরা স্বীয় ভন্ড পীরদের নামে মিথ্যা কসম খেতে সাহস করে না, কিন্তু মহান আল্লাহতায়ালার নামে মিথ্যা কসম করতে কোন দ্বিধাবোধ করে না।

৩. আল্লাহর নামে কসম : সুতরাং বুঝা গেল যে, কসম করার মাধ্যমে কসমকৃত বস্তুর সম্মান করা হয়ে থাকে। সেহেতু একমাত্র আল্লাহতায়ালার নামেই কসম করা বিধেয়।

ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ কসম খেতে চাইলে সে যেন কেবল আল্লাহর নামে কসম খায়। ইবনে উমর (রা:) বলেন কুরাইশ সম্প্রদায় তাদের বাপ দাদার নামে শপথ করত। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমরা তোমাদের বাপ দাদার নামে কসম খেয়ো না। (মুসলিম)

৪. খানায়ে কাবার নামে শপথ করাও নিষেধ : তৎকালে আরববাসীরা খানায়ে কাবারও শপথ করত। এক ইহুদী এসে অভিযোগ উত্থাপন করল যে, তোমরাও তো শিরক করছ এবং কাবার নামে শপথ করছো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, কাবা নয়, বরং কাবার অধিকর্তার শপথ গ্রহণ কর। (নাসাঈ : কিতাবুল ঈমান ওয়ান নজর)

৫. একবার হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা:) কাউকে কাবার শপথ করতে শুনলেন, তখন তিনি তাকে নিষেধ করলেন, এবং বললেন, গায়রুল্লাহর শপথ যে করলো, সে কুফুরী করলা, অথবা শিরক করলো। (জামে তিরমিজী: আবওয়াবুনুজুর ওয়াল আইমান এবং মুস্তাদরেখে হাকেম : কিতাবুল ঈমান)

৬. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কসম খেলে কসম হয় না। যেমন রাসূলুল্লাহর কসম, কাবা শরীফের কসম, নিজ চোখের কসম, নিজ যৌবনের কসম, নিজ হাত পায়ের কসম, নিজের বাপের কসম, নিজ সন্তানের কসম, নিজ প্রিয়জনের কসম, তোমার মায়ের কসম, তোমার কসম, নিজের কসম, বিদ্যার কসম, পশ্চিম দিকে মুখ করে বলছি, বিদ্যা বা বই মাথায় নিয়ে বা বিদ্যার উপর হাত দিয়ে বলছি, তোমার গা, মাথা বা হাত ছুঁয়ে বলছি ইত্যাদি বলে কসম করা জায়েজ নয়। এই জাতীয় কসমের খেলাফ করলে কাফফারা দিতে হবে না। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কসম খাওয়া শক্ত গোনাহ। হাদীস শরীফে এর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আছে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কসম খাওয়া শেরেকী কথা, এগুলো থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

৭. পূর্ব অভ্যাসবশত গায়রুল্লাহর নামে কসম করে ফেললে করণীয় : বুখারী এবং মুসলিম আবু হোরায়রা (রা:) হতে এবং তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এ রকম বর্ণনা করেছেন যে, হযরত বলেছেন, "কেউ শপথ করতে ইচ্ছা করে যদি হঠাৎ 'লাত' ও 'ওজ্জার' শপথ করে ফেলে তবে তখুনিই তার বলা উচিত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই।" (মেশকাত, বাবুল আয়মান)

'লাত' ও 'ওজ্জা' আরবের কাফিরগণের উপাস্য প্রতিমূর্তির নাম। তাদের নামেই তারা শপথ করত। তাই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের পরও যদি কেউ পূর্ব অভ্যাসের ফলে ঐ দেবতাদের নামে শপথ

করে ফেলে; তবে তখুনি একত্ববাদের মূলমন্ত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এই কলেমা পাঠ করা উচিত।

এই হাদীস হতে জানা গেল আল্লাহ ছাড়া অপর কারও শপথ করা নিষেধ। যদি হঠাৎ তেমন কিছু মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে, তবে তখুনি 'তওবা' করবে এবং কলেমা শরীফ পড়বে। (তাকভিয়াতুল ঈমান, আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ:))

শিরকের গন্ধযুক্ত নাম বা সম্বোধন সম্পর্কে আকীদা

যে সকল নাম বা সম্বোধনে শিরকের সংস্পর্শ পাওয়া যায়, সেগুলোকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ নিজের সন্তান-সন্ততির নাম সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদির নামের সাথে সম্পৃক্ত করে রাখত। যেমন আবদে শামস বা সূর্যের গোলাম, আবদে মানাফ বা মানাফের গোলাম ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই শ্রেণীর নাম রাখতে কঠোরভাগে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : "উত্তম নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান অর্থাৎ আল্লাহর দাস এবং দয়াময়ের দাস।" (আবু দাউদঃ কিতাবুল আদব)

অনারব সুলতানদেরকে 'শাহানশাহ', 'বাদশাহসমূহের বাদশাহ' বলে ডাকা হত। যেহেতু এই নামের মাঝে শিরকের সম্ভাবনা ছিল এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এই শ্রেণীর নাম আল্লাহর নিকট খুবই অপ্রিয়। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর তীব্র অসন্তোষ বর্ষিত হয় যে নিজেকে 'শাহানশাহ' বলে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কোনও বাদশাহ নেই। (মোস্তাদরেকে হাকেম, ৪ খণ্ড ২৭৭ পৃঃ)

গোলাম বা দাসদেরকে মানুষ 'আবদ' অর্থাৎ বান্দাহ বলতো। অথচ মানুষ আল্লাহর বান্দাহ, মানুষের বান্দাহ নয়। অনুরূপভাবে দাসগণও মনিবদেরকে রব বা প্রভু বলে ডাকত। মূলত রব হচ্ছেন আল্লাহ। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাত্মকভাবে নিষেধ করলেন, কেউ যেন ক্রীতদাসদেরকে আবদ বা বান্দাহ বলে না ডাকে। বরং এভাবে বলবে, আমার ছেলে, আমার মেয়ে। অনুরূপভাবে দাস-দাবীগণও মনিবদেরকে রব বলে ডাকবে না। বরং মালিক বলে ডাকবে। জেনে রেখ, তোমরা সবাই গোলাম, আর রব হচ্ছেন আল্লাহ। (আবু দাউদঃ কিতাবুল আবদ)

হালী ছিলেন একজন সাহাবী। যার ডাক নাম ছিল আবুল হাকাম। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে বংশের লোকসহ উপস্থিত হলেন, তখন পিয়ারা নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাকাম হচ্ছেন আল্লাহ এবং হুকুম দাতা তিনিই। তোমাকে মানুষ কেন

আবুল হাকাম বলে ডাকে? সাহাবী আরজ করলেন, আমার গোত্রে কোন ঝগড়া-ঝাটি হলে লোকজন আমাকে বিচারক নির্বাচন করে। আমি যা ফায়সালা প্রদান করি মানুষ তা গ্রহণ করে নেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ছেলেদের নাম কি? তিনি বললেন, শুরাইহ, মুসলিম, আবদুল্লাহ। আল্লাহর হাবীব রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এদের মাঝে বয়সে বড় কে? আরজ করলো, শুরাইহ্। ইরশাদ হলো, তোমার ডাক নাম হচ্ছে আবু শুরাইহ্। (আবু দাউদঃ কিতাবুল আদব)

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যে রাজাধিরাজ নাম গ্রহণ করে। আল্লাহ ছাড়া কেউ রাজা নেই।

শিরকের গন্ধযুক্ত উপাধী প্রসঙ্গে আকীদা

কোন পীর বা ওলীকে এমন কোন উপাধীতে সম্বোধন করা উচিত নয় যা অর্থগত দিক দিয়ে আল্লাহপাকের জন্য প্রযোজ্য। যেমন-গাওসুল আজম (অর্থ-সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী), গরীবে নওয়াজ (গরীবরা যার মুখাপেক্ষী), মুশকিল কোশা (যার মাধ্যমে মুশকিল বা বিপদ দূর হয়), কাইয়ুমে জামান (জামান কায়েম করেছেন যিনি) ইত্যাদি উপাধীতে কোন পীর-ওলীকে সম্বোধন করা উচিত নয়। কেননা প্রকৃত গাওসুল আজম, গরীবে নওয়াজ, মুশকিল কোশা, কাইয়ুমে জামান হচ্ছেন আল্লাহপাক।

শয়তানকে অভিশাপ দেয়া সম্পর্কে আকীদা

অধিকাংশ মানুষের স্বভাব হচ্ছে এই যে, যখন কোন খারাপ কাজ করে তখন শয়তানকে অভিশাপ দিতে থাকে; যেন শয়তান এই খারাপ কাজটি করিয়েছে। একবার একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ঘোড়ার উপর আরোহী ছিল। এমতোবস্থায় ঘোড়াটি হোঁচট খেলে লোকটি বললো, শয়তানের সর্বনাশ হোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এভাবে বলো না, এতে শয়তান অহঙ্কারে ফুলে উঠবে এবং বলবে, আমার শক্তিতে এটা হয়েছে। বরং আল্লাহর নাম নাও। তাহলে শয়তান ক্ষুদ্র মাছির চেয়েও সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। (আবু দাউদ: কিতাবুল আদব)

নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপারে সীমালংঘন সম্পর্কে আকীদা

প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব হলো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের শিক্ষার উপর নির্ভর করা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস ও তাঁর সম্মান প্রদান মুসলিম বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে তাঁর সম্মান, মর্যাদা, দায়িত্ব, ক্ষমতা, অধিকার ও আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা অত্যন্ড় স্পষ্টভাবে শেখানো হয়েছে। মুসলিমের দায়িত্ব হলো, তাঁর ব্যাপারে কুরআনুল করীমে বা সহীহ হাদীসে যা বলা হয়েছে তা সবকিছু পরিপূর্ণভাবে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করা। নিজের থেকে কোন কিছু বাড়িয়ে বলা যাবে না, কারণ তা আমাদেরকে বাড়াবাড়ির পথে ঠেলে দেবে, যা তিনি নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "তোমরা আমার প্রশংসায় ভক্তিতে বাড়াবাড়ি করবে না, যেমনভাবে খৃষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তো একজন দাস– মানুষ মাত্র, কাজেই তোমরা বলবেঃ আল্লাহর দাস (বান্দা) ও রাসূল।" (সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খন্ড ৪৭৮ পৃষ্ঠা, নং ৩৪৪৫, মুখাতাসারশ শাময়িলিল মুহাম্মদিয়াহ ১৭৪ নং ২৮৪, মুসনাদে আহমাদ ১ম খন্ড ২৩, ২৪, ২৭, ৫৫, ৬০)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, কোনো একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

مَا شَآءَ اللّٰهُ وَ مَا شِئْتَ

"আল্লাহর মর্জিতে এবং আপনার মর্জিতে...।"

তিনি ঐ ব্যক্তিকে ধমক দিয়ে বলেন: "তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমতুল্য বানিয়ে দিচ্ছ? বরং একমাত্র আল্লাহর মর্জিতেই।"

(মুসনাদে আহমাদ ১ম খন্ড ২১৪ পৃ ও ২৮৩ পৃ)

কোন সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন-- হুজুর, আপনি আমাদের মালিক। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন যে, মালিক (প্রভু) একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালা। কিছু সংখ্যক সাহাবী (রা:) বললেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি আমাদের সবার চাইতে উত্তম আর অধিক ক্ষমতাবান। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- তোমরা এটা বল অথবা এর কিয়দংশ বল। তবে সতর্ক থেকো যেন শয়তান তোমাদেরকে নির্ভীক করে না দেয়। (আবু দাউদ)

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন । এমন সময় একজন লোক তাঁকে দেখে ভীত বিহ্বল হয়ে পড়লো। কাছে গিয়ে তিনি বললেন, "ভয় নেই, আমি একজন কুরাইশ তনয়ার পুত্র, যিনি গোশত শুকিয়ে ভক্ষণ করতেন।" (শামায়েলে তিরমিজি: মুস্ড়দরেক, ৩য় খন্ড ৪৮ পৃঃ)

হযরত আনাস (রা:) বলেছেন: “একব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে : হে মুহাম্মদ, হে আমাদের নেতা (সাইয়েদ), আমাদের নেতার ছেলে, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: হে মানুষেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ড় না করে। আমি আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ, আমি আল্লাহর (আবদ) দাস ও তাঁর রাসূল। (মনোনীত বার্তাবাহক)। আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদা দান করেছেন, আমি কখনোই পছন্দ করি না যে, তোমরা আমাকে সেই মর্যাদার ঊর্ধ্বে ওঠাবে।”(মুসনাদে ইমাম আহমাদ ৩য় খন্ড ১৫ পৃ, সুনানে আবু দাউদ ৪র্থ খন্ড ২৫৫ পৃ, নং ৪৮০৬, জামিউল উসূল ১১শ খন্ড ৪৯-৫০প, নং ৮৫১৫-৮৫১৬) বাড়াবাড়ির অর্থ হলো তাঁর বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার অতিরিক্ত কিছু বাড়িয়ে বলা যা তিনি আমাদেরকে বলেননি। এ ধরণের বাড়াবাড়ি মানুষকে বিভ্রান্ড় ও শিরকের মধ্যে নিপতিত করে, যেমন খৃষ্টানরা ঈসা (আ:) এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে বিভ্রান্ড় হয়েছেন এবং শিরকের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। যেহেতু আল্লাহ ইসলামকে তাঁর মনোনীত সর্বশেষ বিধান এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর সর্বশেষ নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন তাই তাঁর ধর্মকে সকল প্রকার বিকৃত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর সম্মান মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ড় সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় শিক্ষা দান করা হয়েছে, যাতে কুরআন ও হাদীসের উপর নির্ভরকারী সকল যুগের সকল দেশের সর্বশ্রেণীর মুসলিম সঠিকভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান ও মর্যাদা দান করতে পারেন এবং সাথে সাথে বাড়াবাড়ি ও অতিভক্তি থেকে দূরে থাকতে পারেন।

১. নবীজী মানুষ ছিলেন বিষয়ক আকীদা

১.১. নবীজীর সকল মর্যাদা ও সম্মান সত্ত্বেও তিনি একজন মানুষ এবং আল্লাহর আবদ ও রাসূল। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর “আবদ” বা দাস (বান্দা) হিসাবে বিশ্বাস করা এবং সাক্ষ্য দেওয়া রিসালাতের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কারণ মুসলিম হতে হলে সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে যে, ‘মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু’ অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর বান্দা বা দাস বলতে বুঝানো হয় মানুষকে। তাই এই

বিশ্বাসের অর্থই হলো তিনি অন্যান্য সবার মত একজন মানুষ। তিনি মানবতার পূর্ণতার শিখরে উঠেছিলেন, তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তবে তিনি মানবতার ঊর্ধ্বে ওঠেন নি।

১.২. পবিত্র কুরআনে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য মানুষের মতই মানুষ ছিলেন। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, মক্কার কাফিররা যখন তাঁর কাছে বিভিন্ন ধরণের অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চায়, তখন তিনি জবাবে বলেন : আমি তো একজন মানুষ মাত্র যাকে আল্লাহ রিসালাতের দায়িত্ব দান করেছেন।

১.৩. অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا

“আপনি বলুন- আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি ওহী (প্রত্যাদেশ) পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মাবুদ(উপাস্য) একমাত্র একই মাবুদ। অতএব যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। (সূরা কাহাফ: ১১০)

১.৪. অনুরূপভাবে অন্য আয়াতে তিনি বলেছেন :

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْا اِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوْهُ ط وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ

“আপনি বলুন-- আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি ওহী (প্রত্যাদেশ) পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মাবুদ (উপাস্য) একমাত্র একই মাবুদ। অতএব তোমরা তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। যারা শিরকে লিপ্ত তাদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ।”

(সূরা হা-মীম আস সাজদা : ৬)

১.৫. অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا

‘(হে মুহাম্মাদ!) আপনি বলে দিন, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক। আমি অবশ্যই একজন মানুষ, একজন রাসূল।” (বনী ইসরাঈল : ৯৩)

১.৬. এভাবে কুরআন করীমের শিক্ষা অনুসারে প্রতিটি মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য সবার মতই মানুষ ছিলেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তবে সৃষ্টির উপাদানে, মানবীয় প্রকৃতিতে তিনি অন্য সবার মতই মানুষ। তাঁর মূল বৈশিষ্ট্য তাঁর মহান কর্মে, তাঁর মহত্তোম চরিত্রে, উপাদানে, সৃষ্টিতে, প্রকৃতিতে অন্য সবার মত মানুষ হলেও যে তিনি সকল মানবীয় দুর্বলতা জয় করেছিলেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসায় ও ইবাদতে অবিচল, অনন্য ও অসাধারণ ছিলেন, তাই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও অন্যান্য মানুষ থেকে অতিরিক্ত কিছু বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন। যেমন সাধারণ মানুষের মত তাঁর শরীরের ঘামে কোন দুর্গন্ধ ছিল না, বরং তাঁর শরীরের ঘাম ছিল অত্যন্ড় সুগন্ধময়। (সহীহ মুসলিম ৪র্থ খন্ড ১৮১৫ পৃঃ হাদীস নং ৮৩ (২৩৩১) তাঁর ঘুম সাধারণ মানুষের মত ছিল না। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ঘুমালে শুধু তাঁর চোখ ঘুমাত, আর তাঁর অন্ড়র (কলব) সজাগ ও সচেতন থাকত। (সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী ১ম খন্ড ২৩৮ পৃ. হাদীস নং ১৩৮ , ২য় খন্ড ৩৪৪ পৃ, হাদীস নং ৫৮৯, ১৩ম খন্ড ২৪৯ পৃ, হাদীস নং ৭২৮১ ও ৪৭৮ পৃ, হাদীস নং ৭৫১৭। সহীহ মুসলিম ১ম খন্ড ৫২৮, হাদীস নং ১৮৬) তিনি তাঁর পিছন দিকেও দেখতে পেতেন। তিনি বলেছেন : ‘তোমরা পরিপূর্ণরূপে রুকু ও সিজদা করবে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, তোমরা যখন রুকু কর এবং সিজদা কর তখন আমি পিঠের দিক থেকে তোমাদেরকে দেখতে পাই।” (সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী ১১ খন্ড ৫২৫, নং ৬৬৪৫, সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড ৩২০, নং ১১১)

১.৭. এভাবে একজন মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য সকল মানুষের মতই একজন মানুষ ছিলেন। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর প্রকৃতি, তাঁর সবই অন্যান্য মানুষের মতই। তবে নবুয়তের দায়িত্বের সাথে আল্লাহ তাঁকে কিছু অতিমানবীয় বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই পবিত্র কুরআনে বা সহীহ হাদীসে তাঁর যে সকল অতিমানবীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে তা মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন। এর বাইরে তার যে কোন অতিমানবীয় গুণাবলী তাঁরা রাসূলের প্রতি আরোপ করেন না। বরং কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী তাঁকে সার্বিকভাবে একজন মানুষ বলে বিশ্বাস করেন।

১.৮. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তাঁর উম্মতকে একথা শিখিয়েছেন। তিনি একদিকে যেমন আল্লাহ তাঁকে যে মর্যাদা দান করেছেন তা তাঁর উম্মতকে জানিয়েছেন। ঠিক তেমনিভাবে বারবার তাঁর উম্মতকে শিখিয়েছেন যে,

তিনি তাঁদের মতই একজন মানুষ। তারা যেন তাঁর ব্যাপারে অতিভক্তির মধ্যে নিপতিত না হয়, তারা যেন তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে। উম্মতের দায়িত্ব হলো তাঁর শিক্ষার বাইরে তাঁর ব্যাপারে কিছু না বলা। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, তিনি তাঁর উম্মতকে তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা অতিরিক্ত কিছু করতে নিষেধ করেছেন এবং তাঁকে শুধুমাত্র আল্লাহর দাস ও তাঁর রাসূল বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন হাদীসে তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি অন্য সবার মত মানবীয় সীমাবদ্ধতায় সীমিত। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- “আমি একজন মানুষ, আমার কাছে অনেক সময় বিচার ফয়সালা দিয়ে মানুষেরা আসে। বাদী ও বিবাদীর মধ্যে থেকে একজন হয়ত অধিকতর বাকপটু হবে, তার কথায় ও বর্ণনা ভঙ্গিতে তাকে সত্যবাদী মনে করে হয়ত আমি তার পক্ষেই বিচার করি। আমি যদি ভুল করে একের সম্পদ অন্যের পক্ষে বিচার করে দিই, তাহলে সে সম্পদ তার জন্য হালাল হবে না। বরং তা হবে তার জাহান্নামের টুকরো, তার ইচ্ছা হলে সে তা গ্রহণ করুক, আর ইচ্ছা হলে পরিত্যাগ করুক।” [(সহীহ বুখারী, ফাতহুর বারী, ৫ম খন্ড, ১০৭পৃ. নং ২৪৫৮, ২৮৮ পৃ. নং ২৬৮০, ১২শ খন্ড ৩৩৯ পৃ. নং ৬৯৬৭, ১৩শ খন্ড ১৫৭ পৃ, নং ৭১৬৯, ১৭২ পৃ, নং ৭১৮১, ১৭৮ পৃ. নং ৭১৮৫। সহীহ মুসলিম ৩য় খন্ড ১৩৩৭-১৩৩৮পৃ, নং ৪-৬ (১৭১৩)]

১.৯. একবার তিনি নামাজের মধ্যে ভুল করেন। সালামের পরে সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেন: হে আল্লাহর রাসূল, নামাজের কি কোন নতুন বিধান নাযিল হয়েছে? তিনি বলেন: কেন? তোমরা এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছ কেন? তাঁরা বলেন: আপনি নামাযে এমন এমন করেছেন, তাই আমরা ভাবলাম যে, নামাযের নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি বলেন- ‘নামাযের নিয়ম পরিবর্তন করা হলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে জানাতাম। কিন্তু আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল কর আমিও তেমনি ভুল করি। যদি আমি কখনো ভুল করি, তাহলে তোমরা আমাকে মনে করিয়ে দেবে।” (সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী, ১ম খন্ড ৫০৩-৫০৪ পৃ, নং ৪০১, সহীহ মুসলিম ১ম খন্ড ৪০০ পৃ, নং ৮৯-৯০ (৫৭২)

১.১০. সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে হযরত রাফি বিন খাদীজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসলেন তখন মদীনার মুসলমানেরা খেজুরের মওশুমের শুরুতে পুরুষ খেজুরের রেণুর সাথে স্ত্রী খেজুরের রেণু মেলাতেন, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন: আমরা সব সময় এভাবে করে আসছি। তিনি বলেন: এ ্না করলেই বোধহয় ভাল হবে।

তখন তারা তা ত্যাগ করেন, ফলে সে বৎসর খেজুরের উৎপাদন কম হয়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা জানান হলে তিনি বলেন: "আমি তো একজন মানুষ মাত্র। যখন আমি তোমাদেরকে ধর্মের বিষয়ে কোন নির্দেশ দান করব, তখন তা তোমরা পালন করবে। আর যদি কোন জাগতিক বিষয়ে ধারণা বা মতামত বলি, তাহলে তো আমি একজন মানুষ মাত্র।" (সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খন্ড, ১৮৩৫-১৮৩৬ পৃ, নং ১৪০ (২৩৬২)

১.১১. অন্য হাদীসে হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দুজন লোক আসেন। তারা কি বলেন আমি জানি না, তবে তাদের কথায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগান্বিত হন এবং তাদেরকে গালি দেন এবং বদ দু'আ করেন। তারা বেরিয়ে গেলে আমি বললাম: হে আল্লাহ রাসূল, এই দুইজন লোক কখনো কোন কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। তিনি বলেন কেন? আমি বললাম: কারণ আপনি তাদেরকে গালি দিয়েছেন এবং বদদোয়া করেছেন। তিনি বলেন: তুমি কি জান না আমার প্রতিপালকের সাথে আমার কি চুক্তি হয়েছে? আমি তো আল্লাহকে বলেছি:

"হে আল্লাহ, আমি তো একজন মানুষ মাত্র, তাই যদি কোন মুসলিমকে আমি কখনো বদ দু'আ করি বা গালি দেই, তাহলে আপনি তা সেই ব্যক্তির জন্য পবিত্রতা ও সাওয়াব বানিয়ে দেবেন।" (সহীহ মুসলিম ৪র্থ খন্ড, ২০০৭ পৃ, নং ৮৮ (২৬০০)।

১.১২. হযরত জায়েদ বিন আরকাম (রা:) হতে বর্ণিত, একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এক জায়গায় (যাকে যম বলে) ভাষণ দানের উদ্দেশ্যে আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আল্লাহপাকের প্রশংসা করে কিছু উপদেশ দিলেন এবং বললেন, সাবধান, হে মানব সন্তান। আমি একজন মানুষ মাত্র। আমার প্রভুর দূত [আজরাঈল (আ:)] পরপারের সংবাদ নিয়ে এসে গেলে আমি তা গ্রহণ করে নেব (ইহধাম ত্যাগ করব)। (মুসলিম)

১.১৩. হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জুতা ও কাপড় নিজেই সেলাই করতেন এবং ঘরে তোমাদের মত কাজ কর্ম করতেন এবং তিনি ছিলেন মানব সম্প্রদায়ভুক্ত একজন মানুষ। নিজের কাপড়ের উকুন নিজেই বাছতেন, ছাগী দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন।

অত্র হাদীসে হযরত আয়শা (রা:) তার স্ত্রী হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ ছিলেন। (তিরমিজী, মেশকাত ৫২০ পৃ,)

২. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেহ মুবারকে মাটি বিদ্যমান সম্পর্কে আকীদা

২.১. মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন:

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

"আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। এ মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব। অত:পর এ মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবো।" (সূরা ত্ব-হা: ৫৫)

২.২. অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

وَ اللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۝ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَ يُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا

"আর আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অত:পর মাটিতেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করাবেন, পুনরায় মাটি হতে তোমাদেরকে বের করবেন।" (সূরা নূহ: ১৭-১৮)

২.৩. অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ

"আল্লাহতা'য়ালার নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তোমরা মানুষরূপে ছড়িয়ে পড়েছ।" (সূরা রূম : ২০)

২.৪. উপরের ৩টি আয়াতেই আল্লাহপাক সকল মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন বলে ঘোষনা দিয়েছেন। পূর্ববর্তী আলোচনায় কুরআন হাদীসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ ছিলেন। সুতরাং মানুষ হিসেবে তাঁর দেহ মুবারকে যে মাটি থাকবেই এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়।

২.৫. প্রথম আয়াত দুটোতে আল্লাহপাক ধারাবাহিকভাবে তিনটি কথা আলোচনা করেছেন। এ তিনটির দ্বিতীয়টি প্রথমটির ফলস্বরূপ। আর তৃতীয়টি দ্বিতীয়টির ফল। অর্থাৎ প্রথমটির পর দ্বিতীয়টি এবং দ্বিতীয়টির পর তৃতীয়টি সংঘটিত হয়। সকলেই জানে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে পবিত্র রওজায় কবরস্থ হয়েছেন। এবং হাশরের দিন সর্বপ্রথম তিনিই কবর থেকে বের হয়ে আসবেন। আর কবর থেকে বের হওয়ার প্রশ্ন এ জন্য যে, তিনি সেখানেই কবরস্থ হয়েছেন আর সেখানে কবরস্থ এ জন্য হয়েছেন যে, তিনি সেখানের মাটি দ্বারা সৃষ্ট। যারা এটা অস্বীকার করছে তাদেরকে বলি, হয় এ কথা

ঘোষনা কর‍ুন যে, আয়াতে উল্লেখিত তিনটি বস্তু কোনটিতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শামিল নেই। অর্থাৎ তিনি মাটি দ্বারা সৃষ্টিও হননি, কবরস্থও হননি এবং হাশরের দিন কবর থেকে বেরও হবেন না। অথবা এ কথা প্রমাণ কর‍ুন যে, তিনি দুটো ব্যাপারে অন্যান্যদের সাথে শামিল থাকলেও প্রথমটির ব্যাপারে শামিল নন। নতুবা আয়াত অনুযায়ী এ কথা স্বীকার করে নিন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মাটির উপাদানে সৃষ্টি।

২.৬. বাতিলপন্থীরা বলে যে, সুরায়ে ত্বা-হা এবং সূরায়ে নূহের উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম উল্লেখ নেই, তাই আয়াতদ্বয় দ্বারা তাঁর দেহ মুবারক মাটির উপাদানে সৃষ্টি হওয়া সাব্যস্ড় হয় না। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, তাহলে তিনি আয়াতদ্বয়ের উল্লেখিত ২য় ও ৩য় বিষয়ের মধ্যে শামিল হলেন কি করে? তাদের কথা অনুযায়ী নাম উল্লেখ না থাকার কারনে তিনি তো এ দুটিতেও শামিল না থাকারই কথা। মূলত এদের কথা কুরআনের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারন আল্লাহপাক আয়াতদ্বয়ে গোটা মানজাতিকেই তো উদ্দেশ্য করে এ কথা বলেছেন, "হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।" এরূপ বললে কেউ বাদ পড়ে যায় না কি?

২.৭. নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেহ মুবারক হতে মাটি অস্বীকার করা কুফরি : বাশারের জন্য মাটি অপরিহার্য। এটা ছাড়া বাশার হতেই পারে না। যখন প্রমাণিত হল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাশার, তখন তাঁর জন্য মাটি অপরিহার্য। তাই তাঁর দেহ মুবারক থেকে মাটি অস্বীকার করা, প্রকৃতপক্ষে তাঁর বাশার হওয়াকে অস্বীকার করা। আর তাঁর বাশার হওয়াকে অস্বীকার করা কুফর। যেহেতু ওটা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। অতএব তাঁর দেহ মুবারক থেকে মাটি অস্বীকার করাও তদ্রূপ কুফর, যেহেতু এটা বাশার বা মানব দেহ অস্বীকার করার নামান্ড়র। তাছাড়া কুরআনের বহু অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে, মানব দেহ মাটির তৈরি। অতএব মানুষ হওয়ার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মাটির তৈরি। তাঁর দেহ মোবারক হতে মাটি অস্বীকার দ্বারা মূলত কুরআনকেই অস্বীকার করা হয়। তাই তাঁর দেহ মুবারক হতে মাটি অস্বীকার করাও নিঃসন্দেহে কুফরি।

২.৮. নূরে নবুওয়াত : মানুষ হিসেবে নবীজীর দেহ মুবারক অন্যান্য মানুষের মত মাটির তৈরি, কিন্তু নবী হিসেবে নূরে নবুওয়াত বিদ্যমান ছিল।

সত্তাগত দিক থেকে তিনি বাশার বা মানুষ, তবে গুণাবলী ও কামালতের দিক থেকে অদ্বিতীয় ও নূর স্বরূপ; হেদায়েতের দৃষ্টিকোন থেকে মানবজাতির জন্য নূরের সুউচ্চ স্তম্ভ। সেই স্তম্ভের আলোক রশ্মি থেকেই মানবজাতির জন্য সঠিক পথের সন্ধান লাভ হয়। যার কিরণমালা আজও দীপ্তিমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাশার তথা মানুষ হয়েও নূর তথা হেদায়তের আলোকবর্তিকা।

৩. জাতি নূর প্রসঙ্গে আকীদা

৩.১. কুরআন ও হাদীসের আলোকে পূর্ববর্তী আলোচনা হতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ ছিলেন এবং তাঁর দেহ মুবারকে মাটির উপাদান ছিল। এর বিপরীত আকীদা রাখা কুফরি। বর্তমানে কিছু সংখ্যক বাতিলপন্থী বলে বেড়াচ্ছে যে, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারক আল্লাহর জাতি বা স্বীয় স্বত্তার নূরে তৈরি। অর্থাৎ তিনি মহান আল্লাহপাকের জাত। আবার কেউ কেউ বলছে, মহান আল্লাহপাক তাঁর হাবিবকে সৃষ্টি করার কোন উপকরণ না পেয়ে আপন ডান হাত দ্বারা বাম সিনার থেকে খামছি মেরে এক টুকরো নূর বের করেন এবং সেই নূর দ্বারা তাঁর হাবিবকে সৃষ্টি করেন ইত্যাদি। এরূপ বলা, লেখা, বিশ্বাস করা সম্পূর্ণরূপে কুরআন সুন্নাহর পরিপন্থী, সুস্পষ্ট কুফর ও শিরক। উল্লেখিত আকীদা বিশ্বাস দ্বারা যেসব কুফরি ও শিরকি বিষয়সমূহ ফুটে ওঠে তা হল-

(১) মহান আল্লাহপাকের তাশবীহ বা সাদৃশ্য রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। মহান আল্লাহপাকের দেহ আছে এবং তা' নূরের বা আলোর বলে প্রমাণিত হয়। এভাবে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সাদৃশ্য নির্ধারণ করে তাশবীহ করা হয়। (নাউযুবিল্লাহ)

(২) মহান আল্লাহপাক উপকরণ ব্যতীত কিছু তৈরি করতে অক্ষম বলে প্রমাণিত হয়। (নাউযুবিল্লাহ)

(৩) নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহপাকের জাতের অংশ বলা সুস্পষ্ট শিরক।

এসব বাতিলপন্থীরা তাদের এ দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য কুরআনের কিছু আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে। একই সাথে কিছু মওজু হাদীস, হাদীসের মিথ্যা ব্যাখ্যা, অনির্ভরযোগ্য ঘটনা পেশ করে থাকে।

৩.২. জাতিনূর সম্পর্কিত কয়েকটি মওজু হাদীস :

(১) বাতিলপন্থীগণ যে সব হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে আল্লাহর নূরের অংশ সাব্যস্ড় করে থাকে, সেগুলোর অধিকাংশই মওজু তথা জাল ও মিথ্যা হাদীস। মিথ্যা হাদীসকে হাদীস বলে বর্ণনা করা পরিষ্কার হারাম। আর হারামকে হারাম না জানা সকলের মতেই কুফরি। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যা হাদীস আরোপ করে, সে যেন নিজের জন্য জাহান্নামকে আপন ঠিকানা বানিয়ে নেয়।"

(২) বাতিল পন্থীরা বলে- اَنَا مِنَ اللهِ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنِّىْ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি আল্লাহর অংশ হতে পয়দা আর ঈমানদারগণ আমার অংশ হতে পয়দা হয়েছে।"

এ হাদীসটি সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম মোল্লা আলী ক্বারী মওজুয়াতে কবীর কিতাবের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 'এ হাদীস সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন যে, এটি জাল ও মিথ্যা হাদীস। জরকাশী বলেছেন যে, এ কথার সনদ অজ্ঞাত। আবু তাইমিয়া বলেছেন যে, হাদীসটি জাল।'

ইমাম ছাখাবী মাকাছেদে হাসানার ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, এ হাদীসটি জাল।

(৩) এ জাতীয় আরেকটি হাদীস এইরূপ:

كُلُّ الْخَلَا ئِقِ مِنْ نُّوْرِىْ وَ اَنَا مِنْ نُّوْرِ اللهِ

"সকল মাখলুক আমার নূর দ্বারা আর আমি আল্লাহর নূর দ্বারা সৃষ্টি।" এই হাদীসটি সহীহ সনদ সহকারে হাদীসের নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ কোন কিতাবে নেই।

(৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচিত বিষয়টিকে ঝামেলাপূর্ণ ও ভেজাল মিশ্রিত করে দেয়ার পক্ষে কতগুলো অনর্থক বানোয়াট কথার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইকারী মুহাদ্দিসগণ বানোয়াটভাবে রচিত অনর্থক কথাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে বিষয়টিকে নির্ভেজাল রাখার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। সেসব অনর্থক কথাগুলোর দু'একটি উল্লেখ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

১. কেউ কেউ বলেছেন- وَ كَانَ مَوْجُوْدٌ اَقْبَلَ اَبَوَيْهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পিতা মাতার পূর্বেও সৃষ্টিজগতে অস্তিত্ববান ছিলেন।

২. আল্লাহ নাকি বলেছেন- فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ نُّوْرِىْ

আমি আমার নূর থেকে এক মুঠো নূর নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করেছি।

৩. وَكُلٌّ عَالِمٍ خُلِقَ مِنْهُ প্রত্যেকটি সৃষ্টবস্তুকে সৃষ্টি করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর থেকে।

হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইমূলক কিতাব 'আল -আছারুল মারফুআহ ফিল আখবারিল মাওজুআহ' নামক কিতাবে উক্ত তিনটি ভিত্তিহীন কথা উল্লেখ করে সিদ্ধান্ড় দেয়া হয়েছে :

وَ كُلُّ ذٰلِكَ كِذْبٌ مُفْتَرِى فَا تِّفَاقُ اَهْلُ الْعِلْمِ بِحَدِيْثِهٖ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস সম্পর্কে অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের ঐক্যমতে এ কথাগুলোর প্রত্যেকটিই ভিত্তিহীন মিথ্যা বলে সাব্যস্ড় হয়েছে।

(৫) প্রকাশ থাকে যে, হাদীস বলে সাধারণ্যে প্রচলিত নিম্নে বর্নিত উক্তিগুলো মুহাদ্দিসগণের ঐক্যমতে জাল ও মিথ্যা। 'জারকানীর' ২৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে:

১. উল্লেখ করা হয় যে, আল্লাহপাক নিজ চেহারা হতে এক মুষ্ঠি নূর বের করে উক্ত নূরের প্রতি দৃষ্টিপাত করার পর উহা হতে তীক্ষ্ম আলো বিশিষ্ট অনেকগুলো ঘামের ফোটা বের হলো। এর প্রতিটি ফোটা থেকে আল্লাহপাক একজন নবী সৃষ্টি করলেন। আল্লাহপাকের চেহারার উক্ত মুষ্টি নূরই হলেন আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

২. আরো উল্লেখ করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি অতি উজ্জ্বল আলোকময় তারকা আকারে বিদ্যমান ছিলেন।

৩. আরও উল্লেখ করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে গোটা সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৪. আরও উল্লেখ করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিতা-মাতা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই বিদ্যমান ছিলেন।

৫. আরো উল্লেখ করা হয় যে, জিব্রাইল (আ:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কুরআন নিয়ে আসার পূর্বেই তিনি কুরআনের হাফেজ ছিলেন।

উপরোল্লিখিত কথাগুলো এবং এ জাতীয় অন্যান্য কথাগুলো সম্পর্কে হাফেজ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে তাইমিয়া তার ফাতাওয়ার মধ্যে বলেছেন, এগুলো মুহাদ্দেসীনদের ঐক্যমতে বানোয়াট ও মিথ্যা।

নবীগণ কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সৃষ্টি হননি। বরং সকলে নিজ নিজ মা-বাপ থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। হাফেজ ইবনে কাসীর তাঁর তারীখের মধ্যে হাফেজ ইবনে তাইমিয়ার উক্ত বক্তব্য উল্লেখ করে সেটিকে সমর্থন দিয়েছে।

৩.৩. নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া প্রসঙ্গ : যারা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারকে মাটির অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং তার দেহ মুবারক আল্লাহর জাতি নূরের তৈরি বলে বিশ্বাস করে, তারা তাদের দাবির স্বপক্ষে এ যুক্তি দেখায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যেহেতু ছায়া ছিল না, তাই তিনি নূরের তৈরি। কেননা মাটির দেহেরই ছায়া হয়, নূরের কোন ছায়া হয় না।

যদি বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, মুজিজা স্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছায়া মাটিতে পতিত হত না, তাহলে যে কোন মুসলমান একে মেনে নিতে কোন দ্বিধা সংকোচ করতে পারে না। কিন্তু এ ব্যাপারে একটি সহীহ হাদীসও মওজুদ নেই। হাদীসের প্রচলিত ছয়টি সহীহ কিতাব এবং অন্যান্য কিতাবের মধ্যে এ জাতীয় কোনো সহীহ হাদীস নেই। জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েছে কুবরা গ্রন্থে ১ম খন্ডের ৭১ পৃষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পায়খানা ও প্রস্রাব সম্পর্কে মু'জিযার অধ্যায়ে এ সম্পর্কে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হাদীস বিশারদদের মতে সেটি নির্ভরযোগ্য নয়। অধিকন্তু এরূপ অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছায়া ছিল।

৩.৪. নবীপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জাতি নূর বলা ইতিহাস ও বিবেক বির"দ্ধ কথা :

(১) বাতিলপন্থীরা বলে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আল্লাহর জাতি নূরই না হতেন, তাহলে কি করে তিনি মি'রাজে যেতে সক্ষম হলেন? তারা বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূর আর আল্লাহও নূর। আর মি'রাজের মাধ্যমে এই উভয় নূরের মধ্যে মহা মিলন ঘটেছিল অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর আল্লাহর নূরের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। তারা তাদের গজলের মধ্যে বলে থাকে যে, "নূরেতে নূর মিশে গেল।" (নাউযুবিল্লাহ) এর উত্তরে প্রথম কথা এই যে, "নূরেতে নূর মিশে গেল" কথাটি শরীয়াতের দৃষ্টিতে জঘন্য কুফরী। যারা আল্লাহ এবং মি'রাজ সম্পর্কে জাহেল তারাই এমন কথা বলতে পারে।

(২) এ সম্পর্কে দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা তাদেরকে প্রশ্ন করি, নূর না হলে মি'রাজ সম্ভব নয়, এ কথা তোমরা কোথায় পেলে? তাহলে হযরত ঈসা (আ:) আসমানে কিভাবে গিয়েছিলেন? হযরত ইবরাহিম (আ:) আগুন না হয়েও কিভাবে নমর"দের জ্বলন্ড় অগ্নিকুন্ডে অবস্থান করেছিলেন? মি'রাজ কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি বিশেষ মুজিয়া ছিল না? আসলে এরা

মুজিযাগুলোকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর মানুষ না হওয়ার এবং আল্লাহর জাতি নূর হওয়ার প্রমাণ হিসাবে ধরে নিয়েছে।

তাদেরকে আরো জিজ্ঞেস করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামতো জুতা মুবারক ও লেবাস নিয়েই মি'রাজে গিয়েছিলেন, তাহলে সেগুলোও কি নূর ছিল?

(৩) যারা বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁর দেহ মোবারক শুধু নূরের তৈরি, এতে মাটির কোন উপাদান নেই, তাদেরকে প্রশ্ন করি, যদি তাই হয় তাহলে বাল্যকালে তাঁর দুধ মা হালীমা (রা:) এর বাড়িতে অবস্থানকালে সিনা চাক বা বক্ষ বিদীর্ণের সময় হযরত জিব্রাঈল (আ:) তার কলব চিরে এক টুকরো কালো মাংস বের করে কেন বলেছিলেন- আপনার এ মাংস টুকরোটির মাধ্যমে শয়তান আপনার ক্ষতি করতে পারত? (মাদারেজুন্নবুয়াত, ২য় খন্ড, ২২ পৃঃ)

(৪) যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর জাতই হবেন, তবে তার কাছে ওহি আসার প্রয়োজন কি ছিল? তিনি তো আল্লাহরই অংশ। তিনি বিবাহ করেছিলেন। তবে আল্লাহ বিবাহ করেছেন? তার সন্ড়ান হয়েছিল। তবে মা ফাতেমা কার সন্ড়ান? আল্লাহর, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর?

(৫) মদীনার মসজিদে যাঁর রওজা আছে, তিনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কখনোই আল্লাহর অংশ তিনি নন। তাহলে কি আমরা আল্লাহর অংশকে কবরে রেখেছি?

(৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি জাতি নূর হন তবে সে নূরের এক অংশ ফাতেমা (রা:) এবং তার মাধ্যমে সব সৈয়দ কিছু কিছু লাভ করেছেন। আর বংশে সৈয়দ হলেই সে জান্নাতি হবে এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে কি? খোদা না কর"ন কোন সৈয়দ যদি জাহান্নামে যান তবে প্রশ্ন জাগে খোদার নূর কি জাহান্নামে জ্বলবে?

(৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটির নিচে শুয়ে আছেন। আল্লাহর জাতের অংশ কি কখনও মাটির নিচে থাকতে পারে? তাঁর খাহেশাত ছিল, খানাপিনার প্রয়োজন হত। তিনি যদি জাতি নূর হন, তবে তো এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে আল্লাহপাকের একটা অংশ খাওয়া দাওয়া করতেন (নাউযুবিল্লাহ)।

(৮) তিনি সালাত পড়তেন, সিজদা করতেন আল্লাহকে। তিনি যদি জাতি নূর হন তাহলে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে আল্লাহপাকের একটি অংশ আরেকটি অংশকে সিজদা করছে। এটা কেমন করে হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে করেছেন, তাঁর সন্ড়ানাদি হয়েছে। তিনি যদি জাতি নূর হন এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে আল্লাহপাকের একটা অংশ অমর, অনাদি, অনন্ড়- আর একটা অংশ

মরণশীল যার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুতেই আল্লাহর জাতি নূর হতে পারেন না।

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরকে আল্লাহর জাত হতে বেরিয়ে আসা নূর বলে বিশ্বাস করবে তারা কাফির।

৪. নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আ'লিমুল গায়েব ছিলেন না বিষয়ক আকীদা

৪.১. আল্লাহপাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়া, আখেরাত, বেহেশত, দোজখ ইত্যাদির অনেক কিছু জানিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের জ্ঞানের ঊর্ধ্বে অনেক গোপনীয় ও ভবিষ্যতের জ্ঞান তাকে আল্লাহ দান করেন। আমরা আগেই দেখেছি তিনি অসংখ্য ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন যা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তাঁর আরো অনেক ভবিষ্যদবাণী রয়েছে যা ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হবে বলে প্রতিটি মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন:

قُلْ اِنْ أَدْرِىٓ أَ قَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّىٓ اَمَدًا ۝ عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۝ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۝ لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَ اَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا

"আপনি বলুন- আমি জানি না তোমাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক তার জন্য মেয়াদ স্থির করবেন। তিনি গায়েবের (অদৃশ্যের) জ্ঞানী, তিনি তাঁর গায়েবের (অদৃশ্যের) জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত, সেক্ষেত্রে আল্লাহ সেই রাসূলের আগে ও পিছে প্রহরী নিয়োগ করেন, যেন তিনি জানতে পারেন যে, রাসূলগণ তাদের প্রভুর রিসালাতের বাণী পৌঁছিয়েছেন কিনা। তাঁদের কাছে যা আছে তা তাঁর জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।" (সূরা জিন: ২৫-২৮)

৪.২. এভাবে আমরা জানতে পারছি যে, আল্লাহ রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর রাসূলদেরকে অদৃশ্য জগতের ও ভবিষ্যতের অনেক কিছু জানান। সাথে সাথে আমরা জানতে পারছি যে, সার্বিক ভবিষ্যতের কথা তিনি রাসূলদেরকে জানান না। এজন্য এখানে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, কাফেরদেরকে যে শাস্তির ওয়াদা করা হয়েছে তা কি শীঘ্রই আসবে না দেরি করে আসবে তা তিনি জানেন না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম গায়েব জানতেন না, ভবিষ্যতের জ্ঞান তাঁর ছিল না। ইতিপূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে আমরা তা দেখতে পেয়েছি, যেখানে তিনি বারবার জানিয়েছেন যে, তিনি অন্য সবার মতই মানুষ, ভুল করতে পারেন। মানুষের মনের কথা বা গোপন কথা তিনি জনেন না, তাই তিনি তাদের প্রকাশ্য বক্তব্য অনুযায়ী বিচার করেন। এ ব্যাপারে কুরআন করীমে আল্লাহ বলেছেন:

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللهِ وَ لَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ اِنْ اَ تَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَىَّ

"আপনি বলুন: আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডারসমূহ রয়েছে, অদৃশ্য (গায়েব) সম্বন্ধেও আমি অবগত নই, আর আমি তোমাদেরকে একথাও বলি না যে, আমি ফিরিশতা। আমি তো শুধুমাত্র আমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করা হয় তারই অনুসরণ করি।" (সূরা আনআম: ৫০)

৪.৩. অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللهُ ؕ وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَ مَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

"আপনি বলুন আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতাও আমার নেই। আমি যদি গায়েব (গোপন জ্ঞান) জানতাম তাহলে প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম। আর কোন অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। আমি তো শুধুমাত্র ভয় প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদ প্রদানকারী বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।" (সূরা আরাফ : ১৮৮)

৪.৪. অন্য স্থানে কাফিরদের বিভিন্ন অপবাদ ও বিতন্ডার প্রতিবাদে আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন তাদেরকে জানিয়ে দেন, তিনি একজন সতর্ককারী রাসূল মাত্র। কোন গায়েবী ক্ষমতা বা জ্ঞানের দাবিদার তিনি নন। তাদের ভবিষ্যতে কি আছে তা কিছুই তিনি জানেন না।

আল্লাহ বলেন:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَ مَآ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَ لَا بِكُمْ ؕ اِنْ اَ تَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ وَ مَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

"আপনি বলুন: আমি তো প্রথম রাসূল নই। আর আমি জানি না, আমার এবং তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমি আমার প্রতি যা ওহী প্রেরণ করা হয় কেবলমাত্র তারই অনুসরণ করি। আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।" (সূরা আহকাফ : ৯)

৪.৫. অন্যত্র আল্লাহ বলেন :

وَ لَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِیْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَعْلَمُ الْغَیْبَ وَ لَاۤ اَقُوْلُ اِنِّیْ مَلَكٌ وَّ لَاۤ اَقُوْلُ لِلَّذِیْنَ تَزْدَرِیْۤ اَعْیُنُكُمْ لَنْ یُّؤْتِیَهُمُ اللّٰهُ خَیْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ ۚۖ اِنِّیْۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِیْنَ

"আমি তো তোমাদেরকে বলি না যে, আল্লাহর ধন ভান্ডার আমার নিকট রয়েছে আর আমি তো গায়েব জানিনা; এও বলিনা যে, আমি একজন ফেরেশতা। এ কথাও বলি না যে, তোমাদের চক্ষু যে সব লোককে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, আল্লাহ তাদেরকে কোনো কল্যাণ দেন না। তাদের মনের অবস্থা আল্লাহই ভালো জনেন। এই ধরণের কথা যদি আমি বলি, তাহলে আমি তো তখন একজন জালিম।" (সূরা হূদ : ৩১)

৪.৬. আল্লাহতা'আলা আরো বলেন :

وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛؕ وَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِیْنَةِ ؔۛ مَرَدُوْا عَلَی النِّفَاقِ ۟ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَیْنِ ثُمَّ یُرَدُّوْنَ اِلٰی عَذَابٍ عَظِیْمٍ

"তোমাদের চতুষ্পার্শ্বের বেদুঈনদের মধ্যে মুনাফিক রয়েছে, মদীনাবাসীদের মধ্যে থেকেও যারা মুনাফিক তারা মুনাফিকীতে পাকাপোক্ত হয়েছে। তুমি তাদের জানো না, আমি তাদের জানি। সে দিন দূরে নয়, যখন আমি তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দেব। পরে তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে।" (সূরা তাওবা : ১০১)

৪.৭. আল্লাহতা'আলা আরো বলেন :

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰی سَوَآءٍ ؕ وَ اِنْ اَدْرِیْۤ اَقَرِیْبٌ اَمْ بَعِیْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ

"তারা যদি অন্য দিকে মুখ ফিরায়, তাহলে তুমি বলে দাওঃ আমি তো প্রকাশ্যভাবে তোমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছি। এখন আমি জানি না যে, তোমাদের নিকট যে জিনিসের ওয়াদা করা হচ্ছে, তা খুব নিকটবর্তী কিংবা বহু দূরে।" (সূরা আম্বিয়া : ১০৯)

৪.৮. আল্লাহতা'আলা আরো বলেন :

مَا كَانَ لِیَ مِنْ عِلْمٍۭ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰۤی اِذْ یَخْتَصِمُوْنَ ﴿۶۹﴾ اِنْ یُّوْحٰۤی اِلَیَّ اِلَّاۤ اَنَّمَاۤ اَنَا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ

"(ওদের বল) আমি সেই সময়ের কিছুই জানি না, যখন উচ্চতর জগতে ঝগড়া হচ্ছিল। আমাকে তো ওহীর মাধ্যমে এসব কথা শুধু এজন্য বলে দেয়া হয়

যে, আমি সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র।" (সূরা সাদ : ৬৯-৭০)

৪.৯. আল্লাহতা'আলা অন্যত্র বলেন :

یَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَیَّانَ مُرْسٰىهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّیْ ۚ لَا یُجَلِّیْهَا لِوَقْتِهَاۤ

"এই লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে : সেই কিয়ামতের সময়টি কখন আসবে? তুমি বল: এই বিষয়ে জ্ঞান তো কেবলমাত্র আমার রব- এরই রয়েছে। তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে কেবল তিনিই তা প্রকাশমান করবেন।" (আ'রাফ : ১৮৭)

৪.১০ আল্লাহতা'আলা আরো বলেন :

یَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ مَا یُدْرِیْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِیْبًا

"লোকেরা তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় কখন আসবে? তুমি বল: সে বিষয়ে জ্ঞান তো কেবলমাত্র আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত। তুমি কি করে জানবে, হয়ত কিয়ামত নিকটেই এসে গেছে।" (সূরা আহযাব: ৬৩)

এই সবক'টি আয়াতের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে, 'রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আ'লিমুল গায়েব ছিলেন না।'

৪.১১. হযরত আয়েশা (রা:) বলেছেন: আমার বিবাহের দিন সকালে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করেন, তখন আমার কাছে দুজন বালিকা বসে ছড়া পড়ছিল। তারা তাদের কথার মাঝে মাঝে বলছিল যে, "আমাদের মধ্যে একজন নবী রয়েছে যিনি আগামীকাল (অর্থাৎ ভবিষ্যতে) কি ঘটবে তা জানেন।" তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "এই কথা বলবে না, কারণ আগামীতে (ভবিষ্যতে) কি আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না।" (সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী ৭ম খন্ড ৩১৫ পৃ, নং ৪০০১ ও ৯ম খন্ড ২০২ পৃ, নং ৫১৪৭, সুনাদে ইবনে মাজাহ ১ম খন্ড ৬১১ পৃ, নং ১৮৯৭, সহীহ সুনানি ইবনে মাজার, আলবানী, ২য় খন্ড ১৩৫ পৃ, নং ১৫৫১ (বর্ণিত শব্দ ইবনে মাজাহর), সুনানে তিরমিযি ৩য় খন্ড ৩৯৯, নং ১০৯০, সুনানে আবি দাউদ ৪র্থ খন্ড, ২৮৩ পৃ, নং ৪৯২২, জামিউল উসুল ৮ম খন্ড ৪৫৬)

৪.১২. অন্য হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না।" (সহীহ বুখারী, ফাতুহল বারী ৮ম খ ৩৭৫ নং ৪৬৯৭)

৪.১৩. হযরত আয়েশা (রা:) বলেন : "যে ব্যক্তি মনে করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানেন সে আল্লাহকে বড় অপবাদ দিল।" (বুখারী)

৪.১৪. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বিভিন্ন দল এসে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামও বুঝি গায়েব জানার দাবি করেছেন। এ ব্যাপারে তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে হাতের মুঠির মধ্যে কিছু গোপন করে জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন তো আমাদের মুঠার মধ্যে কি আছে।' নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন : "আমি কোনো গণকদার নই। জেনে রাখো, গণকদার, গণকদার গোষ্ঠী সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।"

৪.১৫. মুসলিমের দায়িত্ব হলো আল্লাহর সকল বাণী ও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল শিক্ষাকে সর্বান্ড়করণে বিশ্বাস করা। মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তাঁকে নবুয়তের জ্ঞান দান করেছিলেন। অদৃশ্য জগতের ও ভবিষ্যতের অনেক কিছু তাঁকে জানিয়েছিলেন। তবে আল্লাহর জানানো এ সকল জ্ঞানের বাইরে কোন গায়েবী এলেম তাঁর ছিল না। তিনি ভবিষ্যত জানতেন না বা গায়েবী (অদৃশ্য বা গোপন) জ্ঞান তাঁর ছিল না। যেহেতু কুরআন ও হাদীসে এভাবে বলা হয়েছে, তাই আমরা এভাবেই বিশ্বাস করব। এর বাইরে বাড়িয়ে কিছু বলব না আমরা, কারণ তাতে আমরা বাড়াবাড়ি ও অতিভক্তির মধ্যে নিপতিত হব, যা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন।

৫. নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সদা সর্বত্র হাযির নাযির নন বিষয়ক আকীদা

৫.১. হাযির অর্থ উপস্থিত। নাযির অর্থ যিনি দেখেন। মানুষের নেক বদ, ভাল মন্দ, সৎকর্ম, অপরাধ এক কথায় সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর অনু-পরমাণু পর্যন্ড় সব সময়ে একই সাথে আল্লাহপাকের দৃষ্টির সামনে উপস্থিত। এই অর্থে আল্লাহপাক সদা সর্বত্র হাযির ও নাযির।

৫.২. কুরআনপাকে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন:

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু ওঠে। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।' (সূরা হাদীদ: ৪)

৫.৩. আল্লাহতা'আলা অন্যত্র বলেছেন :

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۖ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার আত্মা তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ের রগ অপেক্ষা নিকটতর।" (সুরা কাফ : ১৬)

৫.৪. আল্লাহতা'আলা আরো বলেছেন :

وَ اِذَا سَاَ لَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ

"আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই।" (সূরা বাকারা : ১৮৬)

৫.৫. আল্লাহতা'আলা আরো বলেন : فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

"তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও না কেন, সেখানেই আল্লাহর দৃষ্টি রয়েছে।" (সূরা বাকারা: ১১৫)

৫.৬. বিশ্বের কোন স্থানে কখন কোন বৃক্ষটির কোন পাতাটি ঝরছে, আল্লাহপাক তা অবশ্যই জানেন। আল্লাহতা'য়ালার জ্ঞান ও দৃষ্টি এতই প্রশস্ড় ও ব্যাপক যে, সৃষ্টিজগতের সর্বস্থানে, সর্বকালে আগত-অনাগত দূর ভবিষ্যতে ও অদূর ভবিষ্যতে অস্ড়িত্বলাভের সম্ভাবনাময় সবকিছুই আল্লাহর জানা। অনস্ড়িত্বের জগতে রয়ে গেছে কিন্তু অস্ড়িত্বের জগতে আসবে, এমন সবকিছু আল্লাহর সুস্পষ্ট জানা রয়েছে। এসব অর্থে আল্লাহ জ্ঞান ও দর্শনের দিক থেকে সর্বত্র হাযির ও নাযির। এ অর্থে আল্লাহর সমকক্ষতায় কারো প্রবেশাধিকার নেই। এ হলো আল্লাহর রহমত দর্শন ও জ্ঞানগত তাওহীদ। এ তাওহীদ আকীদার বিপরীত কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, অন্য কেউ হোক আর না হোক, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সমতুল্য, তাই তিনি সদা সর্বত্র হাযির ও নাযির এবং আল্লাহর মতই তিনি সবকিছু জানেন, দেখেন ও শুনেন, তবে ঐ ব্যক্তি অবশ্যই শিরক করল, কুফর করল।

৫.৭. হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, সব প্রশংসা সেই সত্তার যার কান সব আওয়াজ শুনে থাকে। ঝগড়াকারিনী 'খাওলা' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এল, সে ঘরের এক কোণে বসে তাঁর সাথে কথা বলছিল। আমি তার কথা শুনতে পাইনি। আল্লাহতা'য়ালা সাত আসমানের উপর হতে তার কথা শুনলেন এবং এ আয়াত নাযিল করলেন-

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَ اللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ ۢ بَصِيْرٌ

"হে রাসূল! আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদও করছে। আল্লাহ তোমাদের

কথোপকথন শুনেন; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা মুজাদালা : ১)

৫.৮. অতীতকালে বহু ঘটনার স্থলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাযির ও নাযির ছিলেন না : আল্লাহ সর্বত্র হাযির অথচ অতীতকালে বহু ঘটনার স্থলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযির নাযির ছিলেন না। যেমন-

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُوْنَ

"এটা গায়েবের খবর যা আপনাকে আমি ওহি দ্বারা অবহিত করেছি। আপনি তো তাদের (ইউসুফের ভাইদের) সাথে ছিলেন না যখন তারা (ইউসুফকে কুপে নিক্ষেপ করার ষড়যন্ত্রমূলক কাজে) মতৈক্যে পৌঁছেছিল এবং (পিতা ইয়াকুবকে ফাঁকি দেবার জন্য রকমারী) চক্রান্ড় করেছিল।" (সূরা ইউসুফ : ১০২)

تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَاصْبِرْ ۖ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

"এ সব গায়েবের খবর আমি আপনাকে ওহি দ্বারা অবহিত করছি যা এর আগে আপনি জানতেন না এবং আপনার জাতি জানত না। সুতরাং ধৈর্য্য ধারণ করুন, শুভ পরিণাম মুত্তাকিদেরই জন্যে।" (সূরা হুদ : ৪৯)

হযরত মরিয়াম এর লালন পালনের ভার কে গ্রহণ করবে এ বিষয়ে যখন তীর চালনা হচ্ছিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে হাযির ছিলেন না এবং ঐ ঘটনার দর্শকও ছিলেন না। আল্লাহ বলেন-

ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

"এটা গায়েবের খবর যা আপনাকে আমি ওহী দ্বারা অবহিত করেছি। মরিয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এ জন্য যখন তারা তাদের কলম (লেখনি বা তীর) নিক্ষেপ করছিল আপনি তখন তাদের নিকট ছিলেন না এবং তারা যখন এ বিষয়ে বাদানুবাদ করছিল তখনও আপনি তাদের নিকট ছিলেন না।" (সূরা আলে ইমরান: ৪৪)

অনুরূপভাবে আল্লাহ বলেন-

إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ

"মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন আপনি (তূর এর) পশ্চিম প্রান্ড়ে হাযির ছিলেন না।" (সূরা কাসাস : ৪৪)

৫.৯. কুরআনের একটি আয়াত : এখানে আমরা কুরআনের একটি আয়াত পেশ করছি। কুরআনের অন্য আয়াত দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ড় এর জবাব

দানের জন্য আমরা প্রতিপক্ষকে আহ্বান জানাই।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ

"আপনি কি অনুধাবন করেন না আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থজন হিসাবে উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। তারা এতদপেক্ষা কম হোক আর বেশি হোক; তারা যেখানেই থাকুন না কেন আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন।" (সূরা মুজাদালা : ৭)

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি হাযির নাযির হতেন তবে উক্ত আয়াতে তিন ব্যক্তির মধ্যে গোপন পরামর্শে আল্লাহর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হিসাবে ধরে নিতেন।

সুতরাং ৩+১ = ৪, ৫+১ = ৬ যেদিন এই অঙ্ক ভুল প্রমাণিত হবে সেদিনই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযির নাযির প্রমাণিত হবেন। অথবা ৩+১ = ৫, ৫+১ = ৭ এই অঙ্কের ফল যিনি শুদ্ধ বলবেন কেবল তার জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযির নাযির।

৫.১০. দুনিয়ার জীবনেও নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বস্থানে হাযির ছিলেন না : দুনিয়ার জীবনেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব স্থানে হাযির থাকার অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন না। যেমন আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"আপনি যখন দেখেন, তারা আমার আয়াত সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন আপনি দূরে সড়ে পড়বেন, যে পর্যন্ড় না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর জালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবেন না।" (সূরা আনআম : ৬৮)

৫.১১. মুনাফিক প্রসঙ্গ : মুনাফিকদের কিছু লোক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ পরিচয় পেয়েছিলেন। কিন্তু মুনফিকদের আরো কিছু লোক এমন রয়ে গেল, যাদের পূর্ণ পরিচিতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারেননি। এদের পরিচয় কিয়ামতের মাঠে হবে। এতটুকুই আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছেন। এসব অপরিচিত মুনাফিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর প্রথমে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, এরপর সম্পূর্ণ রূপে ধর্মত্যাগী মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। এদের সম্পর্কে আলোচনার বিষয় হলো, কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর উম্মতকে হাউজে কাউছারের পানি পান করাবেন, এ সময় উল্লেখিত মুরতাদ লোকগুলো হাউজে কাউছারের পানি পান করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হবে; এবং হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে চিনবেন, আর তারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতে পারবেন। কিন্তু এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: " হে রব! তারা তো আমার সাহাবী, তারা তো আমার সাহাবী।" তখন জবাবে বলা হবে:

اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اُحْدِثُوْا بَعْدَكَ

'আপনার মৃত্যুর পরে এরা কি অন্যায় করেছে তা আপনি জানেন না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তখন আমি আল্লাহর নেক বান্দা (হযরত ঈসা) যে কথা বলেছেন সে কথাই বলব, আমি বলব:

"আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী ছিলাম (তাদের কার্যকলাপের বিষয়ে অবগত ছিলাম)। যখন আপনি আমাকে মৃত্যু দান করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের পর্যবেক্ষক, আর আপনি তো সর্ববিষয়ে সাক্ষী। যদি আপনি তাদেরকে শাস্ড়ি দান করেন তাহলে তারা আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তাহলে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়েদা : ১১৭-১১৮) [সহীহ বুখারী ও ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খন্ড ৩৮৬ পৃ. নং ৩৩৪৯ ও ৪৭৮ পৃ. ৩৪৪৭, ৮ম খন্ড ৩৮৬পৃ, নং ৪৬২৬ ও ৪৩৭-৪৩৮পৃ, নং ৪৭৪০, ১১শ খন্ড ৩৭৭পৃ, নং ৬৫২৬, সহীহ মুসলিম ৪র্থ খন্ড ২১৯৫ নং ৫৮ (২৮৬০)]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সাহাবী হিসেবে রেখে গেছেন। তাই তিনি কিয়ামতের দিন তাদেরকে আপন সাহাবী বলে পরিচয় দেবেন। তারা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর ধর্মত্যাগী হয়ে সাহাবীদের দল থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিছুই জানা থাকবে না। কথা হলো, দুনিয়ার হায়াত থেকে মৃত্যুর পরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সদা সর্বত্র হাযির নাযির হন, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিচিত এ লোকগুলো তাঁর মৃত্যুর পর কাফির হয়ে গেল, অথচ এদের সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুই জানলেন না কেন?

এতে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদা সর্বত্র হাযির নাযির নন।

৫.১২. সালাম পৌঁছিয়ে দেয়া হয় : নামাযের ভিতরে ও বাইরে মুসলমানরা 'হে নবী ও হে রাসূল আপনার প্রতি সালাম' বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দিতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তাঁর উম্মতের পঠিত সালাম ও দরূদ পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা একদল ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহর একদল ফেরেশতা রয়েছেন, তারা জমিনে ভ্রমণরত অবস্থায় থাকেন। তাঁরা আমাকে আমার উম্মতের সালাম পৌঁছিয়ে দেন।"

অন্য হাদীসে রয়েছে, যে আমার প্রতি সালাম পাঠ করে, আমি তার সালামের উত্তর দিয়ে থাকি। সারকথা হলো, সালাম ও সালামের উত্তরের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হয় না। হাযির ও নাযির হতে হয় না। সালামের আদান প্রদান ফেরেশতাদের মাধ্যমে হয়। উম্মতের সালামের উত্তর দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবিবকে সাহায্য করেন। উম্মতের সালামের জওয়াবের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মনোযোগী করে দেন। যদি তিনি গায়েব জানতেন, কিংবা হাযির নাযির হতেন, তবে এরূপ কেন হয়?"

৫.১৩. মু'আজ ইবনে জাবাল (রা:) এর ঘটনা : ইহজীবন ত্যাগ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরবর্তীতে হাযির ও নাযির থাকবেন না। এ সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি উক্তি অত্যন্ড় পরিষ্কার। মু'আজ (রা:) ইয়ামান যাচ্ছিলেন, তাঁকে উপদেশ দিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে মদীনা শহর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন । আল্লাহর পক্ষ থেকে গোপন ওহির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পেরেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে। হযরত মু'আজ (রা:) কে বিদায় করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-

"হে মু'আজ। সম্ভবত এ বছরটির পর তুমি আমার সাক্ষাত আর পাবে না, তুমি হয়ত আমার এ মসজিদে ও আমার কবরস্থানে যাতায়াত করবে।"

কথাটি শুনে হযরত মু'আজ (রা:) অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগলেন। (হাদীসটি মিশকাতের কিতাবুর রিকাক এ বর্ণিত রয়েছে)

কথা হলো, মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার দুনিয়ার জমিনে সর্বত্র হাযির নাযির থাকবেন, যদি তা-ই হতো, তবে তিনি হযরত

মু'আজ (রা:) এর মত বিশিষ্ট ও প্রিয় সাহাবীকে উক্ত কথাটি বলতেন না। ইতিহাস লেখকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পরবর্তীতে ইতিহাসে এমন কথা কোথাও উল্লেখ করেননি যে, মৃত্যুর পর আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে অথবা অন্য কোথাও কোনোদিন ইমামতি করেছেন।

৫.১৪. হযরত আয়েশা (রা:) এর প্রতি অপবাদ প্রসঙ্গে : মুনাফিকরা ষষ্ঠ হিজরী সনে হযরত আয়েশা (রা:)কে জঘন্য অপবাদ দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা (রা:) সম্বন্ধে হযরত আলী (রা:) ও আয়েশা (রা:) এর খাদীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। প্রায় একমাস পরে হযরত আয়েশার পবিত্রতা সম্পর্কে কুরআন মাজিদের আয়াত নাযিল হল। (দ্রষ্টব্য তাফসির সূরা নূর : ১১) আয়াত নাযিলের পূর্ব পর্যন্ড় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা:) এর সাথে পূর্বের মতো ভালবাসা মিশ্রিত আলাপ করতেন না। আয়াত নাযিলের পর যখন আয়েশা (রা:) এর মা তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দিলেন, তখন আয়েশা (রা:) বললেন- না, আমি সেই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব যিনি আমাকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযির নাযির হলে আয়াত নাযিলের পূর্বেই জানতে পারতেন যে, এটা মিথ্যা অপবাদ। আর হযরত আয়েশা (রা:) যে উঠের পিঠে হাওদার মধ্যে নেই এটাও তখনই বলে দিতেন।

৫.১৫. এখন সাহাবী হওয়া যাবে না কেন? যাঁরা ইহজীবনে স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঈমানের সাথে দেখেছেন এবং ঈমান নিয়ে মরতে পেরেছেন, তাঁরা সাহাবী। পরবর্তীকালে হাজার হাজার বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেও সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী বলে পরিগণিত হতে পারবে না। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহজীবনে থাকাকালের মত পরবর্তীতেও হাযির ও নাযির হতেন, তবে পরবতীতে কেউ সাহাবী হতে পারবে না বলে সিদ্ধান্ড় হত না।

৫.১৬. বিবেকের কাছে প্রশ্ন কর ন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাযির নাযির মেনে নিলে মক্কা শরীফ থেকে তাঁর মদীনা শরীফে হিজরত, খানায়ে কা'বা থেকে মসজিদে আকসায় ইসরা, সেখান থেকে সিদরাতুল মুনতাহায়, এভাবে বদর, তাবুক, হুনাইন, তায়িফ ইত্যাদি স্থানে তাঁর সফর, উপরন্তু হজ্জ ও উমরা করা, হুজরা মুবারক থেকে মসজিদে নববী, সেখান থেকে হুজরা মুবারকে আসা যাওয়া, মদীনা শরীফের এক গলি থেকে অন্য গলি পর্যন্ড়

যাতায়াত পুরোপুরি বাতিল প্রতিপন্ন হয়। কেননা, যখন তিনি সর্বত্র হাযির নাযির তখন মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করার অর্থ কি? তাঁকে হাযির নাযির মেনে নিলে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস, সেখান থেকে একের পর এক আসমানে একই রাতে স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় ভ্রমণের অর্থ কি? এই শিরকী আকীদার কারণে না তিনি মুহাযির হতে পারেন, না তিনি মি'রাজের অধিকারী হতে পারেন। (নাউযুবিল্লাহ) এই বদ আকীদার কারণে তাঁর যে সব ভ্রমণ, হিজরত, জিহাদ, মি'রাজ, হজ্জ, উমরা ইত্যাদি হয়েছিল সে সব অস্বীকার করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, তিনি যখন সর্বত্র হাযির নাযির তখন মক্কা থেকে হিজরত করার পরও মক্কায়ই থেকে যান। এরপর হিজরত কিভাবে হল?

হাযির নাযির-এ বিশ্বাসীদের নিকট আমরা জানতে চাই, তিনি কি দুনিয়ার জন্য হাযির নাযির না উর্ধ্ব জগতের জন্য হাযির নাযির? যদি উর্ধ্ব জগতের জন্যও হাযির নাযির হয়ে থাকেন তবে জিব্রাঈল (আ:) কুরআন নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসতেন না। কেননা কুরআন সংরক্ষণের স্থানে অর্থাৎ লাওহে মাহফুজে হাযির নাযির অবস্থায় সম্পূর্ণ কুরআন দেখে নিতেন। অথচ একবার কিছু দিনের জন্য কুরআন নাযিল বন্ধ হয়ে গেলে তিনি এমন অস্থির হয়ে পড়তেন যে, কোন কোন সময় মনে করতেন পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়বেন। হাযির নাযির হলে তো এমন অস্থির হতেন না। লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত কুরআন দেখে নিতেন এবং নাযিলের পূর্বেই বলে দিতে পারতেন।

বর্তমানে কিছু সংখ্যক বাতিলপন্থী বলে বেড়াচ্ছে যে- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযির নাযির। এমনকি তাদের কিতাবে লিখিত আছে- "প্রত্যেক মুমিনের ঘরে নূরনবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক মসজিদে তিনি সর্বদা হাযির নাযির থাকেন।" (হাকীকাতে দ্বীন, মাওঃ আব্দুল কুদ্দুস, ২য় খন্ড, তৃতীয় অধ্যায় পৃ. ৯, প্রকাশক রহমানিয়া দার ত্তাছানীফ, কাউখালী, বরিশাল, প্রকাশকাল ১৯৬৯ ইং) আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই একথা ভেবে যে, একজন সাধারণ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ একথা কিভাবে লিখলো। প্রত্যেক ঘরে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত থাকেন, তাঁর সামনে কেমন করে বিবির সাথে মেলামেশা করেন, পায়খানা প্রশ্রাব করেন? তাঁর সামনে কিভাবে আপনি বিছানায় শুয়ে থাকেন? এটা কি বেয়াদবি হয় না?

প্রত্যেক মসজিদে যদি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযের থাকেন, তবে কেমন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বাদ দিয়ে অন্যের ইমামতিতে আপনি নামাজ পড়েন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর থেকেও কি মসজিদের ইমাম সাহেব বেশি বুজুর্গ হয়ে গেল নাকি?

অনেক জায়গায় দেখা যায়, মিলাদ বা ওয়াজের মাহফিলে একটি খালি চেয়ার রেখে দেয়া হয়। ঐ চেয়ারে কেউ বসে না। তাদের ধারণা, নবীপাক সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিলে হাযির হয়ে ঐ চেয়ারে বসেছেন। ঐ খালি চেয়ারের পাশে চেয়ার পেতে বক্তা ওয়াজ করেন। এসব লোকদের বলি, আপনাদের কথামত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ঐ খালি চেয়ারে এসে বসেই থাকেন, তবে আপনি যে তাঁর পাশের চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে ওয়াজ করছেন- এতে কি কোনো বেয়াদবি হয় না? মূলত এসব ধ্যানধারণা বাতিল ও শরীয়ত বিরোধী।

৬. অলৌকিক কর্ম সম্পাদনের নিজস্ব ক্ষমতা নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছিল না বিষয়ক আকীদা

৬.১. আল্লাহর আবদ (দাস) ও রাসূল হিসাবে তাঁকে আল্লাহ মানবজাতিকে সর্তক করা ও সুসংবাদ প্রদান করার দায়িত্ব দান করেন। বিশ্ব জগতের পরিচালনা, কারো মঙ্গল-অমঙ্গল করার দায়িত্ব বা ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দেননি। তাঁকে আল্লাহ অনেক মুজিযা বা অলৌকিক নিদর্শন দান করেছেন। তাঁর দু'আয় আল্লাহ অগনিত অলৌকিক কর্ম সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু এ সকল আয়াত (অলৌকিক নিদর্শনসমূহ) বা মুজিযা সবই আল্লাহর ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় সংঘটিত হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, যখন মক্কার কাফিররা তাঁর কাছে বিভিন্ন অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চায়, তখন তিনি তাদেরকে বলেন: "আমি তো একজন মানুষ রাসূল মাত্র।" অর্থাৎ মুজিযা দেখানোর কোন নিজস্ব ক্ষমতা আমার নেই, আমি একজন মানুষ, যাকে আল্লাহ মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বানের দায়িত্ব দিয়েছেন।

৬.২. মুজিযা দেখানোর ক্ষমতা একান্ড়ই আল্লাহর। এব্যাপারে অন্য স্থানে আল্লাহ বলেছেন:

وَ اَقْسَمُوْا بِـاللهِ جَهْدَ اَيْمَـانِهِمْ لَئِنْ جَـآءَتْهُمْ اٰيَـةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ اِنَّمَـا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللهِ

তারা অত্যন্ড় দৃঢ়ভাবে শপথ করে বলে যে, যদি তাদেরকে অলৌকিক নিদর্শন দেখান হয় তাহলে তারা ঈমান গ্রহণ করবে। আপনি বলুন: অলৌকিক নিদর্শনাবলী তো একমাত্র আল্লাহরই কাছে।" (সূরা আনআম : ১০৯)

৬.৩. অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন:

وَ قَالُوْا لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللهِ ؕ وَ اِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

'এবং তারা বলে: তাঁর কাছে তার প্রভুর পক্ষ থেকে অলৌকিক নিদর্শনসমূহ প্রেরণ করা হোক। আপনি বলুন: অলৌকিক নিদর্শনাবলী তো একমাত্র আল্লাহরই কাছে এবং আমি তো শুধুমাত্র একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।" (সূরা আনকাবুত: ৫০)

৭. আসমান জমিনের ভাণ্ডারসমূহের চাবি প্রসঙ্গে আকীদা

৭.১. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সারা বিশ্বের নবী ও শেষ নবী করে সৃষ্টি করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ওহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর পথে বড়ই বিপদগ্রস্ড় হতে হয়েছিল। ৭০ জন বিশিষ্ট সাহাবীকে শহীদ হতে হয়েছিল। এ সময় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাগণের মুখ দিয়ে বেড়িয়ে পড়েছিল: مَتٰى نَصْرُ اللهِ "আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?" এ ধরনের চরম হয়রানির মধ্য দিয়েও অগ্রসর হতে হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং সাহাবীগণকে। খোদার দ্বীন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, এ দায়িত্বপালনে শেষ পর্যন্ড় কতটুকু কামিয়াবি হবে, মুসলমানদের মনে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন। আল্লাহতা'য়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওহীর মাধমে ভবিষ্যত কামিয়াবির সুসংবাদ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ পর্যায়ে এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর হাতে জমিনের চাবি দেয়া হয়েছে। তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন, তাঁর জামানার পরেও মুসলমানরা ধীরে ধীরে কামিয়াবির পথে অগ্রসর হতে থাকবে। বহু দেশ মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিকারে আসবে। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোদায়ী পথে কামিয়াব হবেন। দ্বীন প্রচারে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে। ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রচারিত আল্লাহর দ্বীন সফলতা অর্জন করেছে। স্বপ্ন বিশারদ ইমামদের মতে, স্বপ্নে হাতে চাবি আসতে দেখার অর্থ হল, মহৎ উদ্দেশ্যের সফলতা। এ অর্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই সফলকাম হয়েছেন। কিন্তু এক দল লোক এ স্বপ্নকে পুঁজি করে তাদের ভ্রান্ড় ধারণা, আকীদা ও বিশ্বাসের প্রচার প্রচারণায় এমন অহেতুক মন্ড়ব্য করে থাকে, যাতে তারা বুঝাতে চায় আল্লাহর কোনো কাজ নেই। বরং সৃষ্টিজগতের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণভার তিনি নবী ও ওলীগণের হাতে তুলে দিয়ে নিজে অবসর গ্রহণ করেছেন! (নাউযুবিল্লাহ) এ ধরণের ভ্রান্ড় প্রচার-প্রচারণা কুরআন মাজিদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণায় মাকড়সার জালের ন্যায় বিলুপ্ত হতে বাধ্য।

৭.২. আল্লাহ বলেন:

وَ اِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ز وَ مَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ

সৃষ্টি জগতে যত বস্তুই বিদ্যমান রয়েছে, তার প্রত্যেকটির মূল ভাণ্ডার কেন্দ্রসমূহ আমার হাতে নিয়ন্ত্রিত। আমি এক নির্দিষ্ট পরমাণেই তা নাযিল করে থাকি। (সূরা আল- হিজর : ২১)

৭.৩. বর্তমান ও অতীতকে সামনে রেখে চিন্ড়াভাবনা করে দেখতে গেলে সম্পূর্ণ সত্য বুঝে নিতে কারো পক্ষেই অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। আজ থেকে ত্রিশ

বছর পূর্বে যত মানুষের বসবাস ছিল তারা তাদের পরিমাণ মতই রিজিক পেয়েছে। বর্তমান বিশ্বে ত্রিশ বছর পূর্বেকার তুলনায় জনসংখ্যা কয়েক গুণ বেড়েছে; কিন্তু দেখা যায়, সংখ্যা অনুপাতে রিজিকও বেড়েছে। এ সুকৌশল নিয়ন্ত্রণ যে একমাত্র আল্লাহর হাতে, এতে সন্দেহ পোষন করতে পারে কেবল নির্বোধ লোকরাই।

৭.৪. সৃষ্টিজগতের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ অন্য কারো হাতে নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে দিলেন–

قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللهِ وَ لَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ

হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আপনি বলুন, আমি তোমাদের বলছি না যে, আল্লাহর নিয়ামতের ভান্ডারসমূহের মালিকানা আমার হাতে রয়েছে। (তোমরা জেনে রাখবে) আমি গায়েব জানিনা। (সূরা আল আন'আম : ৫০)

৭.৫. এখানে আল্লাহর ভান্ডারগুলো বলতে কি বুঝানো হয়েছে, প্রথমে সেটাই বুঝতে হবে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আসমান- জমীন, আলো-বাতাস, আগুন পানি, সুখ-শান্তি, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য, মান-সম্মান, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি, এক কথায় মানুষের বেঁচে থাকতে ও জীবিকা নির্বাহের জন্য যা কিছু প্রয়োজন এর সবকিছুই সৃষ্টি করেন একমাত্র আল্লাহ। কোনটি কখন সৃষ্টি করবেন, কি পরিমাণ করবেন, এর সবকিছুই আল্লাহর ফয়সালা দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এভাবে প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি ও পরিমাণ নির্ধারণ আল্লাহর ইচ্ছারই অধীন। তাই আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় এর সবকিছু অস্তিত্ব লাভ করে বলেই এ সব কিছুকে আল্লাহর ভান্ডার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মৌলিকত্ব ও উৎসমূলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো হস্তক্ষেপ অসম্ভব। এখানে কারো অংশীদারিত্বের প্রশ্নই আসতে পারে না। এ ক্ষমতা হলো আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা। আল্লাহর এই ক্ষমতায় অন্য কারো হাত নেই। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরও ছিল না।

৮. আল্লাহপাক দাতা, নবীপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বণ্টনকারী প্রসঙ্গে আকীদা

৮.১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَ اللهُ يُعْطِىْ

"আমি একজন বন্টনকারী আর দান করেন আল্লাহ।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বন্টনকারী, এতে কি বুঝানো হয়েছে, তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হলে অপর একটি হাদীসের উল্লেখ এখানে প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: শরীয়তের

আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ মানুষকে স্বর্ণ-রৌপ্যের তথা বৈষয়িক সম্পদের উত্তরাধিকারী করেন না। তাঁরা মানুষকে উত্তরাধিকারী করেন ইলমের। অতএব, যে ইলম গ্রহণ করল, সে সম্পূর্ণ অংশই গ্রহণ করল।

৮.২. দু'টি হাদীস মিলিয়ে দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, নবীগণ কোন বস্তুর বন্টনকারী। নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহির সূত্রে যে ইলম লাভ করেন, তারা তাই মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। নবীগণ মানুষকে আল্লাহর ইবাদাতের ইলম বন্টন করেছেন। এছাড়া قَسْمٌ কছম অর্থ : দান, আর قَاسِمٌ অর্থ দাতা অর্থাৎ কাছেম শব্দটি দাতার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বন্টনকারী' অর্থ হবে তিনি মানুষকে নবুওতের ইলম, শরীয়তের ইলম দান করেছেন। উপরে উল্লেখিত কুরআন মাজিদের একটি আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রিজিকের ভাণ্ডারের মালিক নন, এ কথা বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানেন না।

৮.৩. এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তাফসীরে রূহুল মা'য়ানীর ৪র্থ খন্ড ১৫৫ পৃষ্ঠায়-

هُمَا مِنْ خَوَاصِّ الْاَهْلِيَّةُ

রিজিকের মূল ভান্ডারের মালিক হওয়া ও গায়েব জানা, এ দুটি গুণ হলো আল্লাহর সত্ত্বাগত বিশেষ গুণাবলীর অন্তর্গত। আল্লাহতা'য়ালার মা'বুদ হওয়ার বিশেষ গুণাবলীর মধ্যে এ দুটি গুণও অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে এ দুটি গুণ অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা শিরক।

৮.৪. অতএব আল্লাহতা'য়ালার এ দুটি বিশেষ গুণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে রয়েছে বলে বিশ্বাস করা শিরক। কারণ, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মা'বুদ হওয়া সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এ ধরনের আকীদা পোষণকারী মুশরিক। আর এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গায়েবী প্রার্থনার প্রশ্নই ওঠে না।

৯. নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দু'আ, প্রার্থনা, শাফা'আত কবুল করা আল্লাহপাকের ইচ্ছাধীন বিষয়ক আকীদা

৯.১. তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন, আর দু'আ কবুল করা বা না করা পুরোপুরিই আল্লাহর এখতিয়ার। তিনি আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা। তাঁর অনেক দু'আ আল্লাহ কবুল করেছেন। আবার কখনো কখনো কবুল করেননি। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা:) বলেছেন: রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাজের শেষ রাকাতের রুকু থেকে ওঠার পরে কোন কোন কাফিরদের জন্য বদদোয়া করে বলতেন: হে আল্লাহ, আপনি অমুক অমুককে লানত করুন।

তখন আল্লাহ তাঁকে নিষেধ করেন এবং বলেন:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ

"এই বিষয়ে আপনার কোন অধিকার নেই। আল্লাহ চাইলে তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন, কারণ তারা জালিম।" (সূরা আলে ইমরান: ১২৮) [তাফসীরে তাবারী ৪র্থ খন্ড ৮৬-৮৯, সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৩৬৫ হাদীস নং ৪০৬৯, ৪০৭০, ১১ শ খণ্ড, ১৯৩ প, ১৩ম খন্ড, ৩১২ পৃ. হাদীস নং ৭৩৪৬। সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড, ৪৪৬-৪৪৭ হাদীস নং ২৯৪ (৬৭৫) ও ৩য় খণ্ড, ১৪১৭ হাদীস নং ১০৪ (১৭৯১)]

৯.২. তাঁর দু'আয় আল্লাহ অসংখ্য মানুষের গোনাহ মাফ করেছেন। তাঁর শাফায়াতে অসংখ্য পাপী মুসলিমকে আল্লাহ দোযখ থেকে মুক্তি দেবেন। তবে তাঁর দু'আ ও শাফাআত কবুল করা আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহর রহমত ও তাঁর রাসূলের দু'আর কল্যাণ পাওয়ার যোগ্য কে তা আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ বলেন:

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ

"আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা ক্ষমা প্রার্থনা না করুন একই কথা। আপনি সত্তর বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।" (সূর তাওবা: ৮০)

৯.৩. ইমাম বুখারীর সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত এক হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকটতম আত্মীয় স্বজনদেরকে ডেকে বলেন: "হে কুরাইশ বংশের লোকেরা, তোমরা নিজেদেরকে মুক্ত কর, (ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে নিজেদেরকে) খরিদ কর, আমি আল্লাহর পরিবর্তে তোমাদের কোনই উপকারে আসব না। হে আবদ মানাফ গোত্রের মানুষেরা, আমি আল্লাহর পরিবর্তে তোমাদের কোনই উপকারে আসব না। হে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, আমি আল্লাহর পরিবর্তে আপনার কোনই উপকারে আসব না। হে রাসূলুল্লাহর ফুফু সাফিয়া, আমি আল্লাহর পরিবর্তে আপনার কোনই উপকারে আসব না। হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা, আমার সম্পদ থেকে তুমি চেয়ে নাও, তবে আমি আল্লাহর পরিবর্তে তোমার কোনই উপকারে আসবো না।" (সহীহ বুখারী ও ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড ৩৮৫ পৃ. নং ২৭৫৩, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৫১, প, নং ৩৫২৭, ৮ম খন্ড ৫০১ পৃ, নং ৪৭৭১)

১০. কাউকে হেদায়েত করার ক্ষমতা নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছিল না বিষয়ক আকীদা

তাঁকে আল্লাহ মানবজাতির হেদায়েত বা পথ দেখানোর জন্য মনোনীত করেছেন। তবে তাঁর দায়িত্ব মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া। কাউকে সঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব বা ক্ষমতা তাকে আল্লাহ দেননি। তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় চাচা

আবু তালিবকে অনেক চেষ্টা করেও সত্যের পথে আনতে পারেননি। আল্লাহ বলেছেন:

اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

"আপনি যাকে ভালবাসেন তাকে আপনি হেদায়েত করতে (সুপথে আনতে) পারেন না, কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সৎপথে আনয়ন করেন এবং সৎপথ অনুসরণকারীদেরকে তিনি উত্তমরূপে অবগত আছেন।" (সূরা কাসাস : ৫৬)

১১. কারো কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না বিষয়ক আকীদা

১১.১. কারো কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতা তাঁর নেই বলে আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআনে আয়াতের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন :

قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا رَشَدًا ﴿۲۱﴾ قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّ لَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا

"আপনি বলুন: আমি তোমাদের ইষ্ট অনিষ্টের মালিক নই। বলুন: আল্লাহ থেকে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়ও পাব না।" (সূরা জিন: ২১-২২)

১১.২. নিজের কোন মঙ্গল-অমঙ্গল করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না : এমনি আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তাঁর নিজের কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। সকল ক্ষমতা ও শক্তি একমাত্র আল্লাহর। এ ব্যাপারে কুরআন করীমে আল্লাহ বলেছেন:

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ

"আপনি বলুন: আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতাও আমার নেই। (সূরা আরাফ: ১৮৮)

১২. নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্বাভাবিক মৃত্যু বিষয়ে আকীদা

১২.১. তিনি অন্যান্য সকল মানুষের মত মরণশীল। একথা পূর্বের আলোচনাতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমরা দেখেছি যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বারবার শেখানো হয়েছে যে, তিনি অন্য সবার মতই একজন মানুষ। এ থেকে স্বভাবতই জানা যায় যে, অন্যান্য মানুষের মত তিনি মরণশীল। তদুপরি কুরআন করীমে বিষয়টি বিশেষভাবে জানান হয়েছে। তিনি অন্যান্য সবার মতই মৃত্যুবরণ করবেন তা জানিয়ে আল্লাহ পাক বলেছেন:

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ

"আপনি মৃত্যু বরণ করবেন এবং এরা সবাই মৃত্যু করণ করবে।"

(সূরা যুমার : ৩০)

১২.২. অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَا۟ئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤی اَعْقَابِكُمْ ؕ وَ مَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰی عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ؕ وَ سَيَجْزِی اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ

"এবং মুহাম্মদ তো একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর আগে অনেক রাসূল গত হয়েছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন তাহলে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? (ইসলাম ত্যাগ করবে?) যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এবং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।" (সূরা আলে ইমরান: ১৪৪)

১২.৩. অন্যত্র তিনি বলেছেন:

وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ اَفَا۟ئِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ

"আপনার পূর্বে কোন মানুষকে আমি অনন্ড়জীবন দান করিনি। আপনি মৃত্যু বরণ করলে কি তারা দুনিয়াতে অনন্ড়কাল থাকবে?" (সূরা আম্বিয়া: ৩৪)

তবে মৃত্যুর পরেও আল্লাহ তাঁকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। বিভিন্ন হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম নবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত্যুর পরে এক বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যময় পারলৌকিক জীবন দান করেছেন, যার ফলে রওজা শরীফে তাঁর দেহ অপরিবর্তিত থাকবে। উম্মতের যে কোন ব্যক্তি দরূদ ও সালাম পাঠ করলে আল্লাহর ফেরেশতারা তা বহন করে তাঁর রাওজায় পৌঁছিয়ে দেবেন। তিনি বলেছেন : "তোমরা আমার কবরকে ঈদগাহ (আনন্দ, নিয়মিত সমাবেশের বা ইবাদতের স্থান) বানিয়ে নিও না, আর তোমাদের আবাসস্থলকে কবর বানিয়ে নিও না। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আমার উপর দরূদ পাঠ করো, কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যাবে।" (মুসনাদে আহমাদ : ২য় খন্ড ৩৭৬ পৃ, সুনানে আবি দাউদ ২য় খন্ড ২২৫ পৃ, নং ২০৪২, জামিউল উসূল ৪র্থ খন্ড ৪০৬-৪০৭ পৃ, নং ২৪৭৮)

১২.৪. একজন সাহাবী প্রশ্ন করেন : "আপনিতো কবরের মাটিতে মিশে যাবেন, আমাদের দরূদ কিভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে?" উত্তরে তিনি বলেন : "আল্লাহ মাটির জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন যে তা নবীদের দেহ ভক্ষণ করবেনা (অর্থাৎ নবীদের দেহ মাটিতে নষ্ট হয় না)। (সুনানে নাসাঈ ৩য় খ- ১০১-১০২ পৃঃ, নং ১৩৭৩, সুনানে আবি দাউদ ১ম খ- ২৭৪ পৃঃ, নং ১০৪৭ সহীহুল জামিয়িস সাগীর ১ম খ- ৪৪০ পৃঃ, নং ২২১২, জামিয়িল উসূল ৯ম খ- ২৬৫ পৃঃ, নং ৬৮৬৯)

১২.৫. এখানে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীদের বিশ্বাস ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ মাটিতে পঁচে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে জানালেন যে তাঁর দেহ নষ্ট হবে না এবং উম্মতের দরূদ সালাম তাঁর কাছে পৌঁছানো হবে।

১৩. তাঁর পরে নবী আসতে পারে বলে বিশ্বাস করা সম্পর্কে আকীদা

১৩.১. হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তাঁর পরে আর কোন ওহী নাজিল হবে না, কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। আল্লাহ বলেছেন:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর মনোনীত রাসূল ও সর্বশেষ নবী।" (সূরা আহযাব : ৪০)

১৩.২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বারবার তাঁর উম্মতকে জানিয়েছেন যে তিনিই সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। তিনি বলেছেন, "নবীগণের আগমন আমার দ্বারা শেষ হয়েছে।" (সহীহ মুসলিম, ১ম খ-, ৩৭১ পৃঃ, নং ৫(৫২৩)

১৩.৩. তিনি আরো বলেছেন : "আমার পরে আর কোন নবী নেই।" (সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী ৬ ষ্ঠ খন্ড ৪৯৫ পৃ, নং ৩৪৫৫, ৮ম খ- ১১০ পৃ, নং ৪৪১৫, ১০ম খ- ৫৭৭ পৃ নং ৬১৯৪, সহীহ মুসলিম ৩য় খ- ১৪৭১ পৃ, নং ৪৪(১৮৪২) ৪র্থ খ- ১৮৭০-১৮৭১ পৃ নং ৩০ (২৪০৪)-৩২)

১৩.৪. অন্য হাদীসে তিনি তাঁর মাধ্যমে নবুয়তের সমাপ্তি একটি সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তিন বলেছেন : "আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ এক ব্যক্তির মত যে একটি খুবই সুন্দর ও মনোরম ইমারত তৈরি করেছে, কিন্তু তার এক পার্শ্বে একটি ইটের জায়গা খালি রেখেছে। মানুষেরা আশ্চর্য হয়ে এই মনোরম ইমারতটির চারিদিকে ঘুরতে থাকে এবং বলতে থাকে: এই ইটটি যদি স্থাপন করা হতো! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। আমিই এই সর্বশেষ ইট, আমিই সর্বশেষ নবী।" (সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী: ৬ষ্ঠ খন্ড ৫৫৮ পৃ নং ৩৫৩৪, সহীহ মুসলিম ৪থ খ- ১৭৯০ পৃ, নং ২০/২২৮৬-২২)

১৩.৫. এভাবে বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ড় পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তাঁর আগমনের সাথে সাথে নবুয়ত ও রিসালাতের সমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। তিনি একথাও স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, তাঁর পরে যদি কেউ নবুয়তের দাবী করে তাহলে সে অবশ্যই একজন ঘোর মিথ্যাবাদী ভ-। তিনি তাঁর উম্মতকে ভ- নবীদের আবির্ভাবের সংবাদ দান করে তাদের থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন : "নিশ্চয় কিয়ামতের পূর্বেই অনেক ঘোর

মিথ্যাবাদী (ভণ্ড নবীর) আবির্ভাব ঘটবে। তোমরা তাদের থেকে সাবধানে থাকবে।" (সহীহ মুসলিম ৩য় খণ্ড ১৪৫৪ পৃ, নং ১০/১৮২২, ৪র্থ খণ্ড ২২৩৯, নং ৮৩/২৯৩৩, ৮৪/১৫৭)

১৩.৬. তাই যদি কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে নিজেকে নবী বলে দাবী করে, তাহলে সে ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল এবং যদি কেউ বিশ্বাস করে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে কোন নবী বা রাসূল এসেছেন, তাহলে সে একজন অমুসলিম কাফির বলে গণ্য হবে, যদিও সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একজন নবী ও রাসূল বলে মানে বা তাঁকে শ্রেষ্ঠ নবী বলে মানে বা তাঁর শরীয়তের বিধান মেনে চলে। এই ব্যক্তি মূলত: 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কলেমার এ দ্বিতীয় অংশটুকু মানেনি, কারণ তিনি বিশেষভাবে যা শিখিয়েছেন, যা বিশ্বাস করতে বলেছেন তা সে বিশ্বাস করছে না।

১৪. বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সার্বজনীনতাকে অস্বীকার করা সম্পর্কে আকীদা

১৪.১. একজন মুসলিমকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির সব মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত রাসূল। তাঁর আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়ে গিয়েছে। তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস করা ছাড়া কোন মানুষই মুক্তির দিশা পাবেনা।

১৪.২. আল্লাহ বলেছেন:

وَ مَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا

"আমি অবশ্যই আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয়প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি।" (সূরা সাবা : ২৮)

১৪.৩. আল্লাহ আরো বলেছেন:

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

"আপনি বলুন: হে মানবজাতি, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল।" (সূরা আ'রাফ : ১৫৮)

১৪.৪. অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

'তিনিই মহিমাময় তিনি তাঁর বান্দার উপরে ফুরকান নাযিল করেছেন, যেন তিনি সমস্ড় সৃষ্টি জগতের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হন।" (সূরা ফুরকান : ১)

১৪.৫. অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"নিশ্চয় আমি আপনাকে সমস্ড় সৃষ্টি জগতের জন্য করুণা বা রহমতস্বরূপ

প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

১৪.৬. কাজেই যদি কেউ বিশ্বাস করে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন নির্দিষ্ট যুগের বা বিশেষ জাতির জন্য প্রেরিত নবী, তাহলে তিনি ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে পারবেন না, যদিও তিনি তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলে বিশ্বাস করেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল বলে বিশ্বাস করার অর্থ তাঁর সকল কথা ও শিক্ষাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। তাঁর কিছু কথাকে অবিশ্বাস করার অর্থ তাঁকে অবিশ্বাস করা।

১৫. মিলাদুন্নবী ও সিরাতুন্নবী সম্পর্কে আকীদা

১৫.১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ আমাদের সমাজে প্রচলিত নিয়মে মিলাদুন্নবী বা ঈদে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। তথাপি তাঁরা পবিত্র কুরআন মাজিদ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস দ্বারা স্বীকৃত মহা মর্যাদার অধিকারী মুসলমান। আর তা এজন্য যে, তারা তাওহীদ ও রিসালাতসহ পূর্ণ সিরাতুন্নবী গ্রহণ করেছেন। বিশ্ব মানবতার শিক্ষণীয় সবকিছুই সিরাতুন্নবীর ভিতর নিহিত। তাই সঠিক ঈমানি ও ইসলামি জিন্দেগির পক্ষে সিরাতুন্নবী চর্চা এক অপরিসীম গুরুত্বের অধিকারী বিষয়।

১৫.২. মিলাদুন্নবী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতামাতার ঔরসে জন্মপ্রাপ্তির স্থান কাল পাত্রের বিষয়টি অত্যন্ড় সংক্ষিপ্ত বিষয়। আর সিরাতুন্নবী হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোটা জীবন প্রবাহের মহা সমুদ্র। যারা সিরাতুন্নবী লিখেছেন তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম প্রাপ্তির অর্থাৎ মিলাদুন্নবীর আলোচনাকে সিরাতুন্নবীর সাথে সংযুক্ত করেছেন। এ কথা সকলেরই জানা থাকতে হবে এবং মেনে নিতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তেইশ বছরের নবুওতী জিন্দেগীর সিরাত গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যানের সাথেই মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য অথবা ব্যর্থতার সম্পর্ক জড়িত।

১৫.৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান রেখে তাঁর সিরাতের স্বীকৃতি ও আনুগত্যের সাথে যদি তাঁর জন্ম বৃত্তান্ড় নিয়ে বিদ'আত মুক্ত পরিবেশে সঠিক পন্থায় আলোচনা করা হয় এবং তা বিশুদ্ধ হাদীস ও সঠিক ইতিহাস ভিত্তিক হয় তা অবশ্যই বরকতময় নেক কাজের শামিল। অবশ্য এর সাথে নেক কাজের আদেশ ও গুণাহের কাজে বাধার সম্পর্কীয় আলোচনা এবং সালাম ও দরুদ শরীফ যোগ করা বাঞ্চনীয়। এ ধরনের

মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে কারো অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। মিলাদুন্নবী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে প্রামান্য আলোচনায় অতি সহজেই একটি শিরকি আকীদা খন্ডন হয়ে যায়। মিলাদুন্নবী প্রমান করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর জাত বা সেফাতি নূরের অংশ নন। আর এটা এভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি আদম (আ:) এর বংশে আপন পিতামাতার ঔরষে জন্মপ্রাপ্ত সন্তান বলেই তাঁর নামে মিলাদ অনুষ্ঠান হয়। আর আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয়ের ক্ষেত্রে মিলাদে এলাহি হল- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ তিনি কোন সন্তান জন্ম দেন নাই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্ট বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তা'য়ালার সত্ত্বায় কিংবা বিশেষ কোন গুণে কারো কোন প্রকার অংশীদারিত্বের আকীদা বিশ্বাস অবশ্যই শিরক।

১৫.৪ মন্দ উপসর্গ মিশ্রিত মিলাদ : যে সব মিলাদ মাহফিলে নারী-পুরুষ বেপর্দা অবস্থায় যোগদান করে, লাইটিং, আগরবাতি-মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে মিলাদের মজলিসকে সাজিয়ে অপচয় করা হয়, মিথ্যা ঘটনা, মিথ্যা কিচ্ছা বর্ণনা করা হয়, গানের সুরে গজল ও কাসিদা পড়া হয়, ফাসেক ব্যক্তির দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাযির নাযির জেনে মিলাদ পড়ানো হয় সেসব মিলাদ হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রুহু মোবারক প্রত্যেক মিলাদের মজলিসে হাজির হয় বলে ধারণা করা হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনই পয়দা হচ্ছেন। এরূপ ধারণা করে মিলাদ পড়ানো জায়েজ নয়।

মিলাদ মাহফিলের প্রচলিত কিয়াম হাদীস সমর্থিত নয়। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, চার মাজহাবের ইমাম, প্রসিদ্ধ চার তরীকার ইমামদের থেকে কিয়ামের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১৫.৫. মিলাদ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা নাজায়েজ : মিলাদ ইসলামের কোন রোকন বা স্তম্ভ নয়। মিলাদ দিয়ে কারো মুসলমানিত্ব যাচাই করা যায় না। হাজার বছর ধরেও যদি মিলাদ পড়ানো হয়, তবুও তা একটি সুন্নাতের সমকক্ষ হবে না। কেমন সুন্নাত? দুপুরে খানা খেয়ে একটু বিশ্রাম করা সুন্নাত, একে 'কায়লুলা' বলে এই সুন্নাতটিরও সমকক্ষ হবে না।

মিলাদ নিয়ে ঝগড়া ফ্যাসাদ, বাহাস-মুনাজারা করে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি ও বিভেদ সৃষ্টি করা জায়েজ নয়। ফুরফুরার বড় হুজুর হযরত মাওলানা আব্দুল হাই সিদ্দিকী (রহ:) বলতেন, "যারা মিলাদ পড়বে তারাও জাহান্নামে যাবে না, আবার যারা মিলাদ পড়বে না তারাও জাহান্নামে যাবে না। বরং যারা এ বিষয়কে কেন্দ্র করে ঝগড়া ফ্যাসাদ বাড়াবাড়ি করবে তারাই জাহান্নামে যাবে।"

১৫.৬. মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপলক্ষে মিছিল জসনে জুলুস : আল্লাহতা'য়ালার ইবাদত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যের নামই ইসলাম। কিছু সংখ্যক লোককে দেখা যায় তারা নামাজ, রোযা বা সুন্নাতের তাবেদারির ধার ধারে না। কিন্তু রবিউল আওয়াল মাস এলেই 'জসনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম দিয়ে যে বিরাট মিছিল বের হয় তাতে যোগদান করে, রাস্তায় রাস্তায় 'ঈদ মোবারক' খচিত ব্যানার লাগায়। এরা নিজেদেরকে আশেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে দাবি করে এবং এই মিছিল করাকে এশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বহি:প্রকাশ বলে মনে করে। বস্তুত এসব কাজ বিদআত এবং যারা এগুলো করে তারা বিদআতী।

১৬. আযানের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন

আযানের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম শুনে শাহাদাত আঙ্গুলি বা বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করে চোখে লাগানো সংক্রান্ত হাদীসগুলো হাদীস বিশারদ মোহাদ্দেসগণ ভিত্তিহীন বলেছেন।

১৭. নবী পীরওলীর নামে গাড়ি, বাড়ি, দোকানের নাম রাখা প্রসঙ্গে আকীদা

দুর্ঘটনা হতে রক্ষা ও রিযিকে বরকতের জন্য অনেকে নবী পীরওলীর নামে ঘরবাড়ি, বাসট্রাক, দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করে থাকে। যেমন: মোহাম্মদী ড্রাই ক্লিনার্স, মোহাম্মদী হাউজিং, শাহ আমানত ফেরী, ভান্ডারী ট্রেডার্স, বোগদাদী পরিবহন, ফুরফুরা পরিবহন, খাজা মার্কেট ইত্যাদি। এসব নামকরণ করার সময় যদি নবী, পীর ওলীদের পক্ষ থেকে অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে গায়েবী সাহায্য প্রাপ্তির নিয়ত থাকে তবে নাজায়েজ হবে।

কোন কোন পরিবহনে এরূপ অনেক লেখা যায় যেগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন: কোন কোন বাসে লেখা থাকে– 'খাজা বাবার নামে চলিলাম', 'বিসমিল্লাহ বড় পীরের দু'আ', 'বাবার দয়া,' 'খাজা ঝুলি ভর দে' (অর্থ হে খাজা বাবা, আমার ধন দৌলতের ঝুলি ভরে দিন) ইত্যাদি।

১৮. সন্তানের নামকরণে নবী-পীর-ওলীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে আকীদা

নবী ও ওলীদের নামে সন্ড়ানের নাম রাখা উত্তম। কিন্তু নাম রাখতে গিয়ে যদি এমনভাবে নাম রাখা হয় যার অর্থ শরীয়তসম্মত নয় তবে তা নাজায়েজ হবে। যেমনঃ আব্দুন্নবী (নবীর দাস), আলী বখস (হযরত আলীর দান), হোসেন বখস (হোসাইন (রা:) এর দান), পীর বখস (পীরের দান) মাদার বখস (মাদারের দান), গোলাম মহিউদ্দীন (পীর মহিউদ্দীনের গোলাম) ইত্যাদি নাম রাখা উচিত নয়। ঐসব ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে বিপদ-আপদ, বালা মুসিবত হতে বাঁচার জন্য নিজের সন্ড়ানের এরূপ নামকরন করা শিরকের পর্যায়ভুক্ত।

১৯. আব্দুন নবী, আব্দুর রাসূল নাম রাখা সম্পর্কে আকীদা

আব্দুন নবী, আব্দুর রাসূল, আব্দুল হুসেন, আব্দুল হাসান, হাসান বখশ, হুসাইন বখ্‌শ, নবী বখ্‌শ, খোদা বখ্‌শ, আব্দুল মন্নাফ, আব্দুল মোত্তালিব, আব্দুল হাশেম নাম রাখা নাজায়েজ ও কঠিন গুনাহ। আব্দুন নবী, আব্দুল রাসূল নাম নবী ও রাসূলের বান্দা ধারনা করে রাখলে কাফের হবে। আর আবদ অর্থ খাদেম, তাবেদার, এ অর্থেও এই নাম রাখা ভাল নয়। 'গোলাম রাসূল' নাম রাখা যেতে পারে তবে না রাখাই ভাল। মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন তার 'জা'য়াল হক' কিতাবে লিখেছেন- 'নিজেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বান্দা বলাও জায়েজ'। (জায়াল হক, ২য় খন্ড, ২১৯ পৃঃ বাংলা অনুবাদ প্রকাশক মুহাম্মাদী কুতুবখানা, আন্দার কিল্লা, চট্টগ্রাম) এরূপ আকিদা বাতিল ও শিরক।

২০. বিদ'আত (দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন)

২০.১. ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তিকালের পূর্বেই একে পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।' অতএব কেউ এতে নতুন কিছু সংযোজন করবে এটা ধারণাতীত ব্যাপার। কেননা নতুন সংযোজন আল্লাহ তা'য়ালার মধ্যে দুর্বলতার প্রমাণ বহন করে যা সংযোজনকারী পূরণ করেছে। উপরন্তু তা দ্বারা বুঝা যায়, শরিয়ত অপূর্ণ রয়ে গেছে। যা আয়াতের মর্মের পরিপন্থী।

২০.২. ইমাম মালিক (রহ) বলেন:

مَنِ ابْتَدَعَ فِى الْاِسْلَامِ بِدْعَةً يَّرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَانَ الرِّسٰلَةِ

"যে লোক ইসলামে কোন বিদ'আত উদ্ভাবন করবে এবং তাকে ভাল ও উত্তম মনে করবে, সে যেন ধারণা করে নিয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালাত ও নবুওতের দায়িত্ব পালন করেননি, খেয়ানত করেছেন। কেননা তিনি যদি তা করেই থাকেন, তাহলে ইসলাম ও সুন্নত ছাড়া আর তো কিছুর প্রয়োজন হয় না। সব ভালই তো তাতে রয়েছে"। (আল ই'তেসাম : ৭/২৭)

২০.৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَا تَّبِعُوْهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ

'নিঃসন্দেহে এটি আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।' এ আয়াতে সামগ্রিকভাবে সকল বিদ'আতীর নিন্দা করা হয়েছে। কুরআনে এ ধরনের আরো আয়াত রয়েছে।

২০.৪. হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামগ্রিকভাবে বিদ'আতের নিন্দায় অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ইরবাদ ইবনু সারিয়া (রা:) বর্ণিত হাদীসটি অন্যতম। তিনি বলেন : 'একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ভাবগর্ভ উপদেশ দিলেন। এতে আমাদের চোখ অশ্রু সজল ও অন্ড়করণ ভীত সন্ত্রস্ড় হয়ে পড়ল। তখন এক ব্যক্তি বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! এ যেন বিদায়কালীন উপদেশ! আপনি আমাদের কি নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমাদের প্রতি আমার অসিয়ত হলো: তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে এবং শাসকদের কথা শুনবে ও মেনে চলবে যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অচিরেই অসংখ্য মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের কর্তব্য হবে আমার সুন্নত ও সঠিক পথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অনুসরণ করা এবং তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। আর তোমরা নতুন উদ্ভাবিত বিষয়াবলী থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা নতুন উদ্ভাবিত প্রতিটি বিষয়ই বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আতই গুমরাহি।"

২০.৫. বিদ'আতের ভয়াবহতা

(১) মহান আল্লাহতা'য়ালা বলেন,

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَ الرَّسُوْلِ .

যদি তোমরা কোন ব্যাপারে পরস্পর মতবিরোধ কর তবে সে ব্যাপারটা আল্লাহ

ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। (সূরা নিসা : ৫৯)

হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এমন কোন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। (বুখারী ও মুসলিম)

(২) যারা নিজেকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করতে পারেনি। যারা নিজেদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত করতে পারেনি তারাই বিদ'আত করে থাকে। বস্তুত বিদ'আতের উৎস হচ্ছে নফসের খায়েশ, স্বেচ্ছাচারিতা, লালসা ও অবাধ্যতা। যারা আল্লাহর ফায়সালা ও রাসূলের পথ প্রদর্শনকে নফসের খায়েশ পূরনের পথে বাধা স্বরূপ মনে করে, তারাই দ্বীনের মধ্যে নিজেদের ইচ্ছামত হ্রাস-বৃদ্ধি করে। এই হ্রাস বৃদ্ধির পর যা হয় তাকেই তারা দ্বীনের মর্যাদা দিয়ে বসে। আর যেহেতু এ কাজকেও দ্বীনি কাজই মনে করা হয়, সে জন্য এ কাজ যে ভুল ও মারাত্মক তা তাদের চোখে ধরা পড়ে না। এ কারণেই বিদ'আতিরা কখনও বিদ'আত থেকে তওবা করার সুযোগ পায় না। এ বিদ'আত এমনই এক মারাত্মক জিনিস, যা শরীয়াতের ফরজ ওয়াজিবকে পর্যন্ড় বিকৃত করে দেয়। শরীয়াতের ফরজ ওয়াজিবের প্রতি অন্ড়রে থাকে না কোন মান্যতা গণ্যতার ভাবধারা। শরীয়তের সীমালঙ্ঘন করার অভ্যাস হতে হতে লোকদের স্বাভাবিক প্রকৃতিই বিগড়ে যায় আর মন মগজ এতোই বাঁকা হয়ে যায় যে, অত:পর শরীয়তের সমস্ড় সীমা সহৃদয় চূর্ণ করে ফেলতেও কোন দ্বীধা, কোন কুণ্ঠা জাগে না তাদের মনে। শরিয়ত বিরোধী কাজগুলোকে তখন মনে হতে থাকে খুবই উত্তম।

(৩) রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই আমি হাউসে কাউসারে তোমাদের অগ্রগামী হব। তোমাদের মধ্যে যে সেখানে পৌঁছাবে সেই পানি পান করবে। আর যে ব্যক্তি পান করবে সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। ঐ দিন আমার নিকট অনেক দলই উপস্থিত হবে, আমি তাদেরকে চিনবো, তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অত:পর আমার ও তাদের মাঝে পর্দা পড়ে যাবে। তখন আমি বলবো, নিশ্চয়ই এসব লোক আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হবে, নিশ্চয়ই আপনি অবগত নন যে, আপনার পর তারা কী কী বিদ'আত কাজ করেছে। আমি বলব, 'দূর হও, দূর হও', যারা আমার পর সুন্নাতে পরিবর্তন এনেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

(৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আল্লাহতা'য়ালা বিদ'আতী ব্যক্তির নামাজ, রোযা, সদকা, খয়রাত, হজ্জ, উমরা, জিহাদ এবং ফরজ ও নফল ইবাদত কিছুই কবুল করেন না। সে ইসলাম থেকে তেমনিভাবে

বেরিয়ে যায় যেমন বেরিয়ে আসে আটার খামির হতে চুল।

(৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: বিদ'আতী যে পর্যন্ড় তার বিদ'আত পরিত্যাগ না করবে, সে পর্যন্ড় তার আমল কবুল করতে আল্লাহপাক অস্বীকার করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি বিদ'আতীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল, সে ইসলাম ধ্বংস করার কাজে সহযোগিতা করল। (বায়হাকী)

(৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: অমুক সম্পর্কে আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, সে কোন বিদ'আত সৃষ্টি করেছে। যদি সত্যিই সে কোন বিদ'আত সৃষ্টি করে থাকে তবে তাকে আমার সালাম পৌঁছাবে না। (আল-ই'তিসাম, আল্লামা শাতিবী (রহ.))

(৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: তোমরা বিদ'আত থেকে সতর্ক থাকবে, কারণ প্রতিটি বিদ'আতই গুমরাহি। আর প্রত্যেক গুমরাহির পরিণাম হল জাহান্নাম। (আবু দাউদ ও আহমদ)

(৮) হযরত আবু উমামা (রা:) এর সূত্রে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে : "বিদ'আতীরা হচ্ছে জাহান্নামিদের কুকুর।" (কানযূল উম্মাল, দারাকুতনীর বরাতে)

(৯) তাবরানী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস (রা:) বলেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "আল্লাহ পাক বিদ'আতীদের জন্য তওবার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, অর্থাৎ সওয়াব মনে করে তারা বিদ'আতী কাজ করে বলে তাওবা করার প্রয়োজনীয়তাই বোধ করে না।"

(১০) আল্লামা শাতিবী (রহ:) 'আল-ইতিসাম' কিতাবে বিদ'আতের ভয়াবহতা সম্পর্কে যা লিখেছেন তা এতই মারাত্মক যে, বিদ'আতের সাথে নামাজ, রোযা, সাদকা প্রভৃতি কোন ইবাদাতই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। যারা বিদ'আতীর সঙ্গে উঠা বসা করে আল্লাহ তাদের হতে তাঁর হেফাজত উঠিয়ে নেন। এবং তাদেরকে একা ছেড়ে দেন। বিদ'আতীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাআত হতে বঞ্চিত। তাদের উপর আল্লাহর গজব পতিত হতে থাকে। বিদ'আতীরা হাউযে কাউসার হতে দূরে থাকবে। মৃতুকালে তাদের বেঈমান হয়ে মরার ভয় রয়েছে। আখিরাতে বিদ'আতীর মুখ কাল হবে; আর তাদের শাস্ড়ি হল জাহান্নামের আগুন। (আল-ইতিসাম)

(১১) হযরত আবু আমর শায়বাণী (রহ:) বলেছেন: বিদ'আতী ব্যক্তির জীবনে তওবা নসিব হয় না। কারণ সে তো একে গুণাহই মনে করে না। তার জন্য আবার তওবা কিসের।

(১২) হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "সর্বপ্রকার

গুনাহ থেকে বিদ'আতের গুণাহই ইবলিসের নিকট সবচেয়ে প্রিয়। কেননা অন্যান্য গুনাহ থেকে তাওবা করা হয়, কিন্তু বিদ'আত থেকে তাওবা করা হয় না।" (কোননা তাকে ইবাদাত মনে করা হয়।)

উকীল, মাধ্যম, শাফাআতকারী, সুপারিশকারী সম্পর্কে আকীদা

১. যারা কোন জীবিত বা মৃত আলিম, পীর, ওলী, বুজুর্গের কাছে গায়েবী সাহায্য চায়, তারা এভাবে ওযর পেশ করে– আমরা পাপী, পাপীর দু'আ আল্লাহতায়ালা কবুল করেন না। তাই এ সকল বুজুর্গ ব্যক্তিরা আমাদের জন্য আল্লাহপাকের কাছে সুপারিশ করবেন। উকীল ছাড়া যেমন জজের কাছে পৌঁছা যায় না, সিঁড়ি ছাড়া যেমন ছাদে ওঠা যায় না, পিএ বা গার্ডদের ডিঙ্গিয়ে যেমন প্রেসিডেন্টের কাছে যাওয়া যায় না, তদ্রূপ কোন দু'আ, আরজি, প্রার্থনা, ইবাদত সরাসরি মহান রাব্বুল আ'লামীনের কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে পীর, ওলী, বুজুর্গ ব্যক্তিরা উকীল, সুপারিশকারী, সিঁড়ি, মধ্যস্থতাকারী, পিএ হিসেবে কাজ করে বান্দার ইবাদত , জিকির, দু'আ বা প্রার্থনা আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেন।

২. তাদের এই অজুহাতের সাথে তৎকালিন কাফির মুশরিকদের বক্তব্যের একটা মিল রয়েছে। মুশফিকরা মূর্তি পূজা করে বলতো আমরাতো দেব দেবীর পূজা করি না, বরং তাদের কাছে প্রার্থনা করি এজন্য যে তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে। আর এরা বলছে- 'আমরা তো শিরক করি না, আমাদের ধারণাগুলি আউলিয়া আম্বিয়াগনের নিকট জানিয়ে থাকি মাত্র। যদি আমরা তাদেরকে আল্লাহর তুল্য বলে মনে করতাম, তবে শিরক হতো বটে, কিন্তু তা তো আমরা করি না। বরং আমরা তাঁদেরকে আল্লাহরই সৃষ্ট বান্দা বলে জানি। আর তাদের যা ক্ষমতা তা সেই আল্লাহ তায়ালাই তাঁদেরকে দিয়েছেন। এবং তাঁরই ইচ্ছায় তারা তা জগতের উপর প্রয়োগ করে থাকেন। তাঁরা আল্লাহর অত্যন্ত ভালবাসার পাত্র এবং যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন; আল্লাহর নিকট তাঁরা আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন; তাদেরকে ধরে আল্লাহকে পাওয়া যায়। তাদেরকে আমরা যতই ভক্তি ভরে ডাকব, তাদের ওসিলা দিয়ে যতই আমরা জিকির ও ইবাদত করবো ততই আল্লাহর নিকটে পৌঁছাতে পারবো। সুতরাং তাদেরকে ডাকা আর তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা বাস্তবিক পক্ষে সেই আল্লাহকেই ডাকা এবং তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়ে থাকে।'

৩. এরূপ প্রলাপের কারণ এই যে, তারা আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ ছেড়ে দিয়ে নিজের জ্ঞান বুদ্ধি মত চলতে আরম্ভ করেছে; মিথ্যা গল্প গুজব ও দূষিত চাল-চলনকে প্রমাণ বলে মেনে নিয়েছে। যদি

তারা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথাগুলি ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করত, তা হলে নিশ্চয়ই জানতে পারত যে, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে কাফিরগণও ঠিক ঐ প্রকার প্রলাপ বকতো। কিন্তু আল্লাহতা'আলা তার একটিও গ্রাহ্য করেন নাই, বরং সেগুলি যে মিথ্যা তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে।

৪. তিনি বলেছেন:

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَضُرُّ هُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللهِ ؕ قُلْ اَ تُنَبِّئُوْنَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِى الْاَرْضِ ؕ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

"এবং তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুর উপাসনা করে যা তাদের উপকার বা অপকার কিছুই করতে পারে না এবং তারা বলে থাকে যে, তারা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশ করবে। হে মুহাম্মাদ! আপনি বলুন, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্য থেকে তোমরা কি আল্লাহতা'আলাকে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও যা তিনি জানেন না? তিনি পুত: পবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে যাকে তোমরা শরিক করছ। (সূরা ইউনূস: ১৮)

৫. মুর্খ লোকেরা বলে বেড়ায় যে, বুজুর্গ লোকদের নিকট যে আমরা প্রার্থনা করি, তা এ উদ্দেশ্যে যে তারা আল্লাহর নিকট থেকে নিয়ে আমাদের দান করে থাকেন। আমরা তাদেরকে আসল দাতা মনে করি না। দাতা তো আল্লাহ, তবে তারা হলেন মাধ্যম।

এ সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (রহ:) লিখেছেন : অর্থাৎ জেনে রাখ "মৃত লোকের নিকট হাজত তলব করা এ বিশ্বাসে যে তারা হাজত পূরণ ক্ষেত্রে কেবল মাধ্যম– এটি কুফরী। কিন্তু এ যুগের লোকেরা তাতে বেশী মগ্ন।" (আল-খায়রুল কাছীর, পৃঃ ১০৫)

৬. মুশরিকগণ আল্লাহকে সৃষ্টি কর্তা ও প্রতিপালক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, যেমন আল্লাহতা'আলা বলেন:

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلَنَّ اللهُ

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। এরূপ আরও বেশ কয়েকটি সমার্থক আয়াত রয়েছে। (দেখুন ফাতাওয়ায়ে সিদ্দিকীন, তাওহীদ ফিস সিফাত অধ্যায়)

৭. তবুও আল্লাহতা'আলা তাদেরকে কাফিরই বলে থাকেন এ জন্যে যে, তারা মূর্তি, দেব-দেবীর জিনপরীদের সাথে ভ্রান্ত সম্পর্ক স্থাপন করে এবং বলে থাকে-

هٰؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللهِ

'এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।' (সূরা ইউনুস : ১৮)

৮. আল্লাহতা'আলা বলেন:

وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللهِ زُلْفٰى

"যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে ওলীরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে, আমরা তো ওদের ইবাদত এজন্যই করি যাতে তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।" (সূরা যুমার : ৩)

৯. আল্লাহতা'আলা বলেন:

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَآءَ ؕ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّ لَا يَعْقِلُوْنَ

ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সুপারিশকারী হিসেবে আর কাউকে স্থির করে রেখেছে নাকি? আপনি বলুন, যদি ওরা কিছুমাত্র ক্ষমতা না রাখে, আর কিছু মাত্র জ্ঞান তাদের না থাকে তবুও। (সূরা যুমার : ৪৩)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, "তাদের সুপারিশের এখতিয়ার নেই। কিন্তু যে করুণাময় আল্লাহর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।" (সূরা মরিয়ম)

১০. আল্লাহতা'আলা আরও বলেন:

وَ اَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّ لَا شَفِيْعٌ

"আপনি তাদেরকে এর (কুরআনের) মাধ্যমে সতর্ক করুন যারা নিজেদের পালনকর্তার দরবারে হাজির হওয়ার ব্যাপারে ভীত রয়েছে, তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কোন ওলী এবং সুপারিশকারী নেই। (সূরা আন'আম : ৫১)

১১. আল্লাহতা'আলা বলেন: وَ لَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ

তাঁকে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে ডাকছে, তারা সুপারিশ করার ক্ষমতাও রাখে না। (সূরা যুখরুফ : ৮৬)

১২. পরম করুণাময় আল্লাহতা'আলা সমুদয় বাদশাহের বাদশাহ হলেও দুনিয়ার বাদশাহরা যেমন গর্বিত হয়ে প্রজার কাতর প্রার্থনার প্রতি দাম্ভিকতা বশত: দৃষ্টিপাত করে না, বরং তার জন্য আমীর উজীরদিগকে মধ্যস্থ ধরে তাদের সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয়, তিনি তেমন নন। তিনি অতিশয় দয়ালু, বড়ই মেহেরবান। সেখানে কোন ওকালত মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। যে তাকে মনে করে, তিনিও তাকে মনে করে থাকেন। এজন্য অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। এই রকম যদিও তিনি সর্বশক্তিমান ও সমুন্নত, তথাপি অন্যান্য রাজা বাদশাহদের মত তাঁর এমন কোন দরবার গৃহ নাই, যেখানে প্রজাগণ উপস্থিত হতে পারে না, আর

রাজকর্মচারীগণ তাদের উপর যা ইচ্ছা হুকুম চালাতে পারে; তাই প্রজাগণও নাচার হয়ে তাদেরকেই মানতে বাধ্য হয়। কিন্তু আল্লাহ বান্দার অতি নিকটে, তাঁর কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বান্দাও ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁকে ডাকামাত্র তাঁকে পেয়ে থাকে। নিজেদের অমনোযোগিতা এবং ভ্রমের পর্দা ব্যতীত তাঁর মধ্যে এবং বান্দার মধ্যে কোন আড়াল নাই।

১৩. মহান আল্লাহ বলেন : نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

আমি মানুষের গর্দানের রগের চেয়েও নিকটে। (সূরা কাফ: ১৬)

অন্যত্র বলা হচ্ছে, وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

তিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন। আল্লাহ সবই দেখছেন তোমরা যা কিছু করে যাচ্ছ। (সূরা হাদীদ: ৪)

যে আল্লাহ মানুষের এত কাছে ও নিকট হতে তার প্রার্থনা শোনেন ও কবুল করেন, তাঁর নিকট দু'আ বা প্রার্থনা পৌঁছানোর জন্যে কোন মাধ্যম, সুপারিশকারী, শাফাআতকারী, উকীল, সিড়ি ইত্যাদির প্রয়োজন আছে কি?

১৪. ধরুন কোন প্রজা নিজ বাদশাহের সামনে বসে আছে, বাদশাহও তার কথা শুনবার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছেন। এখন যদি ঐ প্রজা দূরের কোন আমীরকে ডেকে বলতে থাকে আপনি অনুগ্রহ করে আমার এই প্রার্থনাটি বাদশাহের সামনে পৌঁছে দিন, তাকে আমার কথা জানিয়ে দিন, তবে বুঝতে হবে যে ঐ ব্যক্তি হয় অন্ধ না হয় পাগল উম্মাদ।

১৫. হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহ:) তাঁর 'তাকভিয়াতুল ঈমান' গ্রন্থে এভাবে লিখেছেন– "আবু দাউদ জোবায়র (রা:) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক অশিক্ষিত বেদুঈন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল যে, প্রাণীগণ বিষম সঙ্কটে পড়েছে, পরিবারবর্গ ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে, পালিত পশুবর্গ বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছে, অতএব আপনি আমাদের জন্য আল্লাহতা'আলার নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। কারণ আমরা আল্লাহর সমীপে আপনার এবং আপনার সমীপে আল্লাহর অনুরোধ প্রার্থনা করি। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ পবিত্র! অত:পর তিনি এরূপভাবে আল্লাহতাআলার পবিত্রতা ও মহত্ব বর্ণনা করতে লাগলেন যে, তাঁর অনুচরবর্গের মুখমণ্ডলে ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠল। তারপর তিনি বললেন, তুমি গোল্লায় যাও, আল্লাহতাআলার জন্য কারও নিকট অনুরোধ করতে হয় না। তিনি তা হতে পবিত্র। তাঁর মহিমা মহান! কি সর্বনাশের কথা। আল্লাহ কে তা কি তুমি জান? আকাশসমূহের উপর তাঁর আসন এরূপভাবে রয়েছে এবং আঙ্গুল দ্বারা দেখিয়ে বললেন যে, তারপর বুরুজের (গম্বুজের) ন্যায়। আরোহীর ভারে উটের পালান (হাওদা) যেমন চড় চড় শব্দ

করে, আল্লাহতাআলার মহত্ত্বাসনে ভয়ে ঐ গম্বুজও তেমনি মড় মড় শব্দ করে"।
(মিশকাত, বাবু বদউল খালক)

১৬. গুনাহগার ব্যক্তির কি সরাসরি আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ারই অধিকার নেই?

গুনাহগার ব্যক্তির সরাসরি আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার অধিকার নেই, এজন্য আল্লাহর দরবারে হাত তোলার পূর্বে কোন বুজুর্গ ব্যক্তিকে সাথে নিতে হবে। এগুলো এমন কথা ইসলামে যার কোন ভিত্তি নেই। ইবলিসও সরাসরি আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করেছিল। পবিত্র কুরআনের বানী :

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۞ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۞ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ

সে (শয়তান) বলল, হে আমার প্রভু! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। তিনি (প্রভু) বললেন, তুমি সেই নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে। (সূরা হিজর: ৩৬-৩৮)

কাফিররাও সরাসরি আল্লাহতা'আলার দরবারে দু'আ করেছিল এবং তা কবুল হয়েছিল। কুরআনের বাণী:

دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۞ فَلَمَّا اَنْجٰهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

তারা সকলেই নিজেদের দীনকে আল্লাহর জন্য খালেস করে দিয়ে তাঁর কাছে দু'আ করে। তুমি যদি বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা কর তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকব। কিন্তু যখন তিনি তাদের উদ্ধার করেন, তখন তারাই অন্যায়ভাবে জমিনের বুকে বিদ্রোহ করতে শুরু করে। (সূরা ইউনূস: ২২-২৩)

ইবলিস ও তার সৈন্যরা যে অধিকার লাভ করেছে সেই অধিকারটুকুও কি গুনাহগার মুসলমানরা পেতে পারে না? তারা কি শয়তানের চেয়েও বড় অপরাধী হয়ে গেল? কোন মুসলমানের দ্বারা গুনাহর কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে তার কর্তব্য হচ্ছে অনতিবিলম্বে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। কোন নবী, ওলী, বুজুর্গ ব্যক্তিকে মাধ্যম হিসেবে নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَ كَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

আর যাদের অবস্থা এমন যে, তাদের দ্বারা যদি কোন অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয় অথবা নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করে বসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া গুনাহ্ মাফ করতে পারে এমন আর কে আছে? (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫)

কোন ব্যক্তির অবস্থা যদি এই হয় যে, তার কোন দু'আই কবুল হতে পারে না- তাহলে তার জন্য অপর কারো দু'আ কবুল না হওয়াই উচিত। দু'আ কারী চাই ওলীকুল শিরোমণি, সাইয়েদুল আম্বিয়াই হোন না কেন। দেখছেন না, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগফিরাতের দু'আ করেছিলেন কিন্তু তা কবুল হয়নি।

সাধারণ মুসলমানদের সম্পর্কে বলতে হয়, আল্লাহকে সরাসরি ডাকার অধিকার তাদের রয়েছে, বরং তাঁকে সরাসরি ডাকা তাদের ওপর ফরয। এজন্য অপর কোন সৃষ্টির দিকে ভ্রুক্ষেপও না করা চাই। তবে একথা সত্য যে, দু'আ কবুল হওয়ার জন্য ইখলাস, আন্তরিকতা নিষ্ঠা এবং তাকওয়া বর্তমান থাকা শর্ত।

১৭. সুপারিশকারী, মধ্যস্থতাকারী, সাহায্যকারী, উকীল ছাড়াই আল্লাহপাক বান্দার দু'আ কবুল করেন

আল্লাহপাক কুরআন শরীফে ইরশাদ করেছেন-

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

'আমি জবাব দিয়ে থাকি যখন বান্দা আমাকে ডাকে। সুতরাং কর্তব্য হচ্ছে বান্দা আমার হুকুম যেন মেনে চলে এবং আমার উপর আস্থাবান হয়, যাতে সরল, সহজ সত্য পথে এগিয়ে যেতে পারে।' (সূরা বাকারা: ১৮৬)

আল্লাহতা'আলা আরও বলেন:

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْٓءَ

কে জবাব দেয়? যখন অসহায় ও পেরেশানির সময় মানুষ তাঁকে (আল্লাহকে) ডাকে, আর তার কষ্ট মসিবত দূর করে। (সূরা নামল: ৬২)

এই সমস্ত আয়াত থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহতা'আলার কাছে প্রার্থনা করলে মহান আল্লাহ সরাসরি তার ডাকে সাড়া দেন।

১৮. শাফাআত বা সুপারিশ সম্পর্কে আকীদা

হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহ.) তাকভিয়াতুল ঈমান গ্রন্থে এভাবে লিখেছেন, "একদল লোক আউলিয়া, আম্বিয়াগণের শাফায়াত-সুপারিশের উপর নির্ভর করে এবং শাফা'আতের প্রকৃত মর্ম বুঝতে না পেরে আহলাদে আটকানা হয়ে আল্লাহকে ভুলে আমল ছেড়ে বসে আছে। সুতরাং শাফা'আতের খাঁটি মর্ম বুঝে নেয়া প্রয়োজন। কোন বিচারক বাদশাহের নিকট সুপারিশ করে, কোন অপরাধীকে শাস্তি হতে বাঁচিয়ে দেয়াকে শাফা'আত বলে। দুনিয়াতে এটা কয়েক প্রকার হয়ে

থাকে।

শাফাআতের প্রথম অবস্থা : বাদশাহের দরবারে কোন চোরের চুরি প্রমাণিত হলে কোন বড় উচ্চ মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন আমীর বা উজীর যদি তার পক্ষে সুপারিশ করে, তবে বাদ্‌শাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন। একে 'মর্যাদামূলক অনুরোধ' বলে। কারণ এখানে অনুরোধকারী উচ্চ পদমর্যাদার জন্য রাজা তার অনুরোধ গ্রাহ্য করে থাকেন।

এ প্রকারের সুপারিশ আল্লাহর দরবারে কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি কোন পীর, পয়গাম্বর, ওলী, নবী, শহীদ কিম্বা ফিরিশতাকে আল্লাহর নিকট ঐ প্রকারের অনুরোধকারী মনে করে, তবে সে নিরেট মুশরিক এবং অতি বড় মুর্খ।

শাফা'আতের দ্বিতীয় অবস্থা : কোন বাদশাহজাদা কিংবা বেগম অথবা বাদশাহর কোন প্রণয় পাত্র কোন চোরের জন্য যদি বাদশাহের দরবারে দন্ডায়মান হয়ে তার শাস্ড়ি মওকুফের সুপারিশ করে, বাদশাহ তখন স্নেহ ভালবাসার খাতিরে নাচার হয়ে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। একে 'প্রণয়মূলক অনুরোধ' বলে। আল্লাহতা'আলার দরবারে এরূপ অনুরোধ কোনমতেই সম্ভবপর নয়।

শাফা'আতের তৃতীয় অবস্থা : কোন চোরের উপর চুরির অপরাধ সাব্যস্ড় হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সে চিরদিনের অভ্যস্ড় চোর নয় এবং চুরি তার পেশাও নয়, তবে প্রবৃত্তির প্ররোচনায় ভ্রান্ড়িবশতঃ হঠাৎ একটা অপরাধ করে ফেলেছে। সে তারজন্য আন্ড়রিকভাবে লজ্জিত এবং দুঃখিত হয়ে দিবারাত্রি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। বাদশাহের আইনকে শিরোধার্য করে নিজেকে অপরাধী মনে করছে, তাঁর আশ্রয় ত্যাগ করে অন্য কোন আমীর ওমরাহের সাহায্য প্রার্থী হচ্ছে না; অথবা তাঁর সমীপে কাউকেও সাহায্য করতে সক্ষম ভেবে নির্ভয় হচ্ছে না। একমাত্র সেই বাদশাহের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে তিনি কি আদেশ করেন, সেই অপেক্ষায় কাতর হয়ে তাঁরই মুখের দিকে চেয়ে আছে। আর তার এই অবস্থা দেখে বাদশাহের হৃদয়েও কর"ণার সঞ্চার হচ্ছে, কিন্তু অন্যের চোখে আইনের মর্যাদা খাটো হয় ভেবে বিনা কারণে বিনা উপলক্ষে তিনি রাজ আইনের অবমাননা করে ক্ষমাও করতে পারছেন না। এমতাবস্থায়, বাদশাহের ইচ্ছা ও ইঙ্গিতাদেশ বুঝতে পেরে যদি আমীর ওমরাহ ঐ অপরাধীর জন্য অনুরোধ করেন, তবে বাদশাহ ঐ আমীরের সম্মান বাড়াবার জন্য প্রকাশ্যে তাঁর সুপারিশের নাম করে অপরাধীকে ক্ষমা করে থাকেন। আমীর এখানে আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের খাতিরে অথবা সাহায্য করতে সক্ষমরূপে চোরের জন্য অনুরোধ করেন না। বরঞ্চ ইহা সম্পূর্ণ বাদশাহের মর্জ্জি মুতাবেকই হয়ে থাকে। এ প্রকারের শাফাআতকে 'শাফাআ'ত বিল ইযিন' অর্থাৎ "অনুমতিমূলক সুপারিশ" বলে। কারণ ইহা সম্পূর্ণ বাদশাহের ইচ্ছা ও অনুমতির উপর নির্ভর করে। এই প্রকার অনুরোধই আল্লাহর দরবারে সম্ভবপর এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীসে নবী ওলীগণের সম্বন্ধে যে অনুরোধ করার উল্লেখ আছে, ইহা তার প্রকৃত মর্ম।" [তাকভিয়াতুল ঈমান, হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহ.)]

পীর ওলী বুজুর্গদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক কোনই কাজে আসবে না

কোন পীরওলী বুজুর্গ লোকের সাথে যাদের আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা থাকে, সেই বুজুর্গগণের সাহায্যের উপর নির্ভর করে এবং গর্বিত হয়ে তাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় কম হতে পারে। সেই মোহ ভাঙবার জন্য আল্লাহতা'আলা তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রকৃত অবস্থা তাঁর আত্মীয়বর্গকে, এমন কি নিজের প্রিয় মেয়েকে পর্যন্ড় ডেকে জানিয়ে শুনিয়ে দিয়াছেন যে, যে বস্তুর উপর তার অধিকার আছে, শুধু তার দ্বারাই আত্মীয়বর্গের হক আদায় করা যেতে পারে। আমার সম্পত্তি যা আছে, তোমাদের ব্যাপারে সেই ক্ষেত্রে আমার কোনই কার্পণ্য নেই। যত ইচ্ছা নিতে পার। কিন্তু আল্লাহর নিকটের মোকদ্দমা আমার অধিকারের বাইরে; সেখানে আমি কাউকেও সাহায্য করতে অক্ষম। সেখানকার কার্যকলাপের জন্য প্রত্যেককে নিজে নিজে প্রস্তুতি নিতে হবে। সেখানে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পেতে হলে, নিজে তার জন্য পথ পরিষ্কার করতে হবে। হাদীস শরীফে আছে-

"বুখারী এবং মুসলিম আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি যখন "তোমার পরিজন ও আত্মীয়গণকে ভয় প্রদর্শন কর" কুরআনের এ বাণী অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি প্রথমে সকল আত্মীয়কে একত্রিত করে, ও পরে পৃথক পৃথকভাবে ডেকে বলেছেন, হে কাব ইবনে লুয়াই এর বংশধরগণ! হে মোররা বিন কা'বের সন্ড়ানগণ! হে আব্দুস শাম্‌শের পুত্রগণ! হে আবদে মানাফের সন্তানগণ! হে বনি হাশেমের বংশধরগণ! হে আব্দুল মোত্তালেবের সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা কর। কেননা আল্লাহর নিকট আমি তোমাদের কোনই কাজে আসবো না। হে ফাতেমা! রক্ষা কর নিজেকে আগুন থেকে এবং (টাকাকড়ি ইত্যাদি) আমার সম্পদ থেকে যত চাও আমার কাছে চেয়ে নাও। আল্লাহতা'আলার সামনে আমি তোমাদের কোনই কাজে আসবো না।" (মিশকাত, বাবুল খিলাফত ওয়াল ইমারত)

আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভের জন্য

ওসিলা গ্রহণ প্রসঙ্গে আকীদা

১. আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভের জন্য ওসিলা অন্বেষন করা শুধু জায়েজই নয়, অবশ্য কর্তব্যও। কুরআন শরীফে আল্লাহপাক স্বয়ং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য ওসিলা অন্বেষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় 'ওসিলা' অন্বেষণ কর এবং জিহাদ কর তাঁর পথে, যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার।" (সূরা মায়িদা, আয়াত : ৩৫)

এ আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহপাককে ভয় করে নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে। এ আয়াতটির সঠিক ব্যাখ্যা জানতে হলে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে 'ওসিলা' শব্দের অর্থ কি, কুরআনের এ আয়াতে কোন অর্থে 'ওসিলা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তারপরই এ আয়াতের যথার্থ বক্তব্য বুঝতে পারা যাবে।

২. কুরআন মাজীদে এই 'ওসিলা' শব্দটি এ আয়াত ছাড়া আরো একটি আয়াতে মোট দুই জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। অপর আয়াতটি হল এই :

قُلِ ادْعُوْا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لَا تَحْوِيْلًا ۞ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَ يَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ۚ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا

বল, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের মা'বুদ বলে মনে কর তাদের একবার ডাক, তারা তোমাদের থেকে বিপদ ও কষ্ট দূর করতে কিংবা তা বদলে দেবার কোন ক্ষমতা রাখে না। এই লোকেরা যাদের ডাকে, তারাই তাদের পরোয়ারদিগারের নিকট নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী, তাঁর রহমতের তারা আশা করে, তাঁর আযাবকে তারা ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তিড় ভয়াবহ। (সূরা বনী ইসরাইল : ৫৬-৫৭)

৩. এ দু'জায়গায় যে (اَلْوَ سِيْلَةُ) শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে তার মানে কি? কুরআন মাজীদের শব্দ ব্যাখ্যা–লেখক সর্বজনমান্য মনীষী আল্লামা রাগেব ইসফাহানী এ শব্দের অর্থ লিখেছেন :

اَلْوَسِيْلَةُ التَّوَصُّلُ اِلَى الشَّيْءِ بِرَغْبَةٍ وَهِىَ اَخَصُّ مِنَ الْوَسِيْلَةِ لِتَضَمُّنِهَا لِمَعْنَى الرَّغْبَةِ

ওসিলা মানে কোন জিনিসের নিকটে আগ্রহসহকারে পৌঁছা। এর মধ্যে আগ্রহের ভাব আছে বলে তা ওসিলা বা পৌঁছা অপেক্ষা একটু বিশেষ অর্থ

জ্ঞাপক।

৪. খতীব (اَلسِّرَاجُ) নামক গ্রন্থে লিখেছেন: (اَلْوَسِيْلَةُ) বিশেষ্য, মানে নৈকট্য, নিকটবর্তী হওয়া, নৈকট্য লাভের উপায় অর্থাৎ আনুগত্য।

৫. আল্লামা কুরতুবী তার তাফসীর আলজামে লি আহকামিল কুরআন (اَلْجَامِعُ لِاَحْكَامِ الْقُرْاٰنِ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন (اَلْوَسِيْلَةُ هِىَ الْقُرْبَةُ) 'ওসিলা শব্দের মানে হল নৈকট্য।'

৬. ইমাম সুয়ুতী (রহ:) প্রথমোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

اَلْوَ سِيْلَةُ مَا يُقَرِّبُكُمْ اِلَيْهِمْ مِنَ الطَّاعَةِ

'ওসিলা হচ্ছে সেই আনুগত্য- ইবাদত, যা তোমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দেয়। আর পরবর্তী আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: 'ইবাদাতের সাহায্যে নৈকট্য লাভ।'

৭. আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ:) তাঁর তাফসীরে প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন তার তরজমা এই– আল্লাহতা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে তাঁর প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাকওয়াকে যদি তাঁর আনুগত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া যায় তাহলে তার অর্থ হবে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করা। আর তারই পর বলেছেন: তাঁর নিকট ওসিলা সন্ধান কর।

৮. অত:পর লিখেছেন : সুফিয়ান সওরী তালহা থেকে, তালহা আতা থেকে এবং আতা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'ওসিলা মানে (قُرْبَةٌ) নৈকট্য। হযরত মুজাহিদ (রহ:), আবু ওয়েল (রহ:), হাসান (রহ:), কাতাদাহ (রহ:), আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর (রহ:), সুদ্দী (রহ:), ইবনে জায়েদ (রহ:) প্রমুখ প্রখ্যাত প্রাচীন মনীষী এই কথাই বলেছেন। আর হযরত কাতাদাহ (রহ:) এ আয়াতের তরজমা করেছেন এভাবে : اَىْ تَقَرَّبُوْا اِلَيْهِ بِطَاعَتِهٖ وَالْعَمَلُ بِمَا يَرْضِيْهِ অর্থাৎ তাঁর দিকে তোমরা নৈকট্য লাভ কর, তাঁর আনুগত্য কর এবং যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তা কর।

৯. হাদীস শরীফে 'ওসিলা' বলতে বুঝানো হয়েছে জান্নাতের একটি বিশেষ মর্যাদাকে যা' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। বুখারী শরীফে হযরত জাবির থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আযান শুনে যে লোক বলবে: হে আল্লাহ, এই পূর্ণ দাওয়াতের ও কায়েম করা নামাযের রব! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে 'ওসিলা' দান কর, মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে সেই মাকামে মাহমুদে পাঠাও, যার ওয়াদা তুমি তাকে করেছ, কিয়ামতের দিন তাঁর শাফায়াত অনিবার্য হবে।

১০. মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন:

তোমরা মুয়াযযিনের আযান শুনতে পেলে সে যা যা বলে তোমরাও তাই বলতে থাক। পরে আমার প্রতি দরুদ পাঠ কর। বস্তুত যে লোক আমার প্রতি এক দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার প্রতি দশ দরূদ পাঠাবেন। অত:পর তোমরা আমার জন্যে 'ওসিলা'র সওয়াল কর। কেননা এ হচ্ছে জান্নাতের একটি বিশেষ মনজিল।

১১. আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (রহ:) লিখেছেন : وَ اِبْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةُ اَىِ الْقُرْبَةِ بِالْعَمَلِ আল্লাহর নিকট 'ওসিলা' তালাশ কর অর্থ আমলের সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য তালাশ কর। বস্তুত (تَوَسُّلُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ (تَقْرَبُ) নৈকট্য, আর (وَسِيْلَةُ) হচ্ছে: (مَاتَقْرَبُ بِهِ اِلَى شَىْءٍ) তা "যার সাহায্যে অপর জিনিসের নিকটবর্তী হওয়া যায়।" শরীয়তে (تَوَسُّلُ) এর এই আভিধানিক অর্থই গৃহীত হয়েছে। কুরআনের যে দুটো আয়াতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সমস্ত মুফাসসির এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত যে, উভয় জায়গায়ই এ শব্দের এই অর্থই লক্ষ্যভূত হয়েছে, অন্য কোন অর্থ নয়। আর বিস্তারিত আলোচনার দৃষ্টিতে গোটা আয়াতের অর্থ হলঃ 'হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, ভয় করে আল্লাহর নৈকট্য বা নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান কর এবং এ জন্যেই আল্লাহর পথে জিহাদ কর।'

১২. ইমাম কুরতবী তাঁর (اَلْجَامِعُ لِاَحْكَامِ الْقُرْاٰنِ) নামক তাফসীরে, ইমাম ইবনে কাসীর তাঁর (تَفْسِيْرُ الْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ) নামক তাফসীরে এবং ইমাম শাওকানী তাঁর (فَتْحُ الْقَدِيْرُ) নামক তাফসীরে এই একই কথা লিখেছেন।

১৩. আল-কুরআনে ওসিলা সম্পর্কিত এ আয়াতটিকে দলীল হিসেবে পেশ করে যারা ওলীগণের কবরের পাশে গিয়ে তাদেরকে বলে, আপনি বা আপনারা আমাদের মকছুদ পূর্ণ করে দিন, অথবা বলে, হে আল্লাহর ওলী বা ওলীগণ! আপনারা আল্লাহর নিকট দু'আ করেন, তিনি যেন আমাদের অমুক অমুক মকছুদ পূর্ণ করে দেন। তাদের এ ধরনের বলার কোন ভিত্তি শরীআতে নেই।

১৪. এসব কার্মকাণ্ড যারা করে এবং যারা এসব বিদ'আতী কর্মকাণ্ডের পক্ষে বানাওটি দলীল প্রমাণ পেশ করার অপচেষ্টা চালায়, এদের সব রকমের ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা যে কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ প্রমাণাদির সম্পূর্ণ বিপরীত, এ সম্পর্কে

অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত কিতাবে ওসিলা তালাশ করা সম্পর্কীয় কুরআনিক বক্তব্যের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত একটি আলোচনা নিম্নরূপ:

১৫. ওসিলা সম্পর্কিত আয়াতে কি বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকারীগণ আয়াতটুকুর ব্যাখ্যা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, উল্লিখিত কুরআনিক বক্তব্যের সারকথা হলো-

(১) আল্লাহতা'আলার আদেশ নিষেধ মেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত মোতাবেক আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং ইবাদতকে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির ওসিলা করা। আর এটাই হলো ওসিলা তালাশের নির্দেশ সম্বলিত উক্ত কুরআনিক বক্তব্যের প্রধান ও সঠিক অর্থ। আল্লাহর ইবাদত ও রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসৃত মত ও পথ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন অবশ্যই এ ওসিলার শামিল। আর এজন্য জ্ঞানী গুণী ও হাক্কানী আলিম, পীর ওলীগণের সংশ্রব ও সোহবত ওসিলা তালাশের অন্তর্ভুক্ত।

(২) তোমরা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার পথে অগ্রসর হও।

(৩) আল্লাহর নৈকট্য তালাশ কর।

(৪) তোমাদের হাজাত, মাকছুদ একমাত্র আল্লাহর নিকট চাইবে, অন্য কারো নিকট নয়।

এ হলো আয়াতের উল্লেখিত ওসিলা তলব করার প্রামাণিক ও যথাযথ ব্যাখ্যা।

১৬. কিন্তু যারা উল্লেখিত আয়াত থেকে বক্র ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে, সে সম্পর্কে রুহুল মা'আনীর উক্ত বক্তব্যের সারকথা হলো-

(ক) আল্লাহর ওলী ও নেক বান্দাগণের নিকট গায়েবী সাহায্যের প্রার্থনা করা।

(খ) এবং তাদেরকে আল্লাহর ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থ সাব্যস্ত করা।

(গ) আর তাদের কসম দিয়ে আল্লাহর নিকট কিছু পাওয়ার জন্য দাবী জানাতে গিয়ে আল্লাহকে এরূপ বলা, হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে অমুকের কসম দিয়ে বলছি, তুমি আমাদের অমুক অমুক বস্তু দান কর।

উল্লেখিত কুরআনিক বক্তব্য থেকে এসব কথা গ্রহণ করতে যাওয়া সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এসব ভিত্তিহীন অর্থ গ্রহণকারীদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যে, আল্লাহতা'আলার নেক বান্দা ও ওলীগণের মধ্যে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে অথবা মৃত ব্যক্তিদেরকে ডেকে তাদেরকে বলে, হে অমুক ওলী! আপনি আল্লাহতা'আলার নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে অমুক অমুক বস্তু দান করেন। আবার এসব লোক এ ধরণের অনর্থক ধারণাও করে থাকে যে, এসব হলো কুরআনিক বক্তব্যে উল্লেখিত ওসিলা তালাশের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখিত ভিত্তিহীন কথাগুলোর প্রত্যেকটি কথাই কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা

প্রামাণ্য সঠিক দ্বীন ও শরিয়ত থেকে বহু দূরে অর্থাৎ এসব কথা কুরআন নির্দেশিত ওসিলা গ্রহণের সাথে বৈধ কোন সম্পর্কই রাখে না।

আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভের জন্য পীর, ওলী বা বুজুর্গ ব্যক্তির ওসিলা গ্রহণ প্রসঙ্গে আকীদা

১. আল্লাহকে পাওয়ার জন্যে, তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে, ক্ষমা ও সাহায্য পাওয়ার আশায় কোন জীবিত বা মৃত পীর, ওলী বা বুজুর্গ ব্যক্তিকে 'ওসিলা' বা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার রীতি সমাজে প্রচলিত আছে। এ রীতির স্বপক্ষে যুক্তি দেখানো হয় – 'পীর, ওলী, বুজুর্গ ব্যক্তিরা হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা। কিন্তু তারা পাক- পবিত্র, নেককার, আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁরা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দেবেন, নাজাতের ব্যবস্থা করে দেবেন, জান্নাত পাইয়ে দেবেন। তাই আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে তাদেরকে ওসিলা হিসেবে গ্রহন করি। তাঁদের ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব নয়, নাজাতের কোন উপায় নাই।'

২. ইসলামের দৃষ্টিতে এটা ভ্রান্ড় কথা তাতে সন্দেহ নেই। আল্লাহতা'আলা আমাদের কাছে কখনো এরূপ দাবি করেননি যে, তোমাদের সাথে আরো কিছু লোক নিয়ে আমার কাছে আস। তারা আমার কাছে তোমাদের সৎ কাজগুলো জমা দেবেন এবং পাপ কাজগুলো মাফ করিয়ে নেবে। মহান আল্লাহর বাণী:

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ

এরা কি খোদার এমন কিছু শরীক বানিয়ে নিয়েছে, যারা এদের জন্যে দীনের মধ্যে কোন আইন-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে-আল্লাহ যার কোন অনুমতি দেননি? (সূরা শূরা : ২১)

৩. বরং এটা তো ইসলামের একেবারে প্রাথমিক এবং বুনিয়াদী কথার অন্ড়র্ভুক্ত যে, চাওয়া পাওয়ার জন্য, নৈকট্য লাভের জন্য সরাসরি আল্লাহর কাছে আবেদন করতে হবে। মধ্যস্থতার কোন প্রয়োজন নেই।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَ يَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ

এরা যাদের ডাকে তারা নিজেরাই তাদের খোদার কাছে পৌঁছানোর ওসিলা তালাশ করছে যে, কে তাঁর অধিক নিকটবর্তী হয়ে যাবে এবং তাঁরা তাঁর রহমতের প্রত্যাশী ও তাঁর শাস্ড়িকে ভয়কারী। (সূরা বনী ইসরাইল : ৫৭)

৪. নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

কোন ব্যক্তি কখনও নিজে 'আমলের ওসিলায় জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সাহাবীগণ (রা:) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও নন কি? রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমিও নই। তবে আল্লাহর রহমত আমাকে বেষ্টন করে নেবে।

৫. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কলিজার টুকরা নয়নের মণি ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদকে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফুফু সুফিয়া (রা:) কেও স্মরণ করে জানিয়ে দিলেন যে, সেদিন কোন ব্যাপারে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের জন্য যথেষ্ট নই। এখন পাঠক মহোদয়গণ গভীরভাবে চিন্ড়া করে দেখুন, আলিম ওলামা পীর মাশায়েখ বুজুর্গ আলেমগণ তাদের শিষ্য, শাগরিদদের জন্য কি করে নাজাতের ওসিলা হতে পারেন?

জিকিরের সময় পীরের কলবের ওসিলা প্রসঙ্গে আকীদা

১. জিকির করা আল্লাহর হুকুম, পীর হলেন শিক্ষক। তিনি জিকির করার পদ্ধতি মুরীদকে শিখিয়ে দেবেন। কিন্তু মুরীদ যখন আল্লাহর জিকির করবে তখন আর তৃতীয় কাউকে মধ্যস্থ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, এমন কি পীরকেও না।

২. জিকিরের সময় পীরের কলবের ওসিলা দেবার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা' কুরআন ও হাদীস সমর্থিত নয়। সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, চার মাজহাবের ইমাম, চার তরীকার পীরানে পীরদের থেকে এরূপ কলবের ওসিলা দেবার কোন প্রমান নেই। অনেকে বলেন, পীরের কলবের ওসিলা দিলে আল্লাহর পক্ষ হতে জিকিরের নূর তাঁর কলব হয়ে মুরীদের কলবে এসে তার কলবকে নূরাণী করে দেবে, আর ওসিলা না দিলে মুরীদের গোনাহগার কলবে নূর আসবে না। এরূপ কথা কুরআন সুন্নাহ বিরোধী। গোনাহগার বান্দা যখন সরাসরি আল্লাহকে ডাকবে, আল্লাহ পক্ষ থেকে জিকিরের নূর সরাসরি গোনাহগার বান্দার কলবে আসতে থাকবে এবং এভাবে জিকির করতে করতে তার কলব নূরানী হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে কলব নূরানী করার জন্য পীরের কলবের ওসিলা দেবার কোন প্রয়োজন নেই। যেখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বুকে জড়িয়ে আদর করে লালন পালন করা সত্ত্বেও ঈমানের অভাবে আবু তালেব জান্নাতী হতে পারলেন না, যেখানে বহুদূর থেকে জিন্দা বা মুর্দা পীরের কলবের ওসিলা দিয়ে কি কলব নূরানী করে কি জান্নাতী হওয়া যাবে?

৩. যেই আল্লাহ 'হাইয়্যুল কাইয়্যুম' - চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক ও রক্ষক। (সূরা বাকারা : ২৫৫) সদা সর্বত্র হাজির নাজির, আলিমুল গায়েব-বান্দার অন্ড়রের গোপন কথাও যিনি জানেন, 'সামিয়ুম বাসির' সবকিছু শোনেন, দেখেন, তন্দ্রা ও

নিদ্রা যাকে স্পর্শ করে না, তিনি সর্বময় ক্ষমতা তথা 'কুন ফা ইয়া কুনের মালিক', যিনি যা–ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আমরা যেখানেই থাকি না কেনো যিনি আমাদের সাথে আছেন, স্বীয় ঘাড়ের রগ থেকেও যিনি আমাদের অধিক নিকটবর্তী (সূরা ক্বাফ : ১৬)। সেই আল্লাহকে সরাসরি না ডেকে, তাঁকে জিকির শোনাবার জন্য, কলবে নূর লাভ করার জন্য ঐ বহুদূরে অবস্থানরত পীরের কলবের ওসিলা দেয়া, যিনি জানেনই না যে মুরীদ কখন তার কলবের ওসিলা দিচ্ছে, কখন জিকির করছে, দু'আ চাচ্ছে (সূরা আহকাফ: ৫), মুরীদের কোন উপকার অপকার করার ক্ষমতা যার নেই (সূরা ইউনুস: ১০৬), যিনি একটা খেজুর খোসার মালিক নন (সূরা ফাতির : ৪১), যদি একটি মাছি তাঁর কিছু চুরি করে তাহলে সব সাঙ্গপাঙ্গ মিলেও ঐ মাছির কাছ থেকে সেটা উদ্ধারের ক্ষমতাও যার নেই (সূরা হজ্জ), আলিমুল গায়েব ও হাজির নাজির হওয়ার তো প্রশ্নই উঠেনা, 'কুল্লু নাফসীন যা-ইকাতুল মাউত' মানুষ হিসেবে যার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি, এরূপ পীরের কলবের ওসিলা দেয়া বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং জিকির করার সময় পীরকে টানবেন না।পীরের কলবের ওসিলা দেবার প্রয়োজন নেই। সরাসরি আল্লাহকে ডাকুন। মাটির নীচের ছোট একটি পিঁপড়ার পায়ের আওয়াজ তিনি শুনতে পান। সুতরাং আপনার আমার জিকিরও তিনি বিনা ওসিলায়ই শুনবেন ও জবাব দিবেন।

মারেফাত ও পীর-মুরীদি সম্পর্কে আকীদা

আজকের যুগ ভেজাল আর ধোকাবাজির যুগ। ভেজাল, ধোকাবাজি আর দুনম্বরিতে সারা দেশ ছেয়ে গেছে। মাছের দোকানে যাবেন মাছ কিনতে। দেখে শুনে শক্ত দেখে টাটকা মাছ কিনলেন। কিন্তু বাড়ি গিয়ে দেখলেন পঁচা মাছ। ওরা বরফ দিয়ে মাছকে শক্ত করেছিল, আর তাজা মাছ কেটে তার রক্ত কানের নিচে লাগিয়ে রেখেছিল। ফলে আপনি ঠকে গেলেন।

চোর যখন দ্যাখে যে তাকে ধরে ফ্যালা হচ্ছে, তখন সেও জনসাধারণের সাথে মিশে 'চোর চোর' বলে চিৎকার করতে থাকে। এতে জনগণ ধোকায় পড়ে যায়। চোরও আর ধরা পড়ে না।

ইসলামের নাম করেও একদল লোক আজ ধোকা দিচ্ছে। মুসল্লী সেজে টুপি পরে মসজিদে এসে জুতো চুরি করছে। জুতো চোরের মাথায় যে টুপি থাকে সেটা সুন্নতি টুপি নয়, জুতো চুরি করার টুপি, ধোকাবাজির টুপি।

ঈমান নিয়েও আজকাল ধোকাবাজি খেলা চলছে। যারা মানুষকে আল্লাহ হারা করতে চায়, তারাও আল্লাহ আল্লাহ বলে চিৎকার করছে। যারা মানুষের ঈমান চুরি করতে চায়, তারাও ঈমানের বুলিই আওড়াচ্ছে। এসব ধোকাবাজদের সম্পর্কে

সকলকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

দুনিয়ায় যেসব জিনিস উৎকৃষ্ট ও উন্নতমানের, মানুষের কাছে সেগুলোর কদরও বেশি। আবার এগুলোর নকলও বেশি হয়। যুগ যুগ ধরে পীর মুরীদের মাধ্যমে তরীকত ও মারেফাতের আমল করে অসংখ্য লোক আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেছে। শয়তান তাই এটা সহ্য করতে না পেরে মারেফাত ও পীরমুরীদিতেও ভেজাল ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আজ সব কিছুতেই ভেজাল। সর্বত্রই ভেজাল ছড়াছড়ি। ভেজাল চাল ডাল খেলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়; ভেজাল নেতার মতে চললে রাষ্ট্র হারাতে হয়। কিন্তু ভেজাল পীরের নির্দেশিত পথে চললে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না, রাষ্ট্র হারাতে হয় না, কিন্তু ঈমান হারা হয়ে কবরে যেতে হয়। সুতরাং সবদিক দেখে-শুনে, যাচাই-বাছাই করে পীর ধরবেন।

সাবধান, একবার ভেজাল ও ধোকাবাজ পীরের খপ্পরে পড়লে আর রক্ষা নেই। আপনাকে ওরা সর্বশান্ড় ও ঈমান হারা করে ছাড়বে। তাই ধোকাবাজ ও ভেজাল পীরদের সম্পর্কে হুশিয়ার থাকবেন।

তরীকত, মারেফাত ও পীর মুরীদির নামে প্রচলিত কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থি কতগুলো কাজের নমুনা

১. তাছাওউরে শায়খ বা পীরের কল্পনা : তাছাওউরে শায়খ বা পীরের চেহারা, আকৃতি ইত্যাদি কল্পনা করে মোরাকাবা করা, ধ্যান করা, জিকির করা বা অন্য যে কোন ইবাদত করা শিরক। যে সব হক্কানী পীর-মুর্শেদ পরিপূর্ণভাবে কুরআন-হাদীস মতে চলেন, তাদের মুরীদদের জন্য পীরকে অনুকরণের উদ্দেশ্যে এরূপ কল্পনা করা জায়েজ হবে যে, তিনি এভাবে খাবার খান, এভাবে সালাত পড়েন, এভাবে কথা বলেন ইত্যাদি।

২. পীর সবকিছু জানেন : অনেক মুরীদের ধারণা-পীর তার গোপন ও প্রকাশ্য সকল কিছুই জানেন। এমনকি মনের কথাও পীর বলে দিতে পারেন। এক কথায় তাদের ধারণা-পীর গায়েব জানেন। তবে এটা পীর বা ওলীর কোন ক্ষমতা নয়। আল্লাহপাক দয়া করে যাকে যতটুকু জানান, তিনি ঠিক ততটুকুই জানতে পারেন।

৩. পীরকে নাজাতদাতা মনে করা : অনেক মুরীদের ধারণা-পীর তাকে জান্নাত পাইয়ে দেবে, চাই সে নিজে আমল কর"ক বা না কর"ক। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ড়। পীরেরই যেখানে মুক্তি পাবার ও জান্নাতী হবার নিশ্চয়তা নেই, সেখানে যে কিভাবে মুক্তিদাতা হয়ে মুরীদকে জান্নাত পাইয়ে দিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে পীর হলেন শিক্ষক বা পথ প্রদর্শক। তিনি মুরীদকে মুক্তির পথ

সিরাতুল মুস্তাকীম দেখিয়ে দেন।

৪. পীরকে হাজের-নাজের জানা : অনেক মুরীদ পীরকে হাজের নাজের মনে করে। পীর তার সব অবস্থা দেখছেন ও জানছেন-এরূপ আকীদা রাখে। কিন্তু এ আকীদা ভ্রান্ত এবং পীরকে হাজের-নাজের জানা সর্বাবস্থায় শিরক। একমাত্র আল্লাহপাকই সদা সর্বদা হাজের ও নাজের।

৫. পীরকে দূর হতে ডাকা : অনেকে স্বীয় পীর বা কোন বুজুর্গ ব্যক্তিকে বহুদূর হতে ডাকে এবং মনে করে যে, তিনি এটা জানতে ও শুনতে পারছেন। অনেক সময় 'ইয়া গাওছুল আজম, ইয়া খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী' ইত্যাদি বলে ডাকতে থাকে এবং নিজেদের ফরিয়াদ ও আরজি পেশ করতে থাকে। এসব কাজ হারাম এবং শিরক।

৬. পীরের জন্য ঘর সাজিয়ে রাখা : কিছু সংখ্যক পীরের অনুসারীদের মধ্যে দেখা যায়, তারা তাদের বাড়ির মধ্যে একটি ঘর পীরের জন্য সারা বছর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। একটা বড় খাটের ওপর চাদর বিছিয়ে বড় বড় কয়েকটা কোল বালিশ দিয়ে 'আসন' তৈরি করা হয়। পীরের ছবিতে মালা পরিয়ে সযত্নে ঐ ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। ফুল ও জরি দিয়ে ঘরটি সুন্দর করে সাজানো হয়। সারা বছর ঐ ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয়া হয় না। মাঝে মাঝে মুরীদ ঐ ঘরে ঢুকে ছবি ও আসনের সামনে আদবের সাথে চুপ করে বসে থাকে। এসব কার্যকলাপ সম্পূর্ণ হারাম।

৭. গায়রুল্লাহর নামে জিকির বা ওযীফা : আল্লাহর জিকিরের ন্যায় কোন পীর, ওলী, বুজুর্গ, আলেমের নাম জপ করা, বিপদে পড়লে পীরের নামের ওযীফা পড়া শিরক। কেননা জিকির করা ইবাদত, ওযীফা পড়া ইবাদত আর গায়রুল্লাহর নামে ইবাদত করা শিরক।

অনেককে দেখা যায়-আল্লাহ আল্লাহ জিকির করছে আর মাঝে মাঝে পীরের নাম, পীরের দরবারের নাম নিয়ে বা আমার হুজুর কেবলাজান বলে হাউমাউ করে কাঁদছে। আবার কেউ কেউ দরুদ শরীফের মোরাকাবা করার সময় নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকতে থাকে ও তাঁর কাছে বিপদমুক্তি, গোনাহ মাফ ও দরজা বুলুন্দির ফরিয়াদ করতে থাকে। এরূপ করা মোটেই জায়েজ নয়।

হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ:) লিখেছেন: কেউ কেউ উঠতে বসতে "ইয়া বাহাউদ্দীন মুশকিল কোশা" এর ওযীফা পাঠ করে আর নিজেকে তার ভক্তগণের মধ্যে গণ্য করে। আর কেউ রুজি রিজিকের জন্য "ইয়া নিজামুদ্দীন আওলিয়া জরজির বখশ" এর ওযীফা পাঠ করে। আবার কোন কোন দল যে কোন কঠিন বিষয়ের জন্যে "ইয়া শায়খ আবদুল কাদের জিলানী শায়আন লিল্লাহ" এর ওযীফা গড়ে নিয়েছে। অতএব সাবধান থাকা চাই। এগুলো তাদের মনগড়া ওযীফা। এ ধরনের কোন ওযীফা তরীকতের ইমামগণ থেকে বর্ণিত নাই। (আল-বালাগুল মুবীন)

৮. পীরের ধ্যানে জিকির : জিকির করার সময় ধ্যান খেয়াল হতে হবে একমাত্র আল্লাহপাকের দিকে। আমি আল্লাহপাকের সামনে হাজির আছি, তিনি আমাকে দেখছেন এই খেয়ালে জিকির করতে হবে। জিকির করার সময় পীর, ওলী, বুজুর্গ, আলেম বা অন্য কারো খেয়াল হৃদয়ে স্থান দেয়া যাবে না। পীরের চেহারাও কল্পনা করা যাবে না। সমস্ত গায়রুল্লাহর চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে কলবকে সরাসরি আল্লাহপাকের দিকে মুতাওয়াজ্জোহ করে জিকির করতে হবে। পীরের কাছ থেকে জিকির করার পদ্ধতি শিখে নিতে হবে; কিন্তু জিকির শুরু হয়ে গেলে আর পীরের খেয়াল আনা যাবে না। পীরের ধ্যানে খেয়ালে জিকির করা হারাম। জিকির শুরুর পূর্বে পীর, দাদা পীর... প্রমুখের কলবের ওসিলা দেয়ার প্রচলিত পদ্ধতি কুরআন-হাদীস সমর্থিত নয়।

৯. গাঁজাখোর জটাধারী পীর : এক শ্রেণীর জটাধারী নিজেদেরকে ফকীর ও পীর নামে জাহের করে, কিন্তু তাদের মাঝে কুরআন ও সুন্নাহর কোন নিদর্শনই খুঁজে পাওয়া যায় না। উস্ক-খুস্ক অর্ধ উলংগ বেশে এরা গাঁজার কল্কী নিয়ে মাজারের পাশে বসে থাকে। এরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নামাজ রোযার ধার ধারে না। এদের অনেককে আবার লম্বা তসবীহ্, বালা, চুড়ি, মালা, আংটি, লালসালু কাপড় ইত্যাদি পরে হিন্দুদের যোগী-সন্ন্যাসীর মত সাজতে দেখা যায়। এসব বাতিল পীর-ফকীররা মুসলমানদের জন্য বিষতুল্য। এদেরকে কঠোর হস্তে দমন করে এদের জঘন্যতম কার্যকলাপ বন্ধ করতে সচেষ্ট হওয়া সকলের জন্য অপরিহার্য।

১০. লম্বা চুলওয়ালা ফকীর : এক শ্রেণীর ফকীর মেয়েদের মত লম্বা চুল রাখে। এরূপ লম্বা চুল রাখা হারাম। তবে সুন্নতী বাবরী চুল রাখা যেতে পারে।

১১. নিরামিষ ভোজী ফকীর : অনেক ভণ্ড ফকীরের ধারণা মাছ গোশত খেলে ফকীরি চলে যায় বা হাসেল হয় না। তাই তারা সব সময় নিরামিষ খায়। তারা তরীকতপন্থীর জন্য গরু না খাওয়াকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে। এসব আকীদা বাতিল ও ভ্রান্ত।

১২. স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ত্যাগ ও বৈরাগ্য : একদল পীর ৪০ বছর বয়সের পর স্ত্রীর সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দেয় এবং এটাকে কামালতের লক্ষণ বলে মনে করে। মুরীদদেরও তারা একাজে উদ্বুদ্ধ করে। এটা সুন্নতে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্পষ্ট বরখেলাপ।

১৩. পীরকে বাবা বলা : অনেকে পীরকে 'বাবা', 'বাবাজান হুজুর', 'দয়াল বাবা', 'খাজা বাবা' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে। কিন্তু এভাবে পীরকে সম্বোধন করা ঠিক নয়। 'হুজুর', 'পীর সাহেব হুজুর' বলা যেতে পারে। পীরকে 'কেবলাহ' বলা উচিত নয়।

১৪. খালি পায়ে পীরের বাড়িতে : কারো কারো ধারণা-পীরের গ্রামে বা পীরের বাড়ির বাউন্ডারীর মধ্যে জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটা নাজায়েজ। তাই তারা পীরের বাড়ির বাউন্ডারীর মধ্যে প্রবেশের আগেই জুতো খুলে নেয়। যেখানে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শহর মদীনা শরীফে জুতো পরে যাওয়া জায়েজ, সেখানে পীরের বাড়িতে জুতো পরে যাওয়া কিভাবে নাজায়েজ হতে পারে? সুতরাং এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা।

১৫. কামেল পীরের কী গোনাহ নাই? : অনেকে বলে যে, কামেল পীর কোন পাপ করলেও তার গোনাহ হয় না। তারা বলে বেড়ায়-খোদাও পাক, কামেল পীরও পাক। সুতরাং তাদের কোন গোনাহ নাই। এরূপ আকীদা বাতিল। নবী (আ:) ছাড়া কেউ মাসুম বা বেগুনাহ নয়। তবে আল্লাহর মকবুল বান্দারা বেশী পরিমাণে তওবা করার কারণে আল্লাহপাক তাদের গোনাহ ক্ষমা করে দেন।

১৬. মসজিদে পীরের জন্য খাছ জায়গা : অনেক জায়গায় দেখা যায়-মসজিদে পীরের জন্য খাছ জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা হয় এবং সেখানে অন্য কাউকেও দাঁড়াতে দেয়া হয় না। এরূপ করা জায়েজ নয়।

১৭. পীরের দরবারে নারী সমাবেশ : পীর নামধারী কিছু সংখ্যক লোকের দরবারে বেপর্দা নারীরা অবাধে যাতায়াত করে। কেউ কেউ আবার নারীদের খেদমতও গ্রহণ করে। তারা এই বলে তাদের মহিলা মুরীদদের বেপর্দা হতে উদ্বুদ্ধ করে যে, আমরা হাশরের ময়দানে তোমাদের জান্নাতে নিয়ে যাবো। এখন যদি তোমাদের চেহারা-ছুরত দেখে না নেই, তবে হাশরের দিন কিভাবে চিনে তোমাদের জান্নাতে নিব? বস্তুত তাদের এই সমস্ত আকীদা ও কার্যকলাপ সম্পূর্ণ হারাম এবং ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী।

পর্দা প্রথাকে ইসলাম ফরজ করেছে। নির্ধারিত মুহাররম ব্যক্তিবর্গের বাইরে আপন চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাই, পীর সাহেব, ওস্তাদ, এমনকি স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনেও বেপর্দা অবস্থায় যাতায়াত করা মহিলাদের জন্যে হারাম। এমতাবস্থায় পীরের সাথে দেখা করা কিভাবে জায়েজ হতে পারে?

১৮. কাওয়ালী, মারফতী, মুর্শিদী : আজকাল অনেক পীর সাহেবের

দরবারে দেখা যায়– কাওয়ালী, সামা, মারফতী, মুর্শিদী, গজল ইত্যাদি মন ভুলানো নাম দিয়ে বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান-বাজনার আসর বসে। হারমোনিয়াম, তবলা, গিটার, দোতারা ইত্যাদি নিয়ে কোন পুরুষ বা মহিলা 'বয়াতি' (গায়ক) গান গায়, আর নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবাই তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে। কেউ কেউ আবার গান শুনতে শুনতে নাকি মারেফাতের এমন এক স্তরে পৌঁছে যায় যে, নাচ ও লাফালাফি শুরু করে দেয়! গানের সুরে ঢোলের আওয়াজে শ্রোতাদের মনে নাকি আল্লাহর এশকের আগুন জলে উঠে! তাই তারা আল্লাহর এশকে মাতোয়ারা হয়ে গাঁজার কল্কি নিয়ে বুদ হয়ে থাকে! এসব বাতিল আকীদায় বিশ্বাস করা ও এগুলোর উপর আমল করা হারাম। কেউ হালাল জেনে করলে কাফের হবে।

ইসলামের ফতোয়া হলো– গান শুনে আনন্দ অনুভব করা কুফরী। বাদ্যযন্ত্র সহকারে সকল প্রকার গান-বাজনা হারাম। যে ব্যক্তি হারামকে হালাল জেনে গান শুনবে, আনন্দ অনুভব করবে ও হাততালি দিবে, সে কাফের হয়ে যাবে। "দুনিয়াতে যারা গায়ক-বাদক হবে কেয়ামতের দিন তাদের চেহারা শুকর ও বাদরের মতো হয়ে যাবে।" (বুখারী)

১৯. জিকিরের সময় নর্তন কুর্দন : কিছু সংখ্যক তরকিতপন্থী জিকির-আজকার ও মুরাকাবা-মুশাহাদার সময় জোরে জোরে মাথা নাড়ায়, শরীর এদিক-ওদিক হেলায়, মাঝে মাঝে কেঁপে উঠে; নাচানাচি, লাফালাফি ও চিল্লাচিল্লি করে, কখনওবা অজ্ঞান হওয়ার ভান করে। ইচ্ছাকৃতভাবে এসব করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এরূপ হলে সেটা ভিন্ন কথা। তাছাড়া মেয়ে পুরুষ একত্রে বসে জিকির করাও হারাম।

২০. পীরের পা চাটা : নেক মকসুদ পূরণের জন্য, রোগমুক্তির নিয়তে পীরের পা চাটা, গাড়ি চাটা, ব্যবহার্য থালাবাটি বা অন্য কোন বস্তু চাটা, মাজার চাটা ইত্যাদি সম্পূর্ণ নাজায়েজ।

২১. গারান্টি দিয়ে কলব জারী : আজকাল একদল পীর বলে বেড়াচ্ছে, আমার কাছে মুরীদ হওয়া মাত্র কলব জারী করে দেব। তাদের কাছে মুরীদ হওয়ার পর তারা মুরীদের কলবের উপর আঙ্গুল রাখে বা চোখ বন্ধ করে ফায়েজ দেয় অথবা কলবে ফুঁ দেয়। এতেই কিছুক্ষন পর বুকের গোশ্ত লাফাতে থাকে, ফলে মুরীদ ধারণা করে নেয় যে, তার কলব জারী হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা কলব জারীর লক্ষণ নয়, বরং ভন্ডামী। যখন মুরীদের হাক্বিকতে তওবা নছীব হবে অর্থাৎ মুরীদের দ্বারা আর গোনাহের কাজ হবে না, কখনো হলেও সাথে সাথে তওবা করে নেবে, এমতাবস্থায় কলব নড়ুক বা স্থির থাক, যে কোন অবস্থায়

বুঝতে হবে-মুরীদের কলব জিন্দা হয়ে গেছে।

২২. আল্লাহর জাতের সাথে মিশে যাওয়া : অনেকের ধারণা-মুরীদ যখন 'ফানাফিল্লাহ' পর্যায়ে পৌঁছে, তখন সে আল্লাহর জাতের সাথে মিশে বিলীন হয়ে যায় এবং তাঁর পৃথক কোন অস্ড়িত্ব থাকে না। তার খাওয়া, ঘুম, স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি যাবতীয় কাজকর্ম তখন আর নিজস্ব থাকে না– এগুলো সব আল্লাহর হয়ে যায় অর্থাৎ এসব কাজ তার ছুরতে আল্লাহই করেন। (নাউযুবিল্লাহ)

এটা জঘন্য ঈমান বিধ্বংসী আকীদা। শুধু কামেল পীর কেন, আল্লাহতায়ালার কোন মাখলুকই, এমনকি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আল্লাহপাকের সাথে এবং তাঁর পাক ছেফাতের, যেমন-কুদ্দছির ছেফাত ইত্যাদির সাথে মিশবেন না, এক বা সমকক্ষও হতে পারবেন না। সূরা ইখলাস ও তাফসীরে রুহুল বয়ানে এর প্রকাশ্য প্রমাণ মওজুদ আছে। এরূপ ধারণা করলে মোশরেক হবে। (মিয়াতে মাছায়েল ও তাফসীরে ফওজুল করীম দ্রঃ)

২৩. আল্লাহ যা করান, তাই করি : আজকাল একদল ফকীর বেরিয়েছে, তারা বলে 'আল্লাহ যা করান, তাই করি। আল্লাহ নামাজ পড়ান না, তাই পড়িনা, আল্লাহ গাঁজা টানাচ্ছেন, তাই টানছি। তাকদীরে নামাজ পড়া থাকলে তো পড়বো।' এ সবই উদ্ভট ধারণা ও চিন্তা।

২৪. দেলে দেলে নামাজ পড়ি : একদল পীর বেরিয়েছে, যারা নামাজ রোজার ধার ধারে না; কিন্তু খুব সাধনা করে! দু'তিন দিন পর একটু খায়। কম কথা বলে। লোকজনের সাথে কম মিশে। দিনের বেশিরভাগ সময় চুপ করে ধ্যান মগ্ন অবস্থায় বসে থাকে। এরা বলে বেড়ায় আমরা দেলে দেলে নামাজ পড়ি। তোমরা মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত পড়, আর আমরা সারা দিন রাতই নামাজ পড়ি। এমন কথা যারা বলে তাদেরকে এভাবে শিক্ষা দেয়া দরকার যে, একটা বন্ধ ঘরে দড়ি দিয়ে বেঁধে আটকে রাখুন। যদি বলে 'পিপাসা লেগেছে', ওদের বলুন, 'দেলে দেলে পানি পান কর'। যদি বলে 'ক্ষিধে পেয়েছে', ওদের বলুন, 'দেলে দেলে খাবার খাও'। ওরা যদি উত্তরে বলে, 'দেলে দেলে কি পান করা যায়? 'দেলে দেলে কি খাওয়া যায়?' আপনিও তখন ওদেরকে আপনার চূড়ান্ড় ফায়ছালা শুনিয়ে দিন, 'দেলে দেলে যখন পান করা যায় না, খাওয়া যায় না, দুনিয়ার কোন কাজ যখন দেলে দেলে হয় না, নামাজটা কিভাবে দেলে দেলে হয়!' এভাবেই তাদের ভ্রান্ত কথার উত্তর দেয়া যেতে পারে।

২৫. ছিনায় ছিনায় মারফতী : পীর বা দরবেশ দাবীদার একদল বলে বেড়ায়, 'কুরআন শরীফ মোট ৪০ পারা। ৩০ পারায় জাহেরী এলমের বিষয় আছে। বাকি ১০ পারা মারফতী বিদ্যায় ভরা রয়েছে। এই ১০ পারা আমরা ছিনায়

ছিনায় পেয়েছি। শরীয়তের আলেমরা এগুলোর খবরও রাখে না। সুতরাং ত্রিশ পারা কুরআনকে আমরা মানতে পারি না। আমরা নিজ চক্ষে আল্লাহকে দেখে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ছিনায় ছিনায় নামাজ-রোজা করে থাকি। সুতরাং না দেখে অন্ধের মতো খোদার জাহেরা নামাজ রোজা আমরা মৌলবাদীদের কথায় পড়তে পারি না'।

তারা আরো বলে বেড়ায়, 'আল্লাহপাক মেরাজের রাতে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে যেসব কথা বলেছেন, তার মধ্য থেকে কিছু কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহের করে বলেছেন এবং বাকিটা গোপন করে গেছেন। যেই অংশটা তিনি গোপন রেখেছিলেন সেটাই আমরা ছিনায় ছিনায় পেয়েছি।' এসব মারফতী ফকীরেরা মিথ্যাবাদী ও ভন্ড। তাদের থেকে সবাইকে হুশিয়ার হতে হবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালাতের কোন অংশ গোপন করেছেন, এটা হতেই পারে না। কারণ, আল্লাহতা'আলা বলেছেন–

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ

হে রাসূল! আপনার রব এর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়, তা আপনি (মানব ও জ্বিন জাতিকে) পৌঁছিয়ে দেবেন। আর যদি তা না করেন, তবে আপনি রিসালাত পৌঁছালেন না। (সূরা মায়েদা : ৬৭)

তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে উল্লেখ করা হয়েছে– এখানে আল্লাহর কিতাবের বাইরে এমন কিছু গোপন ইলম রয়েছে, যা সুফীরা সরাসরি তাদের পালনকর্তা আল্লাহ থেকে যে কোনভাবে হোক শিখে থাকে–এ ভ্রান্ড় ধারণা যে ব্যক্তি পোষণ করল, সে আসলে জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আর খোদায়ী পথ থেকে সরে যাওয়ার ভ্রান্ড়পথ অবলম্বন করেছে। রিসালাত পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ সম্বলিত কুরআনিক বক্তব্য প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কল্যাণে যা নাযিল করা হয়েছে, তার কোনকিছুই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপন করেননি।

২৬. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন– আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দু'পাত্র অর্থাৎ দু'ধরনের ইলম কণ্ঠস্থ করে রেখেছি। এ থেকে এক ধরনের ইলম আমি সবার জন্য বিস্ড়রিতভাবে বর্ণনা করেছি, আরেক ধরনের ইলম আমি এজন্য গোপন করে যাচ্ছি যে, আমি যদি তা ব্যক্ত করতাম, তবে আমার গলা কেটে দেয়া হত।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) যা গোপন করতে বাধ্য ছিলেন তা হলো সমাজের

ফিৎনা-ফাসাদ সম্পর্কীয় কথা, অর্থাৎ, সমাজে কারা কারা ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করবে, তাদের বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন। তা বলতে গেলে ফাসাদ আরো প্রচন্ড রূপ ধারণ করবে, তাঁরও গলা কাটা যেতে পারে। এটা মা'রিফাতের কল্যাণমূলক ইলম নয়; নতুবা তিনি গলা কাটার কথা বলতেন না। তবে হ্যাঁ, এর কল্যাণমূলক একটি দিক রয়েছে। আর তা হলো, মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ ফিৎনা-ফাসাদের সময় ক্ষেত্র বিশেষে নীরব থাকাই ভাল।

২৭. হযরত আলী (রা:) সম্পর্কিত হাদীস : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাগণের সকলেই মর্যাদাবান। হযরত আলী (রা:) খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে চতুর্থ খলীফা। তিনি অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে শিয়াদের ধারণা ভ্রান্ত। সাইয়্যিদিনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:), হযরত উমর ফারুক (রা:) ও হযরত উসমান গনী (রা:) মর্যাদার দিক থেকে কিছুতেই হযরত আলী (রা:) এর চেয়ে মোটেই কম নন। শিয়ারা এ তিনজন খলীফাকে কটুক্তির মুখে ঠেলে দিয়ে বলেছে যে, এ তিনজন খলীফা মা'রিফাতের অধিকারী নয়। মা'রিফাতের গোপন ইলম হযরত আলী (রা:) কে দেয়া হয়েছে; এটা অন্য কেউ পায়নি। শিয়াদের এ দাবী সম্পূর্ণ বাতিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরী'আতের ইলম থেকে মা'রিফাতের ইলমকে পৃথক করেছেন–এ কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন ও সুন্নাহর ইলম তথা ইসলামী শরী'আতের ইলম সবার সামনে সমানভাবে প্রকাশ করেছেন। বর্ণিত আছে– 'আমি জ্ঞানের শহর, আর হযরত আলী (রা:) হলেন সে শহরের দরজা।'

উপরোক্ত হাদীসটি সনদের দিক থেকে মুহাদ্দিসগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এ হাদীসটি শি'য়াদের পক্ষপাতিত্বের ত্রুটিতে ত্রুটিপূর্ণ। উল্লেখিত 'হাদীস' নামে প্রচলিত কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জবান থেকে উচ্চারিত হয়েছে বলে সঠিক সূত্রে প্রমাণিত নয়। আসলে সাহাবীগণের সকলেই ইলমে নব্বীর দরজা।

ইসলামী শরী'আতের সার্বিক ব্যবস্থা হলো একসাথে শরী'আত ও মা'রিফাত। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে উম্মতের কল্যাণের সব ব্যবস্থাই সমানভাবে প্রকাশ করে গেছেন। এটাই হলো তাঁর রাহমাতুল্লিল আলামীন হওয়ার সার্থকতা। কারণ, শরী'আত–ই হলো আসল রহমত। আর তিনি শরী'আত ও মা'রিফাতের কোন কথাই গোপন করেন নাই।

২৮. আল্লাহপাক ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর

চাইতেও কি পীরের মর্যাদা বেশী : কিছু পীরের মুরীদ আছে যারা কুরআন সুন্নাহর ধার ধারে না। কুরআনের উক্তির চাইতে পীরের কথা এদের কাছে অধিক মূল্যবান। যদি বলা হয় কুরআন এরূপ বলছে, হাদীসে এরূপ আছে তখন তারা এর প্রতিবাদ করে বলে, "কিন্তু আমার পীর সাহেব হুজুর তো বলেছেন তার উল্টো, সুতরাং পীরের কথার বাইরে আমি চলতে পারবো না। উনি কি কুরআন-হাদীস কম বুঝেন নাকি?" এরূপ বক্তব্যের কারণে এসব পীর পূজারীদের ঈমান বরবাদ হয়ে যাবে কেননা তারা কুরআন-হাদীসের বক্তব্যের উপর পীরের কথাকে প্রাধান্য দিয়েছে।

বর্তমানে আমরা যারা হাক্কানী পীরের মুরীদ আছি তাদের মাঝেও একটি রোগ খুব প্রকট আকার ধারণ করেছে আর তা হলো আমাদের অধিকাংশরই ধারণা আমার পীর কোন ভুল করতে পারেন না। আমরা কুরআন হাদীসের হুকুম আহকামগুলো পীরের কথার সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে গ্রহণ করি অর্থাৎ পীরের কথা যদি কুরআন হাদীসের সাথে মিলে যায় তবে সেটা গ্রহণ করি আর পীরের কথা যদি কুরআন-হাদীসের বিপরীত হয় তবে পীরের কথাকেই অগ্রাধিকার দেই আর ভাবি আমার পীর কি ভুল করতে পারেন? তিনি কুরআন হাদীস অনেক বেশী বুঝেন।' এভাবে আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে প্রতারিত করেছি।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের পীর সাহেবও মানুষ। তাঁরও ভুল ভ্রান্তি হতে পারে। তাঁর সব কথা ও কাজই শরিয়তের দলিল হতে পারে না। তাঁর কথা ও কাজকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে। তাঁর যেসব কথা ও কাজ কুরআন সুন্নাহ সম্মত সেগুলো আমরা মেনে চলব আর খোদা না করুন কখনও যদি তাঁর কোন কথা ও কাজ কুরআন সুন্নাহর বিপরীত হয়, তবে সেক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করে কুরআন-সুন্নাহকেই অগ্রাধিকার দেয়া ঈমানী দায়িত্ব। সেই সাথে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়া মুরীদের জন্য অপরিহার্য যে, 'আপনার অমুক কথা বা কাজ কুরআন সুন্নাহর বিপরীত হয়েছে।' সত্যিকার হাক্কানী পীর হলে সাথে সাথে নিজের কথা বা কাজ শুধরে নেবেন। যদি তিনি সংশোধিত না হন তবে তিনি পীর নামের অযোগ্য।

আমাদের মনে রাখা দরকার-পীর হলেন শিক্ষক বা পথ প্রদর্শক। তিনি আল্লাহ্কে পাইয়ে দিতে পারেন না, বরং আল্লাহওয়ালা হওয়ার পথ দেখাতে পারেন। হেদায়েতের একমাত্র মালিক আল্লাহপাক। আমাদের মাকসুদ পীরের হওয়া নয়, আল্লাহর হওয়া; পীরের পূজা নয় বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের নিরিখে আল্লাহর ইবাদত।

২৯. শরীয়তের ইত্তেবা সর্বাবস্থায় ফরজ : একদল লোকের ধারণা-মুরীদ

যখন মারেফাতের উচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়, তখন তার জন্য শরীয়তের হুকুম-আহকাম, নামাজ-রোজা ইত্যাদি মাফ হয়ে যায়। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ড় ধারণা। মানুষ আল্লাহর যতই প্রিয়পাত্র হোক না কেন, যত বড় ওলীই হোক না কেন, যতক্ষণ তার অনুভূতি ও জ্ঞান ঠিক থাকবে, শরীয়তের হুকুম-আহকাম তাকে মেনে চলতেই হবে। এবং এটাই তার জন্য ফরজ। নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদত কখনও মাফ হয় না। গুনাহের কোন বিষয়ই তার জন্য বৈধ হয়ে যায় না। সম্পূর্ণ মাসুম হওয়া সত্ত্বেও যেখানে হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোরভাবে শরীয়তের হুকুম আহকাম পালন করে গিয়েছেন, সেখানে ঐ ওলীরা কি তাঁর চেয়েও বড় হয়ে গেল যে, তাদের জন্য নামাজ-রোজা মাফ হয়ে যাবে?

৩০. আল্লাহপাক কি শুধু বাতেনী অবস্থা দেখবেন? : অনেক ভ ফকীর বলে বেড়ায়-আল্লাহপাক জাহেরী দেখবেন না, শুধু বাতেনী দেখবেন। এরূপ কথা মোটেই ঠিক নয়। আল্লাহপাক জাহেরী ও বাতেনী উভয়ই দেখবেন। যারা এর বিপরীত আকীদা রাখবে তারা কঠিন গোনাহগার হবে।

৩১. পীরের বাড়ির খাদেম, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির প্রতি অন্ধ সম্মান বিষয়ে আকীদা : অনেককে দেখা যায়–পীরের বা মাজারের খাদেম, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদিকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে যায়। এগুলোর সামনে মুর্তিবৎ দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকে আবার এসব কুকুর বিড়ালের পা ধরে বসে থাকে নেক মকছুদ পুরণের জন্য। এ ধরনের আচার আচরণ সম্পূর্ণ নাজায়েজ।

৩২. পীরওলীদের তাবারুক বা স্মৃতিচিহ্নের তাজীম করা সম্পর্কে আকীদা

(১) পীরওলী বা কোনো নেককার মানুষের স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্য বা স্থানকে স্বাভাবিক সম্মান দেখানো শিরক নয়। তবে যখন মানুষ উক্ত স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্য বা স্থানকে বরকতের উৎস বলে মনে করে, তার সামনে চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে, উক্ত দ্রব্য বা দ্রব্যের মালিকের আত্মা থেকে কোনো নেক নজর আশা করে বা এমন তাজীম করে যে তা' শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। পীর হয় তো কোন গাছের নীচে বসতেন, বিশ্রাম করতেন বা তায়াম্মুমের জন্যে কোন পাথর ব্যবহার করতেন। পীরের ইন্ড়েকালের পর মুরীদরা এ গাছ বা পাথরের গোড়ায় আগরবাতি, মোমবাতি, ধূপ ইত্যাদি জ্বালায়, মিলাদ পড়ায়, বিপদমুক্তির জন্য ফরিয়াদ জানায়। তাছাড়া কুমির, কচ্ছপ, আবার কোন কোন জায়গায় গজার মাছ, জালালী কবুতর ইত্যাদি পীর ওলীদের স্মৃতি বহন করছে বলে মানুষের বিশ্বাস। অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষেরা মাজারের খাদেমদের খপ্পরে পড়ে এসব কচ্ছপ, গজার মাছ, কুমীর, জালালী কবুতর ইত্যাদিকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনে করে

এদের জন্য বিভিন্ন খাদ্যবস্তু নিয়ে যায় এবং এদের কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানায়। ফলে তারা অমূল্য সম্পদ ঈমান হারিয়ে বেঈমান হয়ে যায়।

(২) ওদিকে খাদেমরা ছলে বলে এসব অসহায় মানুষদের কাছ থেকে নজর-সিন্নি নামে তাদের টাকা কড়িও একরকম কেড়ে নেয়। কোন কোন মাজারে অজ্ঞ অশিক্ষিত মা বোনদের বুঝানো হয়... মাজারে কম টাকা দিলে মেয়ে হবে, বেশি টাকা দিলে ছেলে হবে, এই গাছটায় যতবড় পাথর বাঁধা হবে তত বড় বাচ্চা হবে ইত্যাদি। অনেকে মাজারের গিলাফকে তাবারর ক হিসেবে নেক মকছুদ পূরণের নিয়তে সংরক্ষণ করে, মাথায় করে তাজীমের সাথে দাঁড়িয়ে থাকে, গিলাফের টুকরা মাদুলীতে ভরে গলায় বাঁধে। এগুলো সবই হারাম।

(৩) অনেকের ধারণা-নিজের আমল যাই হোক না কেন, কুরআন-হাদীস মত চলুক আর না চলুক-মৃত্যুর পর কবরে যদি পীরের কিছু স্মৃতিচিহ্ন বা তাবার ক যেমন-শাজরা, জামা, পাগড়ী, টুপি জায়নামাজ, তসবিহ, লুঙ্গী বা অন্য কোন পবিত্র বস্তু তাঁর মৃতদেহের সাথে রাখা হয় তবে সে নাজাত পেয়ে যাবে। এরূপ ধারণা ঠিক নয়।

(৪) 'যাতে আনওয়াত' বৃক্ষের ঘটনা : জাহিলিয়াতের যুগে 'যাতে আনওয়াত' নামক একটি বৃক্ষ ছিল, সেখানে কুরাইশ ও সমস্ড় আরব প্রতি বছর একবার একত্রিত হত এবং তাদের তরবারি সেই বৃক্ষের সাথে ঝুলিয়ে দিত, তারই নিকটে জন্তু জবাই করত এবং একদিন তথায় সকলেই অবস্থান করত।

মক্কা বিজয়ের পর মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমান ও মদীনা থেকে আগত সাহাবী সমভিব্যাহারে নবী করীম সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনায়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সেই বৃক্ষটি দেখতে পেয়েই মক্কার নবদীক্ষিত মুসলিমগণ পার্শ্ব থেকে বলে উঠল: হে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের জন্যও একটি 'যাতে আনওয়াত' বানিয়ে দিন, যেমন ওদের জন্য 'যাতে আনওয়াত' রয়েছে। এই কথা শুনেই নবী করিম সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আল্লাহু আকবর... তোমরা তো সেই রকমের কথা বলছ, যেমন মূসার সঙ্গীরা বলেছিল: 'ওদের যেমন পূজার দেবতা রয়েছে আমাদের জন্যও অনুরূপ দেবতা বানিয়ে দাও হে মূসা'। অর্থাৎ ওদের এই কথা যেমন ইসলামের তাওহীদী আকীদার পরিপন্থী ছিল, আজকের তোমাদের এই কথাও তেমনি তাওহীদী ঈমানের বিপরীত। কেননা ওদের কথার মত এদের কথাও মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। ফলে তা একটি অতি বড় শিরকী কথা। ওদের মত 'যাতে আনওয়াত' বানিয়ে তার সাথে তরবারি ঝুলান, তার নিকট জন্তু জবাই করা এবং একটা দিন তার নিকট অবস্থান করা এক আল্লাহর সাথে আর একজন ইলাহ

বানানোর সমতুল্য গণ্য হওয়ায় রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওদের কথা প্রত্যাখ্যান করলেন। (তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জরীর ও ইবনে ইসহাকের সীরাতুন্নবী) এ ঘটনা থেকে বুঝা যাচ্ছে– একালের মুসলিমরা যে পীর ওলীর কবরের নিকট অবস্থান করছে, তাকে ডাকছে এবং তার কাছে দু'আ চাচ্ছে, তা পরিষ্কার শিরক ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

(৫) এই দুইটি কাজের মধ্যে শিরক হওয়ার দিক দিয়ে পূর্ণ মিল রয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ইমাম মালিকের ছাত্র আবু বকর তাতুশী লোকজনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা যেখানেই এরূপ কোন বৃক্ষ দেখতে পাবে, যাকে কেন্দ্র করে জনতা একত্রিত হয়, বৃক্ষটির প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, রোগ ও বিপদ মুক্তি চায়, তার নিকট বৃক্ষটিকে কেন্দ্র করে ওরশ করে– সেই বৃক্ষটিকে অবিলম্বে কেটে ফেলবে এবং শিরকের এই রূপ আড্ডাখানা ভেঙ্গে নির্মূল করে ফেলবে।

(مختصرة الرسول صلى الله عليه وسلم, ص : ٣١٥)

(৬) হুদায়বিয়ার ছামুরা বৃক্ষ : এখানে হুদায়বিয়ার ছামুরা বৃক্ষটির ঘটনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হুদায়বিয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবাগণ থেকে জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। বাইয়াতের সময় তিনি যে বৃক্ষটির নিচে বসেছিলেন, সে বৃক্ষটির নাম ছিল ছামুরা। হুদায়বিয়ার বাইয়াত সম্পর্কিত ঘটনাটি কুরআন মাজীদের ২৬ পারায়-সূরা-ই-ফাত্‌হে উল্লেখ করা হয়েছে। তাফ্‌সীরে রূহুল মা'আনিতে বৃক্ষটি সম্পর্কে আলোচনা এসেছে–

وَ الْمَشْهُوْرُ اَن النَّاسَ كَانُوْا يَأْتُوْنَهَا فَيُصَلُّوْنَ عِنْدَهَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُمَرُ ؓ فَاَمَرَ بِقَطْعِهَا خَشْيَةِ الْفِتْنَةِ بِهَا

এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ বর্ণনা রয়েছে যে, মানুষ সে ছামুরা বৃক্ষটির নিকট আসতো এবং সে গাছটির নিকট নামাজ পড়তো। পরবর্তী সময় হযরত উমর (রা:) এর মত বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকট যখন এ খবর পৌঁছল, তখন গাছটিকে কেন্দ্র করে শিরক ও বিদ'আত এর প্রচলন ঘটতে পারে, এ ভয়ে হযরত উমর (রা:) গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ জারী করলেন। হযরত উমর (রা:) ও অন্যান্য সাহাবীগণ শিরক ও বিদআত থেকে কতই না সাবধান ছিলেন তা এ বৃক্ষটির ঘটনা থেকে বোঝা যায়। আজ কদম রাসূল, কদম মোবারক, না'লাইন শরীফাইন, জুতা মোবারক, কেশ মোবারক, পাগলের দরগাহ, ঢোলের দরগাহ ও তবলার মাজার ইত্যাদি নামে যেসব শয়তানী চলছে উক্ত সামুরা বৃক্ষের ঘটনার নিরিখে এ

শব্দগুলোর ভিত্তিহীনতা ও অনর্থকতা বুঝে নিতে পারলেই মুসলমানদের কল্যাণ।

সমাজে প্রচলিত ঈমান-বিধ্বংসী আরো কিছু শিরক-কুফর

১. বিশ্ব প্রতিপালনে শরীক করা বা রুবুবিয়্যাতের শিরক : আল-হ্ ছাড়া অন্য কেউ এই বিশ্বের প্রতিপালন বা পরিচালনায় শরীক আছেন বলে বিশ্বাস করা শিরক। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টি, পরিচালনা, অদৃশ্য জ্ঞান, অদৃশ্য সাহায্য, রিযিক দান, জীবন দান, সুস্থতা বা রোগব্যধি দান, বৃষ্টি দান, বরকত দান, অনাবৃষ্টি প্রদান, অমঙ্গল প্রদান ইত্যাদি কোনো প্রকার কল্যাণ বা অকল্যাণের কোনো প্রকার ক্ষমতা রাখেন বা আল-হ্ কাউকে অনুরূপ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন বলে বিশ্বাস করা শিরক।

মহান আল-হ ছাড়া অন্য কেউ জাগতিক উপকরণাদি ছাড়া নিজের ইচ্ছায় অলৌকিকভাবে কারো মঙ্গল-অমঙ্গল করতে পারে, হেদায়াত বা পথভ্রষ্ট করতে পারে, বিপদ দান করতে বা দূর করতে পারে, বৃষ্টি দিতে বা বন্ধ করতে পারে, জান্নাতে বা জাহান্নামে নিতে বা বের করতে পারে, জীবন, মৃত্যু, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, সুস্থতা, অসুস্থতা, রিয্‌ক ইত্যাদি বিষয়ে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা হলো আল-হ্‌র র‍ুবুবিয়্যাতের শিরক।

২. আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর শিরক : মহান আল্লাহ্‌র পূর্ণতার গুণাবলি ও মহাসম্মানিত পবিত্র নামসমূহ রয়েছে। এসকল গুণ বা নামের ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করা এ পর্যায়ের শিরক। মহান আল্লাহ্‌কে কোনোভাবে মানুষ বা সৃষ্টির সাথে তুলনা করা অথবা মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে কোনোভাবে মহান আল্লাহ্‌র সাথে তুলনীয় মনে করা এ পর্যায়ের শিরক।

৩. আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কারো সন্তুষ্টি কামনা বা সম্মান প্রদর্শন : আল্লাহ্‌র জন্য কোন ইবাদত করে সেই ইবাদত দ্বারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কারো সন্তুষ্টি কামনা বা সম্মান প্রদর্শনও শিরক। যেমন আল্লাহ্‌র জন্য সিজদা করা, তবে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে সামনে রেখে সিজদা করা, যেন আল্লাহ্‌র সিজদার সাথে সাথে তাকেও সম্মান করা হয়ে যায়। অথবা আল্লাহ্‌র জন্য মানত করা, অথবা নির্দিষ্ট কোন জীবিত বা মৃত ওলী, ফিরিশতা, জিন বা কারো স্মৃতি বিজড়িত স্থান, কবর, মাজার, পাথর, গাছ ইত্যাদিকে মানতের সাথে সংযুক্তি করা, যেন মানতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে সাথে উক্ত উপাস্যেরও সম্মান প্রদর্শন করা হয় বা

তার করুণা লাভ করা যায়।

৪. আল্লাহ ছাড়া কারো প্রশ্নাতীত আনুগত্য করা : আল্লাহ ছাড়া কারো চূড়ান্ড় ও প্রশ্নাতীত আনুগত্য করা শিরক। যদি কেউ মনে করেন যে, পোপ, পাদরি, পীর, গুরু, সাঁই বাবা, খাজা বাবা, পিতামাতা বা অন্য কেউ যদি কোনো পাপের নির্দেশ দেয় তবে কাজটি শরীয়তে পাপ হলেও আমার জন্য তা জায়েজ হয়ে যাবে, অথবা এরূপ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নির্দেশ দেন তবে শরীয়ত বিচার না করে তা পালন করা জরুরী হবে, তিনি কোনো কিছুকে বৈধ বললে তা বৈধ হয়ে যাবে, তিনি যদি বলেন এখন থেকে তোমার আর অমুক ফরয ইবাদত করা লাগবে না, তাহলে আমার জন্য উক্ত ইবাদতটি অনাবশ্যক হয়ে যাবে... তাহলে নি:সন্দেহে তা আনুগত্যের শিরক বলে গণ্য হবে।

৫. আল্লাহ ছাড়া কাউকে অলৌকিক ভয়, আশা ও ভালোবাসা শিরক : কোনো পীর, ওলী, বুজুর্গ ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস রাখা শিরক যে, এ ব্যক্তির হাতে আমাদের কোনো অলৌকিক কল্যাণ বা অকল্যাণের সকল বা কিছু ক্ষমতা আছে। একে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন অথবা তার একটি বিশেষ অধিকার রয়েছে, যাতে তার সুপারিশ তিনি ফেলতে পারবেন না। তাঁকে সম্মান ও ভক্তি করে ও ভালবেসে তাঁর একটি সুনজর লাভ করতে পারলেই তাঁর অলৌকিক প্রভাবে আমার বিপদ কেটে যাবে বা রোগ সেরে যাবে। আমি নেককাজ করি বা না-করি তাঁকে ভক্তি করলে ও ভালোবাসলে তিনি আমাকে উদ্ধার করবেন ও পরকালে আমার কান্ডারী হবেন। কাজেই যেভাবে পারি, হাতে ধরে, পায়ে ধরে কোনোভাবে তাকে খুশি করতে পারলেই আমার উদ্দেশ্য হাসিল হবে। এরূপ বিশ্বাস রাখা শিরক। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনো প্রকারের উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই।

৬. আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞাপক বাক্য বলা : এ পর্যায়ের শিরক আসগারের প্রকৃতি এই যে, জাগতিক বা বিশ্বাসগত কোনো প্রকৃত 'কারণ'-কে মহান আল্লাহর পাশাপাশি এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে উভয় 'কারণ' সমান গুরুত্বের বলে মনে হয়। যেমন বৃষ্টিপাতের ফলে ফসল ভাল হওয়া একটি জাগতিক কারণ। কেউ বলতে পারেন যে, বৃষ্টিপাত ভাল হওয়ায় ফসল ভাল হয়েছে। তবে মুমিন বিশ্বাস করেন যে, ভাল বৃষ্টিপাত আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণেই হয়েছে। এক্ষেত্রে কেউ যদি বলেন 'আল্লাহ্র ইচ্ছা ও ভাল বৃষ্টিপাতের ফলে এরূপ হয়েছে', তবে তা শিরক আগসর বলে গণ্য হবে। যদি বক্তা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা এবং বৃষ্টিপাত দুটিই স্বতন্ত্র কারণ তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য হবে। আর যদি তিনি কথাচ্ছলে এরূপ বলেন এবং প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই সবকিছু হয় তবে তা শিরক আসগার বলে গণ্য হবে। কারণ

তিনি বাহ্যত অন্য একটি সাধারণ কারণকে মহান আল্লাহ্র সমতুল্য বলে প্রকাশ করেছেন।

অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে জাগতিক কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার করার কারণে উদ্ধারকৃত ব্যক্তি যদি বলে 'আল্লাহ এবং আপনি না হলে আমার বিপদ কাটত না' তবে তাও উপরের কথার মতই শিরক আকবার বা আসগার বলে গণ্য হবে।

জাগতিক-লৌকিক কোনো বিষয়ে কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষকে বলতে পারেন 'এ বিষয়ে আপনি যা বলবেন তাই হবে,' অথবা 'আপনি যা চাইবেন তাই হবে'। যেমন বিবাহ শাদি, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যদি বলেন: 'আল্লাহ্ ও আপনি যা চান তাই হবে' তবে তা উপরের কথাগুলির মত শিরক আসগার বা আকবার বলে গণ্য হবে। যদি কেউ বলে, 'হে আমীর, হে সম্রাট, হে মন্ত্রী মহাদয়, আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান তাই হবে' তবে তা শিরক আকবার বা আসগার।

শিরক আসগার জাতীয় এরূপ কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে : আমি আল্লাহর ও আপনার উপর নির্ভর করে আছি, উপরে আল্লাহ্ এবং নিচে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, আমার জন্য আল্লাহ্ এবং আপনি ছাড়া কেউ নেই; আল্লাহ এবং আপনি না হলে কাজটি হতো না, ইত্যাদি।

৭. কার্য-কারণ বা উপকরণ বিষয়ক শিরক : মহান আল্লাহ এ বিশ্বের সবকিছু একটি নির্ধারিত নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন, যাকে 'সুন্নাতুল্লাহ' বলা হয়। যেমন আগুনে পোড়া, বিষে মৃত্যু হওয়া, রৌদ্রে গরম হওয়া, পানিতে ভিজলে ঠান্ডা লাগা, ঝড়ে বা প্রবল বাতাসে গাছপালা বা বাড়িঘর ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি। এরূপ কার্য-কারণ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলেই জানেন। মুমিন বিশ্বাস করেন যে, সব কিছুর মূল কারণ মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও দয়া। জাগতিক এ নিয়ম আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে তা কাজ করে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিয়মের কার্যকারিতা স্থগিত বা নষ্ট করতে পারেন। এরূপ বিশ্বাসসহ মুমিন বলতে পারেন– বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লেগেছে, বৃষ্টির কারণে ফসল ভালো হয়েছে, বিষের প্রভাবে মৃত্যু ঘটেছে, ঝড়ের কারণে গাছগুলো ভেঙ্গে গিয়েছে, পচাবাসি খেয়ে পেট নষ্ট হয়েছে, ঔষধ খেয়ে শরীরটা ভাল লাগছে... ইত্যাদি। এরূপ বলা কোনোরূপ অন্যায় বলে বিবেচিত হয় না, যদিও মুমিন এ সকল ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহর ইচ্ছার কথা সুস্পষ্ট বলতে ভালবাসেন। তবে যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই ঔষধ রোগ সারায়, বিষ মানুষ মারে, ঝড় গাছ ভাঙ্গে বা

অনুরূপ কোনো বিশ্বাস যদি তিনি পোষণ করেন তবে তা 'শিরক আকবার' বলে গণ্য হবে।

একজন মুমিন তার বিশ্বাসভিত্তিক উপকরণাদি জানা ও বলার ক্ষেত্রে অবশ্যই কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট শিক্ষার উপর নির্ভর করবেন। জাগতিকভাবে যা কারণ, উপকরণ বা ওসীলা নয় এবং কুরআন বা হাদীসে যাকে এরূপ উপকরণ বা কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি তাকে কোনো কিছুর কারণ বা উপকরণ বলে উল্লেখ করলে তা বিশ্বাসের অবস্থা অনুসারে শির্ক আকবার বা শির্ক আসগার হতে পারে।

যেমন একজন মুমিন বলতে পারেন যে, যাকাত প্রদান না করার কারণে অনাবৃষ্টি হয়েছে, ওজনে, পরিমাণে কম বা ভেজাল দেওয়ার কারণে জীবনযাত্রার কাঠিন্য ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে, ন্যায় বিচার না থাকাতে দেশের উপর বিদেশী শক্তির প্রাধান্য বেড়েছে... যিক্‌র-ইসতিগফারের কারণে রিযকে বরকত এসেছে, ঈমান ও তাকওয়ার প্রসারতার কারণে দেশে শান্তি ও বরকত এসেছে...। মুমিন এগুলি বলেন এবং বিশ্বাস করেন যে, এগুলি সত্যিকার কারণ ও উপকরণ-ওসীলা। কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টত এগুলিকে এ সকল বিষয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু মুমিন বলতে পারেন না যে, অমুক রাশির প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে বা সুনামি হয়েছে বা অমুক রাশিতে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের ফলে অমুক বিষয়টি ঘটেছে। কারণ এগুলি কখনোই জাগতিক বৈজ্ঞানিক কার্যকরণের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং কুরআন-হাদীস নির্দেশিত কারণও নয়। বিশেষত প্রাচীন যুগের তারকা পূজারী বা গ্রহ-নক্ষত্রের পূজারিগণ রাশি বা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। এ কথাগুলি তাদেরই কথা। যদি কেউ প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, রাশিচক্র ইত্যাদির নিজস্ব প্রভাব আছে বিশ্ব পরিচালনা ও বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় সংগঠনের ক্ষেত্রে তবে তিনি শিরক আকবারে লিপ্ত প্রকৃত মুশরিক বলে গণ্য।

অনুরূপভাবে যদি কেউ মনে করেন আল্লাহর ইচ্ছাতেই এরূপ হয়, তবে আল্লাহ অমুক রাশি উপলক্ষে এরূপ করেন তবে তা শিরক আসগার পর্যায়ের কঠিন কবীরা গোনাহ বলে গণ্য হবে। কারণ তিনি বাহ্যত শিরকী কথা বলেছেন এবং আল্লাহর নেয়ামত অন্য কিছুর প্রতি আরোপ করেছেন।

৮. ইসলামের কোনো বিষয় অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অবজ্ঞা করা বা অপছন্দ করা : আল্লাহ্, তাঁর রাসূল বা তাঁর দ্বীনের মৌলিক কোনো বিষয় অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অবজ্ঞা করা বা অপছন্দ করা কুফরী। মুসলিম সমাজের প্রচলিত কুফরীর মধ্যে অন্যতম হলো আল্লাহ্‌র বিভিন্ন বিধান,

যেমন– সালাত, পর্দা, বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি, ইসলামী আইন ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ বা এগুলিকে বর্তমানে অচল মনে করা। ইসলামের কোনো বিধান বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করা; ওয়াজ, মাহফিল, যিকির, তিলাওয়াত, সালাত, মাদ্রাসা, মসজিদ, বোরকা, পর্দা ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা অনুভব করা; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা পূর্ববর্তী অন্য কোনো নবী-রাসূলের প্রতি সামান্যতম অবজ্ঞা প্রকাশ করা কুফরী।

৯. সমাজ, বিচার, শিক্ষা, রাষ্ট্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইসলাম অচল মনে করা : ইসলামকে শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে পালন করতে হবে এবং সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, বিচার, শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইসলাম চলবে না বলে মনে করা কুফরী। সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো নিয়ম, পদ্ধতি, রীতি-নীতি, আদর্শ, আইন ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন নিয়ম, নীতি, মতবাদ বা আদর্শ বেশি কার্যকর, উপকারী বা উপযোগী বলে মনে করা কুফরী। যুগের প্রয়োজনে তাঁর শেখানো পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করা কুফরী।

১০. জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মানা : জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মানা, জনগণকে আইনের উৎস মানা ঈমান পরিপন্থী। কেননা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে আল্লাহ্‌কেই সর্বময় ক্ষমতার উৎস স্বীকার করা হয় এবং বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র।

১১. প্রচলিত গণতন্ত্র : প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণকেই সকল ক্ষমতার উৎস এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইন বা বিধানের অথরিটি বলে স্বীকার করা হয়। তাই প্রচলিত গণতন্ত্র-এর ধারণা ঈমান আকীদার পরিপন্থী।

১২. সমাজতন্ত্র ও নাস্তিক্যবাদ : সমাজতন্ত্রে নিখিল বিশ্বের কোন সৃষ্টিকর্তা বা খোদা আছে বলে স্বীকার করা হয় না। তাই নাস্তিকতা নির্ভর এই সমাজতন্ত্রের মতবাদে বিশ্বাস করা ঈমান আকীদা পরিপন্থী।

১৩. ইসলাম সেকেলে মতবাদ : গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্রমন্ত্রকে মুক্তির পথ মনে করা এবং একথা বলা যে, ইসলাম সেকেলে মতবাদ, এর দ্বারা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এই যুগে উন্নতি অগ্রগতি সম্ভব নয়– এটা কুফ্‌রী।

১৪. ধর্ম নিরপেক্ষতা : "ধর্ম নিরপেক্ষতা"-এর অর্থ যদি হয় কোন ধর্মে না থাকা, কোন ধর্মের পক্ষ অবলম্বন না করা, কোন ধর্মকে সমর্থন করতে না পারা, তাহলে এটা কুফ্‌রী মতবাদ। কেননা ইসলাম ধর্মে থাকতেই হবে, ইসলামের পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে, ইসলামী কার্যক্রমকে সমর্থন দিতেই হবে। আর যদি

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত না করা, তাহলে সে ধারণাও ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী। কেননা, ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকলে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা ফরয। আর কোন ফরযকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী। যদি ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ শুধু এতটুকু হয় যে, সকল ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারবে, জোর জবরদস্তি কাউকে অন্য ধর্মে প্রবেশ করানো যাবে না, তাহলে এতটুকু ধারণা ইসলাম পরিপন্থী হবে না।

১৫. কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী : যে কোনো প্রকার কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী। কোন কুফুরী বা শিরকে লিপ্ত মানুষকে মুসলিম মনে করা বা তাদের আকীদার প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী। যেমন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ নবী বলে মানেন না বা তাঁর পরে কোন নবী থাকতে পারে বা ওহী আসতে পারে বলে বিশ্বাস করে তাদেরকে কাফির মনে না করা বা মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত মনে করা কুফরী। অনুরূপভাবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে সঠিক বা পারলৌকিক মুক্তির মাধ্যম বলে মনে করা, সব ধর্মই ঠিক মনে করা, অন্যান্য ধর্মের শিরক বা কুফরীমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, সেগুলির প্রতি মনের মধ্যে ঘৃণাবোধ না থাকা, অন্য ধর্মাবলম্বীগণকে আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা, তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অনুকরণ করা, ক্রিসমাস (বড়দিন), পূজা ইত্যাদিতে আনন্দ করা কুফরী।

১৬. কাউকে শরীয়তের উর্ধ্বে মনে করা : কোনো মানুষকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরীয়তের উর্ধ্বে মনে করা বা বিশ্বাস করা যে কোন কোন মানুষের জন্য শরীয়তের বিধান পালন করা জরুরী নয়। যেমন, মারিফাত অর্জন হলে, আল্লাহ্‌র ভালোবাসা অর্জন হলে, বিশেষ মাকামে পৌঁছালে আর শরীয়ত পালন করা লাগবে না বলে মনে করা। এগুলি সবই কুফরী বিশ্বাস। অনুরূপভাবে সালাত, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল উপার্জন, পর্দা ইত্যাদি শরীয়তের যে সকল বিধান প্রকাশ্যে পালন করা ফরয তা কারো জন্য গোপনে পালন করা চলে বলে বিশ্বাস করাও কুফরী। এই ধরনের মত পোষণকারী মূলত নিজেকে বা নিজের ধারণার উক্ত বুজুর্গকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর মহান সাহাবীগণের চেয়েও বড় বুজুর্গ মনে করেন। এই ব্যক্তি যদিও ইসলামের কোন কোন বিধান পালন করেন তথাপি তিনি কাফির বলে গণ্য হবেন।

১৭. সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেখানো বা আচরিত কোন কর্ম, পোশাক, আইন, বিধান, রীতি, সুন্নাত, কর্মপদ্ধতি বা ইবাদত পদ্ধতিকে অবজ্ঞা বা উপহাস করা কুফর।

১৮. ইসলাম ধর্মকে জানতে-বুঝতে আগ্রহ না থাকা : ইসলামকে জানা

বা শিক্ষা করাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে না করা বা এ বিষয়ে মনোযোগ না দেয়া কুফরী।

১৯. হারাম কাজের বৈধতার স্বীকৃতি দেয়া : পতিতাবৃত্তি তথা যিনার বৈধতার উপর আইনগত স্বীকৃতি; মদ তৈরি, মদ আমদানী, মদপান ও সুদী লেনদেনকে আইনের মাধ্যমে বৈধ সাব্যস্ত করা; লটারী অথবা যে কোনভাবে জুয়ার প্রচলনকে সামাজিক রূপ দেয়ার পক্ষে বৈধতার স্বীকৃতি দেয়া; নারীদের বেপর্দা প্রথার আইনগত স্বীকৃতি; বিশ্ব ভালবাসা দিবস পালনের নামে অথবা যে কোনভাবে নারী-পুরুষের অবৈধ প্রেম নিবেদন তথা ব্যভিচারের পথ খুলে দেয়ার বৈধতার স্বীকৃতি দেয়া কুফরী।

২০. মুসলমানদের মধ্যে **কুফরী মতবাদ প্রচারের অপতৎপরতায় সহায়তা দান; ইসলাম বিরোধী আইন প্রবর্তন করা; স্বেচ্ছায় ইসলাম বিরোধী আইনের আনুগত্য করা;** ইসলামকে অবজ্ঞা করা ইত্যাদি কুফরী। ইসলামের মোকাবেলায় **মানব রচিত কোন মতবাদের প্রতি স্বেচ্ছায় সমর্থন দেয়া কুফরী**।

২১. অশ্লীলতা-অপসংস্কৃতি : চরিত্র বিধ্বংসী উলঙ্গ ছায়াছবি ও নাটক ইত্যাদি জৈবিক উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টিকারী, অপসংস্কৃতির মাধ্যমে দেশের যুব সমাজকে অপরাধ প্রবণতায় উস্কিয়ে দেয়া কুফরী।

২২. হিন্দু-মুসলিম বৈবাহিক সম্পর্কের বৈধতার পক্ষপাতিত্ব করা কুফরী।

২৩. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আইন-কানুন কার্যকরী করার বিরোধিতা করা কুফরী।

২৪. জাতীয় মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার অধিকারী **হাক্কানী ওলামা, পীর, মাশায়েখদের অহেতুক অপমান ও হেয় প্রতিপন্ন করা কুফরী।**

২৫. নাস্তিক, মুরতাদদের জাতীয় মর্যাদায় ভূষিত করে অন্যদেরকে ইসলাম বর্জনে উৎসাহ দান করা কুফরী।

২৬. ডারউইন-এর বিবর্তনবাদ : ডারউইন-এর বিবর্তনবাদ বিশ্বাস করা কুফ্‌রী অর্থাৎ একথা বিশ্বাস করা যে, বিবর্তন অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হতে হতে এক পর্যায়ে বানর থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ বিশ্বাস ইসলাম ও ঈমান পরিপন্থী। ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে আল্লাহতা'আলা সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ:) কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকেই মনুষ্য জাতির বিস্তৃতি ঘটেছে।

২৭. ফরযকে ফরয ও হারামকে হারাম মনে না করা : সালাত, রোযা, হজ্জ, যাকাত, পর্দা করা ইত্যাদি ফরয সমূহকে ফরয তথা অত্যাবশ্যকীয় জরুরী মনে না করা এবং গান, বাদ্য, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি হারাম সমূহকে হারাম মনে না

করা এবং এগুলোকে মৌলভীদের বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করা কুফ্‌রী। কেননা কোনো ফরযকে ফরয বলে অস্বীকার করা, কোনো হালালকে হারাম বা কোন হারামকে হালাল মনে করা কুফ্‌রী।

২৮. ইসলামের কোনো বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করা : টুপি, দাড়ি, পাগড়ী, মসজিদ, মাদ্রাসা, আলেম, মৌলভী ইত্যাদিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, এগুলোকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা, এগুলো নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা মারাত্মক গোমরাহী। ইসলামের কোন বিষয়– তা যত সামান্যই হোক– তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

২৯. যে কোনো ধর্মে থেকে ভালো কাজ করলে পরকালে মুক্তি হবে মনে করা : আধুনিক কালের নব্য শিক্ষিতদের কেউ কেউ মনে করেন যে, কেবল মাত্র ইসলামই নয়– হিন্দু, খৃষ্টান, ইয়াহুদী, বৌদ্ধ নির্বিশেষে যে কোন ধর্মে থেকে মানবতা, মানব সেবা, পরোপকার প্রভৃতি ভাল কাজ করলে পরকালে মুক্তি হবে। এরূপ বিশ্বাস করা কুফ্‌রী। একমাত্র ইসলাম ধর্ম অনুসরণের মধ্যেই পরকালীন মুক্তি নিহিত– একথায় বিশ্বাস রাখা ঈমানের জন্য জরুরী।

৩০. আহলে কুরআন : একদল বেড়িয়েছেন তারা কুরআন ছাড়া আর কিছুই মানতে রাজি নন। নিজেদেরকে তারা আহলে কুরআন বলে দাবি করেন। এমন কি তারা সহীহ হাদীসও মানেন না। ইসলামের ফতোয়া হল সহীহ হাদীসকে যদি কেউ অস্বীকার করে বা ইনকার করে তবে কাফের হবে। সুতরাং শুধু কুরআন মানলে হবে না, সহীহ হাদীসও মানতে হবে।